দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড

জুল ভার্ন অমনিবাস

সূচিপত্র

পাহাড়ে কী হয়েছিলো........2
প্রথম চিঠি........75
অভিযান........129
হুব্বু-হে বিজয়ী বীর!........204

পাহাড়ে কী হয়েছিলো

১. পাহাড়ে কী হয়েছিলো

এই গল্পে আমার নিজের সম্বন্ধে যদি আমি কয়েক কাহন ফাদি, তবে তা শুধু এই জন্যেই যে এই গল্পের চমকপ্রদ সব ঘটনার সঙ্গে আমি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলুম, গোটা বিংশ শতাব্দীও এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলির মুখোমুখি কখনও পড়বে কি না সন্দেহ। মাঝে-মাঝে আমি নিজেকেই জিগেস করে বসি : এ-সব ঘটনা সত্যি-সত্যি একদিন ঘটেছিলো তো? এ-সব কি আমার স্মৃতির মধ্যে যথার্থই খোদাই-করা আছে, যেমন ঘটেছিলো হুবহু তেমন–নাকি স্মৃতির পটে এই-যে-সব ছবি খোদাই-করা আছে সে সব নিছকই আমার তেতে-ওঠা কল্পনার সৃষ্টি? ওয়াশিংটনে ফেডারেল পুলিশ বিভাগের চীফ-ইন্সপেক্টর হিশেবে–শুধু-যে পুলিশে কাজ করি আমি, তা-ই নয়, আমার ইচ্ছেও করে সব দুর্বোধ্য প্রহেলিকার জট খুলে দেখতে, যা-কিছু রহস্যময় ও কুহেলিঘেরা তাকেই খুঁটিয়ে তন্নতন্ন করে দেখে বোঝবার চেষ্টা করাটা আমার ধাতের মধ্যেই আছে–কিন্তু চীফ-ইপেক্টর হিশেবেই আমি এই তাজ্জব আর অসাধারণ ঘটনাগুলোয় বিশেষভাবেই কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলুম। আর যেহেতু সরকার আগেই আমাকে–যখন আমি নেহাৎই কিশোর, তখনই–বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর রহস্যময় গোপন তদন্তে নিয়োগ করেছিলো, সেইজন্যেই খুব সহজেই, স্বাভাবিকভাবেই, আমার বিভাগের বোকর্তা আমারই ওপর এই তাকলাগানো তদন্তটার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর কাজটা হাতে নিয়েই আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন কত-কত দুর্ভেদ্য রহস্যের সঙ্গে সরাসরি এক মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পড়েছি।

আজ যে-কাহিনীটা বলতে বসেছি, তা শুরু করার আগেই এটা বলে নেয়া ভালো যে আমি এখন যা বলবো তা আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। কারণ কতগুলো তথ্য এখানে এমন থাকবে, যেগুলোর সম্বন্ধে একমাত্র যা সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলবে, তা শুধু আমারই কথা, আমারই এজাহার–এদের প্রমাণ করবার জন্য অন্য কারু নজিরই আমি হাজির করতে পারবো না। আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না-চান তো সে আপনাদেরই অভিরুচি–এবং আপনাদের সে-সব কথা বিশ্বাস করতেও আমি বলছি না। আমি নিজেই তো এর বেশির ভাগ ঘটনাই এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

এই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করেছিলো আমাদের এই বিশাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার পশ্চিমভাগে। সেখানে, মীলগিরি পর্বতমালার একেবারে দুর্ভেদ্যগভীরে উঠেছে এক মস্ত চূড়া–যার নাম গ্রেট আইরি-ঈগলপাখির মস্ত বাসা। তার বিশাল বর্তুল আকৃতিটা কাটাওয়াবা নদীর তীরে ছোট্ট-যে শহর আছে, মরগ্যানটন নাম, সেখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে। আরো স্পষ্ট চোখে পড়ে যখন কেউ প্লেজেন্ট গার্ডেন গ্রামটার মধ্য দিয়ে গিয়ে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চলে যায়।

আশপাশের অঞ্চলের লোকে কেন-যে এই পাহাড়চূড়ার নাম দিয়েছিলো গ্রেট আইরি–ঈগলপাখির মস্ত বাসা–তা আমি এখনও জানি না। পাহাড়টা উঠে গেছে পাথুরে, রুগম্ভীর, অগম্য, আর বিশেষ-বিশেষ আবহাওয়ায় তার গায়ে জড়িয়ে থাকে এক গভীর নীল ও অদ্ভুত-সুদূর ভঙ্গি। তবে নামটা শুনে প্রথমেই যে-ভাবনাটা লোকের মাথায় খেলে যাবে, তা হলো নিশ্চয়ই এখানটায় শিকারি পাখিরা এসে বাসা বাঁধে, আস্তানা গাড়ে, তা-ই এই নাম : ঈগল, কণ্ডর, গৃধিনী; অগুনতি পালকখচিত পাখনাওলা জীবের বসতি, মানুষের

নাগালের বাইরে এই দূর-চূড়ার উপর ডুকরে ডেকে উঠে পাক খেয়ে যাচ্ছে তারা। অথচ, এদিকে কিন্তু, এই গ্রেট আইরি পাখিদের যে খুব-একটা আকৃষ্ট করে তা অবশ্য মনে হয় না; বরং তার উলটোটাই সত্যি; আশপাশের এলাকার লোকজন মাঝে মাঝে উলটে বরং এই মন্তব্যই করে যে পাখিরা চুড়োটার দিকে যখন উড়ে যায়, তখন আচমকা দ্রুতগতিতে উঠে যায় আরো-উপরে, চক্কর দেয় শিখরটার ওপর, পাক খায়, তারপর ক্ষিপ্রবেগে দূরে উড়ে যায়, আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে দেয় তাদের কর্কশ চীৎকারে।

তাহলে কেন শিখরটার নাম গ্রেট আইরি? তার চেয়ে বরং শিখরটার নাম জ্বালামুখ দিলেই মানাতো বেশি, কারণ এই খাড়া সটান-ওঠা বর্তুল দেয়ালগুলোর মধ্যে হয়তো গভীর-কোনো নয়ানজুলিই আছে। হয়তো ঐ দেয়ালগুলো আড়াল করে রেখেছে কোনো মস্ত পাহাড়ি ঝিল, যেমনটা প্রায়ই দেখা যায় আপালাচিয়ার পর্বতব্যবস্থার অন্যান্য অংশে, এমন-এক লেগুন যাকে অনবরত জল খাইয়ে যায় বৃষ্টিবাদল আর শীতের তুষার।

এককথায়, এটা কি তবে কোনো প্রাচীন আগ্নেয়গিরিরই আবাস ছিলো না–যে আগুনের পাহাড় অনেক বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে সত্যি,তবে যার আভ্যন্তর স্তিমিত আগুন আবার যে ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে না, তা-ই বা কে জানে? গ্রেট আইরি কি একদিন আশপাশে সেই বিষম দুর্বিপাকই সৃষ্টি করবে না, যে-দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে মাউন্ট ক্রাকাতোয়া কিংবা মাউন্ট পেলে? সত্যি যদি তার মাঝখানে গভীর-কোনো হ্রদ থেকে থাকে, তবে সেই জলের মধ্যে কি সর্বনাশই ওতপ্রোত মিশে নেই, যা একদিন হয়তো পাথুরে স্তরগুলোর ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে গিয়ে পড়বে গভীর-নিচে, আর আগ্নেয়গিরির আগুনের কুণ্ডে পড়ে বাষ্প হয়ে পাক খাবে, আর পাথর ফাটিয়ে বার করে নেবে তাদের বাইরে বেরুবার পথ, ভয়ংকর বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে চারপাশ, গলন্ত লাভার প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে

ক্যারোলাইনার সুন্দর উপত্যকাঁদেশ, যেমনটা ঘটেছে এই সেদিন, ১৯০২ তে, মার্তিনিক-এ?

সত্যি-বলতে, এই শেষ সম্ভাবনাটা যে মোটেই কোনো অলীক বা অমূলক আশঙ্কা নয়, তার প্রমাণ হিশেবে সম্প্রতি এখানে বিচিত্র-সব চিহ্নলক্ষণ দেখা গেছে যা হয়তো ঘুমন্ত কোনো আগ্নেয়গিরি পুনর্জাগরণেরই ইঙ্গিত-বা পূর্বাভাস। পাহাড়ের ওপর ভেসে থেকেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলি, পাঁজা-পাঁজা, আর একবার পথচারী পাহাড়িরা কানে শুনেছে। ভূগর্ভের কোলাহল, দুর্বোধ্য গুমগুমে আওয়াজ, ব্যাখ্যাতীত সব রুষ্ট গর্জন। শিখরের কাছে আকাশ জ্বলজ্বল করে উঠেছে কী-এক অচেনা আভায়, রাতের অন্ধকারে।

হাওয়া যখন ঝেটিয়ে নিয়ে এসেছে সেই ধোঁয়ার মেঘ, পূবদিকে, প্লেজেন্ট গার্ডেনে, কয়েকটি পোড়া-পোড়া টুকরো আর ছাইভস্ম ঝরে পড়েছে সেই মেঘ থেকে। আর, শেষটায়, এক ঝড়ের রাতে বিবর্ণ-সব দাউদাউ শিখা, শিখরের ওপরকার মেঘে প্রতিফলিত হয়ে, নিচের বসতিতে আছড়ে ফেলেছে এক ভয়াল হুঁশিয়ার-করা আলো।

এইসব আশ্চর্য সব উৎপাত দেখে, আশপাশের এলাকার লোকজন যে বেশ শঙ্কিত আর অস্থির হয়ে পড়বে, তাতে অবাক হবার কিছু ছিলো না। আর এই অস্থিরতার সঙ্গে এসে মিশেছিলো পাহাড়ের সত্যিকার হালচাল জেনে-নেবার জন্যে উদগ্র এক আকাঙ্ক্ষা । ক্যারোলাইনার খবরকাগজগুলোয় জ্বলজ্বল করেছিলো শিরোনাম : গ্রেট আইরির গভীর রহস্য! এটাও তারা আতঙ্কিত বাক্যবন্ধে জিগেস করেছিলো এ-রকম কোনো অঞ্চলে বসবাস করা কি বিষম বিপজ্জনক নয়। প্রবন্ধগুলো চেতিয়ে তুলেছিলো আতঙ্ক আর কৌতূহল–আতঙ্ক তাদের মধ্যে যারা, সত্যি যদি বিস্ফোরণ ঘটে, তবে সর্বনাশের

মুখোমুখি পড়বে; কৌতূহল তাদের মধ্যে, যাদের নিজেদের কোনো আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই, যারা জানতে চাচ্ছিলো প্রকৃতির এই উৎপাতের আড়ালে সত্যি সত্যি সে কোন প্রক্রিয়া কাজ করে যাচ্ছে। যাদের ঘাড়ের ওপর বিপদ প্রায় লাফিয়ে পড়তে চলেছে, তারা হলো মরগ্যানটনের বাসিন্দা, আর তাদের চাইতেও বেশি ভয় ছিলো প্লেজেন্ট গার্ডেন আর তার আশপাশের ছোটো-ছোটো গ্রামগঞ্জের লোকদের।

এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে কোনো পর্বতারোহীই আগে গ্রেট আইরির শিখরে চড়বার চেষ্টা করেনি। শিখরটাকে ঘিরে যে-শৈলশ্রেণী গেছে কেউই আগে তাতে ওঠবার কথা ভাবেনি। সেখানে হয়তো সত্যি এমন-কোনো পথও নেই, যা বেয়ে উঠে সবচেয়ে দুঃসাহসী পর্বতারোহীও ভেতরে গিয়ে পৌঁছুবার কোনো সুযোগ পেতো। অথচ, যদি কোনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ক্যারোলাইনার সমগ্র পশ্চিমভাগকেই বিপদের মুখোমুখি করে থাকে, তবে এই গিরিমালার সমগ্র অঞ্চলের একটা সরেজমিন তদন্ত করে দেখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

জ্বালামুখের মধ্যে দিয়ে সত্যি-সত্যি সশরীরে নামবার আগে-নামবার তো কত যে অসুবিধে আছে তার তত হিশেব নেই–একটা উপায় অবশ্য আছে, যার সাহায্যে ভেতরটায় কী আছে তা দেখে-আসা যায়, তার জন্যে পাহাড় বেয়ে শিখরে ওঠবার কোনো দরকার নেই। সেই স্মরণীয় বছরটার সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, উইলকার নামে এক নামজাদা বেলুনবাজ তার বেলুনটা নিয়ে মরগ্যানটনে এসে হাজির হয়েছিলো। পূব-থেকে-আসা হাওয়ার অপেক্ষায় থেকে, সে সহজেই তার বেলুনে করে আকাশে উঠে গিয়ে গ্রেট আইরি-র দিকে ভেসে যেতে পারতো। সেখানে, নিরাপদ উচ্চতা থেকে, জোরালো দূরবিন চোখে এঁটে নিচের গভীরে তাকিয়ে সে সব খুঁজে দেখতে পারবে। সে

তাহলে সহজেই জেনে নিতে পারবে আগ্নেয়গিরিটার কোনো নতুন জ্যান্ত মুখ সেই বিশাল পাথরগুলোর মধ্যে কোথাও বেরিয়েছে কি না। অন্তত সেটাই ছিলো তখন প্রধান প্রশ্ন। এটা যদি একবার নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়া যায়, তাহলে আশপাশের অঞ্চলের লোকজন জেনে যাবে অচিরেই আসন্ন কোনো অগ্নদগারের ভয় আছে কি না।

যে-কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিলো, সেই অনুযায়ীই শুরু হয়েছিলো বেলুনের উত্থান। হাওয়া ছিলো বেশ জোরালোই, কোনো তীব্র ঝাঁকুনি বা দিকবদল ছিলো না; প্রখর সূর্যকিরণে সকালবেলার মেঘগুলো ক্রমেই উধাও হয়ে যাচ্ছিলো; গ্রেট আইরির অভ্যন্তর যদি ধোঁয়ায় ভরা না-থাকে, বেলুনবাজ উইলকার তবে চোখে দুরবিন এঁটে গোটা তল্লাটটাই ছুঁড়ে নিতে পারবে। আর যদি সে দ্যাখে কুণ্ডলি পাকিয়ে বাষ্প উঠে আসছে, তবে তার উৎসটাও সে তখন অনায়াসেই জেনে নিতে পারবে।

যাত্রা শুরু করবার সঙ্গে-সঙ্গেই বেলুনটা তরতর করে তক্ষুনি পনেরোশো ফিট উঁচুতে উঠে গিয়েছিলো, তারপর এক জায়গাতেই অনড়ভাবে দাঁড়িয়েছিলো প্রায় পনেরো মিনিট। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো নিচে যে-পুরবঁইয়া হাওয়াকে জোরালো বলে মনে হচ্ছিলো, অতটা ওপরে তার তেমন বেগ ছিলো না। তারপর, পোড়াকপাল আর কাকে বলে, বেলুনকে তাড়া লাগিয়েছিলো উলটোমুখি এক হাওয়া, আর সে পুবদিকে ভেসে চলে যেতে থাকে। শৈলশ্রেণী থেকে তার দূরত্ব, তার ব্যবধান, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো। বেলুনবাজের যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও, মরগ্যানটনের বাসিন্দারা দেখতে পেলে, বেলুনটা ভুল দিগন্তের দিকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। তারা জানতে পেরেছিলো, বেলুনটা গিয়ে নেমেছিলো র‍্যালের আশপাশে, যে-রলে ছিলো নর্থ ক্যারোলাইনার রাজধানী।

এই চেষ্টাটা এইভাবে দূর-মাঠে মারা যাওয়াতে, ঠিক হলো যে, আবহাওয়া যখন আরো-ভালো থাকবে, তখন আরো-একবার চেষ্টা করে দেখা হবে। এদিকে নতুন করে শুরু হয়ে গেলো পাহাড়ের ভেতরকার গুমগুম গর্জন, সঙ্গে এলো ভারি-ভারি ঝোলা মেঘ আর রাতের বেলায় সন্ত্রস্ত ও কম্পিত আলোকশিখা। লোকে এবার প্রায় নিঃসন্দেহই হয়ে গেলো যে গ্রেট আইরির হাবভাব মোটেই সুবিধের ঠেকছে না, বিপদটা যে ভয়াল ও করাল হবে শুধু তা-ই নয়, বিপদটা আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই যে, গোটা তল্লাটটাই হয় কোনো ভয়ানক ভূমিকম্প আর নয়তো কোনো আসন্ন অগ্নদগারের কবলে পড়ে গিয়েছে।

সে-বছরের এপ্রিলমাসের গোড়ার দিকে, এই আশঙ্কাগুলো সত্যিই আতঙ্কে পরিণত হয়েছিলো। জনসাধারণের ভয়ের বহুগুণ প্রতিধ্বনি শোনা গেলো খবরকাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে। পাহাড় থেকে মরগ্যানটন অব্দি গোটা অঞ্চলটাই এখন জেনে গিয়েছে যে একটি অগ্নদগার অবশ্যম্ভাবী।

চৌঠা এপ্রিলের রাত্তিরবেলায়, প্লেজেন্ট গার্ডেনের বাসিন্দারা এক ভয়ানক কোলাহল শুনেছিলো জেগে উঠলো। প্রথমে তারা ভেবেছিলো গোটা পাহাড়টাই বুঝি তাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে। তারা ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো তাদের ঘরবাড়ি থেকে, তক্ষুনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্যে তৈরি, এতই শঙ্কাতুর যে ভাবছিলো মাটি বুঝি চারপাশে হা করে আছে, মাইল-মাইল জোড়া খেতখামার গ্রামগঞ্জ গিলে খাবার জন্যে তৈরি।

রাতটা ছিলো ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। উপত্যকার ওপর ঝুলে ছিলো ভারি নিচু মেঘ। রাত না-হয়ে যদি দিনও হতো, তাহলেও ঐ মেঘের জন্যে পাহাড়ের চুড়োটা কারু চোখে পড়তো না।

এই দুর্ভেদ্য ও দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে, চারপাশ থেকে যত আর্তনাদ উঠেছিলো, তার কোনো সাড়া মিলছিলো না। ভীতসন্ত্রস্ত আবালবৃদ্ধবনিতা খ্যাপা এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে অন্ধকারে হাড়ে-হাড়ে ছুটছিলো–কোথায় যাচ্ছিলো কেউ জানতো না। চারপাশ থেকে শোনা যাচ্ছিলো চীৎকার : ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! অগ্নদগার! বিস্ফোরণ! কোথায়? কোথায় অগ্ন্যুৎপাত? কেন! গ্রেট আইরিতে!

মরগ্যানটনে হু-হু করে খবর চলে গেলো পাথর, লাভা, ছাইভস্মের এক প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে।

শহরের নাগরিকদের মধ্যে যাদের মাথা তখনও ঠাণ্ডা ছিলো তারা বললে যে সত্যিই যদি কোনো অগ্নদগার হতো তাহলে গর্জনটা শুধু-যে এখনও শোনা যেতো তা নয়, তার প্রচণ্ডতাও বেড়ে যেতো, আর শিখরটার ওপর দেখা দিতে আগুনের শিখা;-আর শিখা না-দেখা গেলেও শিখার লেলিহান তাণ্ডব নাচ মেঘ ফুঁড়ে চারপাশে প্রতিফলিত হতো। এখন তো এমনকী কোনো শিখারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। আর ভূমিকম্প যদি হতো–আতঙ্কিত মানুষজন দেখতে পেলে যে সেই ভূমিকম্পে আর যা-ই হোক, তাদের বাড়িঘরগুলো এখনও চুরমার হয়ে ভেঙে পড়েনি। খুবই সম্ভব যে বিকট আওয়াজটা কোনো আভালাঁশের গড়িয়ে-পড়া থেকে উঠেছে, হয়তো শিখর থেকে হঠাৎ কোনো বিশাল পাথর গড়িয়ে পড়েছে।

এক ঘণ্টার মধ্যে আর-কোনো নতুন ঘটনাই ঘটলো না। পশ্চিম-থেকে-আসা হাওয়া ঝেটিয়ে যাচ্ছে নীলগিরির বিস্তীর্ণ শৈলশ্রেণী, পাহাড়ের ওপর ঢালগুলোয় পাইনবনে হেমলকের ঝাড়ে বিলাপ উঠেছে হাওয়ার। দেখে মনে হচ্ছে আতঙ্কের আর নতুন কোনো কারণ নেই কোথাও; লোকজন তারপর যে-যার বাড়িতে ফিরে আসতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। তবু সবাই অধীরভাবে অপেক্ষা করে আছে কখন ভোর হয়, কখন দিন ফোটে।

তারপর, আচমকা, শেষরাতে, তিনটে নাগাদ, আকেবার বিপদের সংকেত। গ্রেট আইরির পাথরের দেয়ালের ওপর লাফিয়ে-লাফিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে আগুনের শিখা! মেঘের গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে, তারা অনেক দূর অব্দি আকাশ আর মেঘ আলো করে দিয়েছে। শোনা গেলো চড়চড় শব্দ, যেন একসঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে অনেক গাছ, যেন কোথাও দাবানল লেগেছে।

আপনা থেকেই বনে আগুন লেগে গিয়েছে? হঠাৎ এভাবে আগুন-লেগে-যাবার কারণ কী হতে পারে? বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই এই দাবানল শুরু করেনি, কারণ একবারও (কাথাও বাজের শব্দ শোনা যায়নি। সত্যি-যে, আগুন ধরে যাবার উপকরণ আছে অনেক; ঐ ওপরে নীলগিরির শৈলশ্রেণী নিবিড় বনে ছাওয়া। কিন্তু এই শিখাগুলো যেন বড্ড-আচমকা একসঙ্গে শুরু হয়ে গেছে–কোনো নৈসর্গিক কারণ যে আছে তা তো মনে হয় না।

অগ্ন্যুদগার! বিস্ফোরণ! অগ্ন্যুৎপাত! আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙেছে!

চারপাশ থেকে ঝাঁপট মারলো আর্ত চীৎকার! আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত! সত্যি, তাহলে, পাহাড়ের আঁতের মধ্যে লুকিয়েছিলো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ! আর এত বছর পরে, বলতে-কি যুগ-যুগ পরে, অবশেষে আবার তার ঘুম ভেঙেছে! শিখার সঙ্গে যোগ হয়ে এখন কি তবে মুষলধারে বর্ষাবে জ্বলন্ত পাথর, গলানো লাভা আর অবিরাম ছাই? তবে কি লাভা ঢেউ তুলে নেমে আসবে তরল আগুন নিয়ে? আর পথে যা পড়বে সব ধ্বংস করে দেবে–গ্রামনগর, খেতখামার, প্রকৃতির এই সুন্দর লীলাভূমি? এসে ধ্বংস করে দেবে প্লেজেন্ট গার্ডেন আর মরগ্যানটন?

এবার আতঙ্ক আর বিশৃঙ্খলা হলো চরম। কোনো আশ্বাস, কোনো প্রবোধ তাকে থামাতে পারতো না। মেয়েরা কোলে শিশু নিয়ে, আতঙ্কে উন্মাদিনী, ছুটেছে পুবদিকে; পুরুষরা, ঘরবাড়ি ছাড়তে-ছাড়তে, ক্ষিপ্রহাতে পুঁটুলিতে বেঁধে নিচ্ছে যা-কিছু ছিলো মূল্যবান, দুর্লভ; তারপর খুলে দিচ্ছে কোর্যাল আস্তাবল গোয়ালের দরজা, যাতে গোরুভেড়া, শুওর-মোষ যে যেদিকে পারে খোলা মাঠে ছুটে যেতে পারে। সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রে মানুষ আর জানোয়ারের সে-কী হন্যে উম্মাদনা, সে-কী বিশৃঙ্খল ছোটাছুটি, বনে-জঙ্গলে, খোলা মাঠে, গ্রাম-শহরের রাস্তায়, জলাভূমির পাশে, অন্ধকারে। জলাশয়গুলোয় ফুলে ফেঁপে অস্থির হয়ে উঠছে জল, পলাতকদের পায়ের তলা থেকে তারা যেন হ্যাঁচকা স্রোতের টানে সরিয়ে নিয়ে যাবে মাটি! কিন্তু যদি উম্মাদ কোনো প্রস্রবণের মতো নেমে আসে তরল আগুন, পাহাড়ের গা বেয়ে, আর যদি সেই জ্বলন্ত লাভার তলায় হারিয়ে যায় পথ?

অবশ্য, সবচেয়ে বড়ো খেতখামার যাদের, যাদের প্রবীণ মগজ তুলনায় বিচক্ষণও, তারা কিন্তু এই উম্মাদ পলায়মান নরনারীর ঠেলাঠেলিতে ভেসে যায়নি, তারা বরং আবারও চেষ্টা করেছে অন্যরা যাতে একটু সংযত হয়। পাহাড়ের মাইল খানেকের মধ্যে এসে,

তারা দেখতে পেলে শিখার প্রোজ্জ্বল দাপট অনেকটাই স্তিমিত হয়ে বসেছে। সত্যি বলতে, তাদের মনে হলো এই অঞ্চলে যে আশু-কোনো, কিংবা অন্যকোনো, বিপদের সম্ভাবনা আছে, এমনটা বোধ হচ্ছে না। কোনো পাথরই আছড়ে পড়েনি মহাশূন্যে; ঢালের ওপর কোনো লাভার স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে না; মাটির তলা থেকে ভেসে আসছে না কোনো রহস্যময় গুমগুম আওয়াজ। চারপাশে এমন-কোনো লক্ষণ নেই যা দেখে মনে হতে পারে ভূমির কম্পনজনিত কোনো দুর্ঘটনা রাজ্যটাকে সর্বনাশে দিতে পারে।

শেষটায়, পলাতকদের উন্মাদ উড়াল এসে থামলো এমন জায়গায় যেখান থেকে, তারা ভাবলে, পাহাড়ের বিপদ অতর্কিতে এসে ছোঁ মেরে তাদের ওপর আর পড়বে না। তখন কয়েকজন ভয়ে-ভয়ে, সন্তর্পণে, একটু-একটু করে আবার ফিরে এলো পাহাড়ের দিকে। পুরোপুরি দিন ফোটবার আগেই কতগুলো খামারবাড়িতে আবার ফিরে এলো লোকজন।

সকালবেলায় গ্রেট আইরির শিখরের ওপর আগের রাতের ধোঁয়ার মেঘের আর কোনো চিহ্নই ছিলো না। আগুন যা জ্বলেছিলো তা নিশ্চয়ই নিজে থেকেই নিভে গিয়েছে; আর কেন-যে অমন দুর্বিপাক আচমকা শুরু হয়েছিলো তার কারণ যদি-বা কেউই বুঝতে পারেনি, সকলেই অন্তত এই আশাটুকু করেছে যে আবার যাতে অচিরেই তার কোনো পুনরাবৃত্তি না-হয়।

এমনও কারু-কারু মনে হলো যে গ্রেট আইরি আসলে হয়তো কোনো আগ্নেয় তোলপাড়ের নাট্যশালাই ছিলো না। পুরো এলাকাটা যে ভূমিকম্প কিংবা অগ্ন্যুৎপাতের দয়ার ওপর নির্ভর করে আছে এমন-কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণও কোথাও নেই।

অথচ তবু পাঁচটা নাগাদ, আবার শৈলশিরার ঠিক নিচেটায়, যেখানকার বনভূমিতে রাত্রি তখনও যাই-যাই করেও পুরোপুরি চলে যায়নি, অদ্ভুত এক আওয়াজ উঠলো আর হাওয়ায় উড়াল দিয়ে দূরে চলে গেলো, আর তার সঙ্গে ছিলো যেন বিশাল-কোনো ডানার ঝাঁপট। আর দিনটা যদি অন্যদিনের মতো স্বচ্ছ ফটফটে পরিষ্কার হতো, চাষীরা হয়তো দেখতে পেতো অতিকায় কোনো শিকারি পাখির তুমুল উড়াল–হয়তো আকাশের কোনো অপদেবতাই গ্রেট আইরির নয়ানজুলি ডেকে ডানা ছড়িয়ে উঠে পড়েছে আকাশে, আর দ্রুত গতিতে উড়ে চলে যাচ্ছে পুবদিগন্তের পানে।

.

২. আমি মরগ্যানটনে এসে পৌঁছোলুম

আগের দিন রাত্তিরে ওয়াশিংটন থেকে রওনা হয়ে ২৭ শে এপ্রিল আমি এসে পৌঁছোলম নর্থ ক্যারোলাইনার রাজধানী র্যলেয়।

দু-দিন আগে, ফেডারেল পুলিশের বড়কর্তা আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খানিকটা অধীর হয়েই আমার আপেক্ষা করছিলেন তিনি। জন স্ট্রক, তিনি বলে উঠেছিলেন, তুমি কি এখনও সেই করিৎকর্মা মানুষটি আছে, যে এর আগে অনেকবার শুধু আমার প্রতি তার আনুগত্যই দেখায়নি, তার কাজের প্রতিভাও দেখিয়েছে?

মিস্টার ওয়ার্ড, আমিও উত্তরে নুয়ে পড়ে সেলাম ঠুকে বলেছিলুম, আমি কোনো সাফল্য বা কর্মদক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিতে অপারগ–তবে যদি আনুগত্যের কথা বলেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, আমার আনুগত্য শতকরা একশোভাগই আপনার অধীন।

সে নিয়ে আমি কোনো সন্দেহ করিনি, স্ট্রক, বড়োকর্তাও সমান সুরে বলেছিলেন, আমি বরং তোমাকে আরো-যথাযথ প্রশ্নটা করি : তুমি কি আগের মতোই প্রহেলিকা নিয়ে মাথা ঘামাও? ধাঁধা বা হেঁয়ালির সমাধান করতে উৎসুক? আগে যেমন করে কোনো রহস্যভেদ করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে, এখনও কি তুমি তেমনতর কোনো উদগ্রীব আগ্রহ বোধ করো?

করি, মিস্টার ওয়ার্ড।

সাধু, সাধু, শাবাশি দিয়েছেন বড়োকর্তা, তাহলে এখন মন দিয়ে শোনো।

মিস্টার ওয়ার্ড, বয়েস তার সম্ভবত পঞ্চাশ বৎসর, এত বড়ো পদে উন্নীত হয়েছিলেন শুধু তার ক্ষমতা আর বুদ্ধিবলে; এই পদটার সঙ্গে জড়ানো যাবতীয় গুরুদায়িত্বই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করে আসছিলেন। আগে অনেকবারই তিনি আমার ওপর নানাবিধ কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর আমিও সাফল্যের সঙ্গে সে-সব কাজ সম্পন্ন করে-করে ক্রমেই তার গভীর আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলুম। গত কয়েক মাসে অবশ্য আমাকে তিনি কোনো কাজ দেননি, কেননা সে-রকম কোনো দুর্বোধ্য কূট প্রহেলিকার জট ছাড়াবার কাজ আমাদের বিভাগে আসেনি। সেজন্যে তিনি এখন কী বলতে চান সেটা জানবার জন্যেই আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলুম। তার এই প্রশ্ন আর ভনিতা যে আমার কাঁধে আবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে দেবারই অছিলা মাত্র, এটা বুঝতে আমার একটুও দেরি হয়নি।

সন্দেহ নেই যে তুমি জানো, বড়কর্তা বলেছেন তখন, মরগ্যানটনের কাছে। ব্লুরিজ মাউন্টেসে কী-সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তা নিশ্চয়ই তুমি জানো।

শুনেছি বটে। ওখান থেকে অনবরত যে-সব আশ্চর্য ঘটনার খবর আসছে, তা যে-কারুর কৌতূহল উশকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ঘটনাগুলো কেবল-যে আশ্চর্য তা-ই নয়–এমন-কোনো আশ্চর্য ব্যাপার কেউ কখনও জন্মেও শোনেনি। সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ রেখো না, স্ট্রক। কিন্তু তাছাড়াও আরো-কতগুলো জরুরি প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে : গ্রেট আইরিতে যা হচ্ছে, সেখানকার লোকদের পক্ষে তা যদি বিপজ্জনক হয়, তবে কতটা বিপজ্জনক? সে কি। অবিলম্বে ঘটতে চলেছে এমন-কোনো ভয়াবহ সর্বনাশেরই ইঙ্গিত? এমন-এক সর্বনাশ, যা অত্যন্ত রহস্যময়ও, যার সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না।

দেখে-শুনে ভয়ই হয়, মিস্টার ওয়ার্ড।

কাজেই, স্ট্রক, চট করে আমাদের জেনে নিতে হবে, ঐ পাহাড়ের মাঝখানটায়

কী আছে। যদি প্রকৃতির কোনো বিশাল শক্তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতেই হয় আমাদের, তবে লোকজনকে আগে থেকেই এই ভয়াল বিপদটা সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়া উচিত।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা ভালো করে তদন্ত করে বুঝে নিতে হবে সত্যি-সত্যি ওখানে কী হচ্ছে।

তুমি ঠিক বলছো, স্ট্রক। কিন্তু তাতে আবার বিস্তর ঝামেলা আছে। সকলেই জানিয়েছে যে গ্রেট আইরির চুড়োয় ওঠা একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার, সেখানে উঠে তারপর ভেতরের নয়ানজুলিটায় নামাটা তো একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কেউ কি আগে কখনও যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নিয়ে সবরকমে তৈরি হয়ে ভালো আবহাওয়ায় ওখানে যাবার চেষ্টা করে দেখেছিলো? আমার অবশ্য এতে একটু সন্দেহ আছে; আমার বিশ্বাস, কোনো সুপরিকল্পিত অভিযান হয়তো সাফল্য এনে দেবে।

কিছুই অসম্ভব নয়, মিস্টার ওয়ার্ড। এখানে, আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যাটা হলো ব্যয়নির্বাহের প্রশ্ন-কাজটা সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে বিস্তর অর্থব্যয় হবে।

যখন আমরা আস্ত-একটা জনপদের মানুষজনকে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি, হয়তো বা সর্বনাশের হাত থেকে তাদের বাঁচাতেও চাচ্ছি, তখন খরচের প্রশ্নটা কোনো প্রশ্নই নয়। তোমার কাছে অবশ্য আমার আরেকটা প্রস্তাবও আছে। হয়তো এই গ্রেট আইরি লোকে যতটা ভাবে ততটা অগম্য নয়। হয়তো একদল পাজি দুষ্কৃতকারী গিয়ে সেখানে তাদের গোপন ডেরা বানিয়েছে, হয়তো শুধু তারাই জানে কেমন করে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে হয়।

অর্থাৎ? আপনি কি ভাবছেন যে একদল দস্যু–

হয়তো আমার অনুমানটা পুরোপুরি ভুল, স্ট্রক। হয়তো এইসব অদ্ভুত আওয়াজ আর চাক্ষুষ দৃশ্যগুলোর পেছনে স্বাভাবিক কোনো নৈসর্গিক কারণই আছে। কিন্তু দস্যুদল না

নিসর্গ-কে যে এ-সবের জন্যে দায়ী সেটা আমাদের সুনিশ্চিতভাবে জেনে নিতে হবে–এবং জেনে নিতে হবে যত শিগগির সম্ভব।

আমার শুধু একটাই প্রশ্ন আছে।

বলে ফ্যালো, স্ট্রক, বলে ফ্যালো। কোনো খটকাই চেপে রেখো না।

ধরুন, আমরা গ্রেট আইরিতে গিয়ে পৌঁছেছি, এ-সব আশ্চর্যের উৎস আর উৎপত্তিস্থলও বার করে ফেলেছি, জেনে গিয়েছি যে সেখানে আগ্নেয়গিরির এক জাগ্রত জ্বালামুখ আছে আর এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ অচিরেই আসন্ন–তখন কি তাকে আমরা ঠেকাতে পারবো?

না, স্ট্রক, না। তবে বিপদের পরিমাণ কতটা হতে পারে, সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারবো। যদি মার্তিনিকে যেমন ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে, মাউন্ট পেলের উদগিরণ থেকে যদি আস্ত-আস্ত জনপদ যেমনভাবে চাপা পড়ে গিয়েছে, যদি সেইরকমই কোনো অগ্ন্যুৎপাত নর্থ ক্যারোলাইনাকে সমূহ বিপদের মুখোমুখি এনে ফেলে থাকে, তবে আমরা লোকজনকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারবো, তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে এখানকার পাট উঠিয়ে তাদের এবার অন্য-কোথাও গিয়ে আস্তানা পাততে হবে

আশা করি তেমন-কোনো ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা নেই।

আমারও তা-ই মনে হয়, স্ট্রক। ব্লুরিজ শৈলশ্রেণীতে কোনো জাগ্রত আগ্নেয়গিরি আড়মোড়া ভাঙছে, এটা আমার কাছে বড্ড অবিশ্বাস্য ঠেকছে। আমাদের আপালাচীয় পার্বত্যব্যবস্থা কখনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পাহাড়ে যা ঘটছে, তার

তো কোনো-একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া চাই আমাদের-সে-সব নিশ্চয়ই অকারণেই ঘটছে না। সংক্ষেপেই তোমাকে বলি, স্ট্রক। আমরা ঠিক করেছি, গ্রেট আইরিতে যা হচ্ছে তার একটা সরেজমিন তদন্ত করে দেখা উচিত, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব দেখা দরকার, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ একজায়গায় জড়ো করা জরুরি–শহরের গ্রামের সবাইকে প্রশ্ন করে-করে জেনে নিতে হবে তারা কী দেখেছে, কী শুনেছে, কী ভেবেছে। আর এইসব কাজ করবার জন্যে আমরা এমন-একজনের কথা ভেবেছি, যার ওপর আমাদের সকলেরই পূর্ণ আস্থা আছে; এবং সেই লোক হচ্ছো তুমি, স্ট্রক।

বেশ। আমি তৈরি আছি, মিস্টার ওয়ার্ড, আমি একটু উত্তেজিত গলাতেই বলে উঠেছি তখন, নিশ্চিন্ত থাকবেন–পুরো খবরটা জোগাড় করতে যা-যা করতে হবে, সব আমি করবো–কোথাও কোনো কাজে অবহেলা করবো না।

তুমি যে কাজে ফাঁকি দেবে না বা অবহেলা করবে না, তা আমি জানি, স্ট্রক। তবে এটাও তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের মনে হয়েছে তুমিই এই কাজের উপযুক্ত লোক। এবার তুমি তোমার ঐ ছটফটে উগ্র কৌতূহলটাকে চরিতার্থ করবার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে।

আপনি তো জানেনই, মিস্টার ওয়ার্ড, যে-কোনো প্রহেলিকাকে নিছক প্রহেলিকা বলে মেনে নিতে আমার বোধবুদ্ধিতে আটকায়।

পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই তুমি নিজে করবে, স্বাধীনভাবে–কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। আর খরচের প্রশ্ন, যদি মনে হয় যে পর্বতাভিযানের জন্যে আঁটঘাট বেঁধে

ওস্তাদ পর্বতারোহীদের নিয়ে বেরুতে হবে, তাতে অবশ্য বিস্তর খরচ হবে–তবে সেক্ষেত্রে তোমার কাব্লাশ রইলো, ইচ্ছেমতো অর্থব্যয় করতে পারবে তুমি।

যা করলে ভালো হবে বলে মনে হবে, আমি তা-ই করবো, মিস্টার ওয়ার্ড।

একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ঠুক। খুব হুঁশিয়ার হয়ে, সন্তর্পণে, তোমায় এগুতে হবে। ওখানকার লোকজন এর মধ্যেই উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। তোমার পক্ষে বরং গোপনেই অনুসন্ধান চালানো উচিত হবে। আমি যে-সন্দেহের কথাটা তুলেছি, ঘুণাক্ষরেও কখনো কারু কাছে তার কথা পেছো না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা-অকারণে নতুন-কোনো আতঙ্ক যাতে না-ছড়ায় সে-বিষয়ে তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই। সতর্ক থাকতে হবে।

মনে থাকবে, মিস্টার ওয়ার্ড।

মরগ্যানটনের মেয়রের কাছে তোমার পরিচয়পত্র পেশ করতে হবে–তিনিই সবদিক থেকে তোমায় সাহায্য করবেন। আবারও বলে দিচ্ছি, স্ট্রক, সাবধান থেকো, বিচক্ষণ, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি ওখানে যাচ্ছো, ঘুণাক্ষরেও কারু কাছে সে-কথা প্রকাশ কোরো না–যদি একেবারে জরুরি হয়ে পড়ে, না-বললেই চলে না, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তুমি-এর আগে বহুবার তোমার কূটকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। আমি ঠিক জানি তুমি তোমার কাজে সফল হবেই।

আমি তাকে শুধু একটাই কথা জিগেস করেছি, কবে আমাকে রওনা হতে হবে?

কাল।

কাল, আমি ওয়াশিংটন থেকে বেরুবো, আর পরশুদিনই মরগ্যানটনে পৌঁছে। যাবো।

ভবিষ্যৎ যে আমার জন্যে কী-সব মৎলব এঁটে রেখেছিলো, তা যদি তখন আমি স্বপ্নেও টের পেতুম!

তক্ষুনি আমি বাড়ি ফিরে এসে যাবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলুম। আর পরদিন সন্ধেবেলায় আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলুম র্যলেতে। সেখানে সে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন বিকেলবেলায় আমি মরগ্যানটনের রেলস্টেশনে গিয়ে পৌঁছেলুম।

মরগ্যানটন শহরটা ছোটো, জুরাসিক যুগের ভূস্তরের উপর গড়ে উঠেছে শহরটা–অজস্র কয়লা আছে এখানে। এর যত সমৃদ্ধির পেছনে আছে এর যত কয়লাখাদান। এখানে অবশ্য অনেকরকম ধাতুতে ভরা জলও আছে বিপুল পরিমাণে, তাই গ্রীষ্মকালে সেখানে বাইরে থেকে অজস্র লোক আসে স্বাস্থ্যোদ্ধারে। মরগ্যানটনকে ঘিরে আছে সুজলাসুফলা সব খেতখামার-প্রচুর ভুট্টা আর মকাই গজায় এখানে। জায়গাটা জলাভূমির মাঝখানে, শ্যাওলা আর খাগড়াবনও আছে অনেক। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে চিরহরিৎ গাছের অরণ্য। জায়গাটায় যা নেই তা হলো প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস, যে-গ্যাস শক্তি জোগায়, আলো আর উত্তাপ দেয়, যার অফুরান উৎস আছে। আলেঘেনি উপত্যকায়। একেবারে পাহাড়ের গায়ের বনজঙ্গলের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। কত-যে গ্রাম আর কত-যে খামার। কাজেই গ্রেট আইরি যদি সত্যি-সত্যি কোনো আধো ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি

হয়, যদি তার উপদ্রব পৌঁছে যায় প্লেজেন্ট গার্ডেন আর মরগ্যানটনে, তাহলে কত লোক যে বিপন্ন হবে, ধনে-প্রাণে মারা যাবে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

মরগ্যানটনের মেয়র, জনৈক মিস্টার এলিয়াস স্মিথ, মানুষটা দশাসই, কেবল যে লম্বাচওড়া তা-ই নয়, স্বাস্থ্যে আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, বয়েস হবে চল্লিশ বৎসর কি তার একটু বেশি, দেখে মনে হয় দুই আমেরিকার সমস্ত চিকিৎসকরাই তাদের ব্যাবসা মাঠে মারা যাবে বলে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবেন। মানুষটা আবার ওস্তাদ শিকারিও, অনেক ভালুক আর প্যান্থর মেরেছেন, আলেঘেনি উপত্যকার গভীর বনে বা বন্য খাতে এখনও যে-সব জন্তুর মস্ত প্রাদুর্ভাব।

মিস্টার স্মিথ নিজেই একজন ধনাঢ্য জমিমালিক, আশপাশে তার অনেকগুলো খেতখামার ছড়িয়ে আছে। এমনকী অনেক দূরে-দূরেও যে-সব রায়ৎ আছে, তাদেরও কাজ-কারবার তিনি বারবার ঘুরে-ফিরে পর্যবেক্ষণ করে দ্যাখেন। সত্যি-বলতে, সরকারি কাজে যখন তার মরগ্যানটনের তথাকথিত প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকতে হয় না, তখনই তিনি আশপাশের জমিজিরেতে ঘুরে বেড়ান, আর শিকারের উত্তেজনা তাকে টেনে-টেনে নিয়ে যায় বনেজঙ্গলে, নিবিড় অরণ্যদেশে।

মরগ্যানটন পৌঁছেই আমি সরাসরি মিস্টার স্মিথের বাড়ি চলে গেলুম। তিনি জানতেন যে আমি আসবো, টেলিগ্রাম করে আগেই তাকে খবর পাঠানো হয়েছিলো, তাই তখন তিনি আমারই অপেক্ষায় বসে ছিলেন। দরাজভঙ্গিতেই আমায় আপ্যায়ন করলেন এলিয়াস স্মিথ, কোনো ভদ্রতার ভড়ং ছাড়াই, মুখে পাইপ, টেবিলের ওপর ব্র্যান্ডি ভরা গেলাশ। তক্ষুনি একটি ভৃত্য দ্বিতীয় আরেকটি গেলাশ নিয়ে এসে হাজির, আর আমাকে

পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করে তক্ষুনি দু-টেক ব্র্যান্ডি খেতে হলো, তবেই আমি কথাবার্তা শুরু করতে পারলুম।

মিস্টার ওয়ার্ড আপনাকে পাঠিয়েছেন, সাদর আপ্যায়ন করে আমাকে তিনি বললেন, আসুন, মিস্টার ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য পান করা যাক।

তার গেলাশের সঙ্গে আমার গেলাশ ঠোকাঠুকি করে আমি পুলিশের বড়কর্তার স্বাস্থ্য পান করলুম।

তারপর? এলিয়াস স্মিথ জানতে চাইলেন, এবার বলুন, তার উদ্বেগের কারণ কী?

আমি তখন মরগ্যানটনের মেয়রের কাছে খুলে বললুম কেন আমি হঠাৎ নর্থ ক্যারোলাইনায় এসে হাজির হয়েছি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে এও বললুম যে আমার বড়োকর্তা আমার হাতে পূর্ণ দায়িত্বই শুধু দেননি, গ্রেট আইরির নিদ্রাভঙ্গের দরুন এই অঞ্চলে যে-রহস্য আর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধান করবার জন্যে যা-যা লাগে সবরকম সাহায্য করতেও প্রস্তুত-আর্থিক বা অন্য-যে-কোনোরকম সাহায্যই তার কাছ থেকে সবসময় পাওয়া যাবে।

টু শব্দটি না-করে এলিয়াস স্মিথ প্রথমে আমার সব কথা শুনলেন বটে, তবে মধ্যে-মধ্যে আমার আর তার শূন্য গেলাশগুলি পূর্ণ করে দিতে ভোলেননি। সারাক্ষণ এরই মধ্যে তার পাইপ টেনে চলছিলেন তিনি; তাতে যদি মনে হয় তিনি আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছিলেন না তাহলে কিন্তু ভুল করা হবে–তার বাইরের ভোলটা প্রতারক, আসলে তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গেই আমার প্রতিটি শব্দ শুনছিলেন। মাঝে-মাঝেই তার গণ্ডদেশ

আরক্ত হয়ে উঠছিলো, আর তার ঝোঁপের মতো ভুরুর তলায় চোখ দুটি কেবলই ঝকঝক করে উঠছিলো। স্পষ্টই বোঝা গেলো, মরগ্যানটনের চীফ ম্যাজিস্ট্রেটও গ্রেট আইরিকে নিয়ে বিষম অস্বস্তিতে আছেন, কেন-যে পাহাড়ে এতসব অদ্ভুত ও রহস্যময় ঘটনা ঘটছে, তার মূল কারণটা খুঁজে বার করবার জন্যে তিনিও আমার মতোই। আগ্রহী, শুধু আগ্রহী নয়, উৎসুকও।

আমার কাহন শেষ হয়ে যাবার পর এলিয়াস স্মিথ চুপ করে বসে আমাকে খানিকক্ষণ শুধু নিরীক্ষণ করলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, তাহলে ওয়াশিংটনে কর্তারা জানতে চাচ্ছেন গ্রেট আইরি তার পেটের মধ্যে কী জিনিশ লুকিয়ে রেখেছে?

ঠিক তাই, মিস্টার স্মিথ।

আর আপনিও ঠিক তা-ই জানতে চাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমি তা জানতে চাই, মিস্টার স্ট্রক।

কৌতূহলে তিনি আর আমি দুজনেই সমান।

আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে তিনি বললেন, জমির মালিক হিশেবে গ্রেট আইরির ও-সব তাজ্জব ঘটনায় আমি কতটা উৎকণ্ঠিত হয়ে

আছি। আর মেয়র হিশেবে আমার এলাকার লোকজনকে রক্ষা করার একটা দায়িত্বও আমার আছে।

পাহাড়ে যে কী অদ্ভুত রহস্য এসে ঘনিয়েছে, তার কারণ জানবার জন্যে আপনার ডবোল উৎকণ্ঠা থাকাই স্বাভাবিক। আমি তাকে জানালুম, আপনার কাছে পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলে ঠেকেছে–তবে প্রহেলিকাটি নিশ্চয়ই নিরীহ কিছু নয়–আপনার এই এলাকার লোকজনের নিরাপত্তা তার সঙ্গে জড়ানো বলে এর মধ্যে ভয়াবহ বিপত্তিরও সম্ভাবনা আছে।

দুর্বোধ্য যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, মিস্টার স্ট্রক। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমি নিজে কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যে গ্রেট আইরি কোনো আগ্নেয়গিরি। আলেঘেনিরা কোথাওই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়নি। আমি নিজে আশপাশে কোথাও লাভা, গন্ধক বা বিস্ফোরক-চুরমার পাথর দেখতে পাইনি। সেইজন্যেই আমার মনে হয় না যে এ থেকে আচমকা মরগ্যানটনের কোনো বিপদ হতে পারে।

এ থেকে যে বিপদ হতে পারে, তা কি আপনার সত্যি কোনোদিন মনে হয়নি, মিস্টার স্মিথ?

কোনোদিনও না।

কিন্তু এই-যে লোকে বলছে চারপাশে মাটি কেঁপে উঠেছিলো?

হুঁ, মাটি কেঁপে উঠেছিলো! ভূমিকম্প! এলিয়াস স্মিথ মাথা নেড়ে কথাগুলো আওড়ালেন একবার। কিন্তু এটা কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে সত্যি-সত্যিই মাটি কেঁপে উঠেছিলো? শিখাগুলো তখন লকলক করে আকাশ চাটছিলো, আমি তখন উইলডনে আমার খামারবাড়িতে ছিলুম–গ্রেট আইরি থেকে তার দূরত্ব এক মাইলেরও কম। সত্যি-যে বাতাসে একটা তুমুল আলোড়ন, একটা তুমুল ঝাঁপটা উঠেছিলো, কিন্তু মাটি কেঁপে উঠছে বলে আমি একবারও টের পাইনি।

কিন্তু মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে যে-সব প্রতিবেদন গেছে

ও-সব প্রতিবেদন লোকে পাঠিয়েছে আতঙ্কের মুহূর্তে, মরগ্যানটনের মেয়র আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমার প্রতিবেদনে তো আমি কোনো ভূকম্পনের কথা উল্লেখ করিনি।

আর, শিখরের ওপরে ঐ-যে দাউদাউ-জ্বলা শিখাগুলো?

হ্যাঁ, শিখাগুলো। সেগুলোর কথা আলাদা, মিস্টার স্ট্রক। আমি তাদের দেখেছি; আমি তাদের স্বচক্ষে দেখেছি, তাছাড়া মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে তা অনেক মাইল দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিলো। তাছাড়া গ্রেট আইরি-র পেট থেকেও গুমগুম আওয়াজ বেরুচ্ছিলো, না, গুমগুম নয়, হিস-হিস শব্দ, যেন একটা মস্ত বয়লার থেকে বাষ্প বেরিয়ে আসছে।

বিশ্বাসযোগ্য-নির্ভরযোগ্য কোনো সাক্ষী আছে এর?

হ্যাঁ, আমার নিজের কানে শোনা–

আর এই হিস-হিস আওয়াজের মধ্যে, মিস্টার স্মিথ, আপনার কি মনে হয় আপনি । সবচেয়ে তাজ্জব জিনিশটা শুনেছিলেন–মস্ত সব পাখার ঝাঁপট?

আমার তা-ই মনে হয়েছিলো, মিস্টার স্ট্রক। কিন্তু সে-কোন অতিকায় পাখি সেটা–শিখাগুলো নিভে যাবার পর যে ওখান থেকে উড়ে গিয়েছিলো? সে-কোন পাখি সে, যার ডানার ঝাঁপট থেকে অমন প্রচণ্ড আওয়াজ বেরুতে পারে? সেইজন্যেই আমি নিজেকেও সন্দেহ করেছি–সে কি ছিলো আমারই কল্পনার কোনো বেঘোরবিভ্রম? গ্রেট আইরি আকাশের অজানা অপদেবতার আস্তানা! এ-যে নিছকই মতিভ্রম ছাড়া আর-কিছু। নয়। যদি কোনো অতিকায় পাখি ঐ পাথরের মাঝখানে বাসা বেঁধে থাকে, তবে সে কি অনেক আগেই ওখান থেকে উড়ে যেতো না? সে কি ইতিহাসের অগোচর কোনো পাখি নয়? এটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, মিস্টার স্ট্রক। এর কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই।

কিন্তু আমরা এই রহস্যের জট ছাড়াবো, মিস্টার স্মিথ, অবশ্য যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন।

নিশ্চয়ই, মিস্টার স্ট্রক। কাল থেকেই আমরা আমাদের অভিযান শুরু করবো।

তাহলে, কাল। আর এই কথার পরেই মেয়রের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়েছিলুম। সেখান থেকে সোজা আমি চলে গিয়েছি একটা হোটেলে, ঘর ভাড়া করার সময় বলেছি আমাকে যে কতদিন এখানে থাকতে হবে, তা আমি নিজেই জানি না। তারপর লাঞ্চের শেষে মিস্টার ওয়ার্ডকে সব লিখে জানালুম। বিকেলবেলায় আরো একবার মিস্টার

স্মিথের সঙ্গে দেখা করেছিলুম আমি । ঠিক হলো, দিন ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে নিয়ে মরগ্যানটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।

আমাদের প্রথম কাজ, পাহাড়ে ওঠবার ব্যবস্থা করা–ঠিক হলো সঙ্গে দুজন অভিজ্ঞ গাইড নেয়া হবে, যারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এই পর্বতারোহীরা মাউন্ট মিচেল ও ব্লরিজ শৈলশ্রেণীর অন্যান্য শিখরে চড়েছে আগে, তবে কখনোই গ্রেট আইরির শিখরে ওঠবার চেষ্টা করেনি, কেননা কিংবদন্তি এই রকমই যে গ্রেট আইরির চারপাশেই আছে সটান-খাড়া অগম্য সব পাথুরে দেয়াল। তাছাড়া সাম্প্রতিক চমকপ্রদ ব্যাপারস্যাপারের আগে গ্রেট আইরি কখনোই পর্যটকদের তেমন-একটা আকৃষ্ট করেনি। মিস্টার স্মিথ ব্যক্তিগতভাবে গাইড দুজনকে চিনতেন, তারা দুঃসাহসী, দক্ষ আর নির্ভরযোগ্য। কোনো বাধাবিপত্তির কাছেই তারা মাথা নোয়বে না–আর আমরা ঠিক করেছিলুম আমরা সবসময়েই সবকিছুতেই পদে-পদে তাদের অনুসরণ করে চলবো।

তাছাড়া মিস্টার স্মিথ শেষটায় এ-কথা বলেছিলেন হয়তো গ্রেট আইরি এখন আর আগের মতো তেমন দুরারোহও নয়।

শুনে, আমি জিগেস করেছিলুম : কেন?

কারণ সম্প্রতি মস্ত-এক পাথর শিখর থেকে ভেঙে নিচে খসে পড়েছে-আর তাইতে হয়তো ভেতরে যাবার মতো সুগম একটা পথ তৈরি হয়ে গেছে।

সে-হলে তো বলতেই হয় আমাদের কপাল ভালো।

কপাল ভালো কি মন্দ, তা আমরা কালকেই জানতে পারবো, মিস্টার স্ট্রক।

তাহলে, কাল।

.

৩. গ্রেট আইরি : কোন্ ঈগলের বাসা

পরদিন ভোরবেলায়, এলিয়াস স্মিথ আর আমি মরগ্যানটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তাটা গেছে কাতাওয়াবা নদীর বাম তীর ধরে এঁকেবেঁকে ঘুরে-ঘুরে, সোজা গিয়ে পৌঁছেছে প্লেজেন্ট গার্ডেনে। যে-দুজন গাইড আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের একজন হ্যারি হর্ন, তিরিশ বছর বয়েস, অন্যজন জেমস ব্রাক, পঁচিশ বছর। তারা দুজনেই স্থানীয় লোক, আর যত পর্যটক এখানে আসে এবং ব্লু রিজ আর কাম্বারল্যাণ্ড পাহাড়ের ওপর উঠতে চায় তাদের কাছে এই দুজনের চাহিদা অসীম।

দুই-ঘোড়ায়-টানা একটা হালকা ওয়াগন জোগাড় করা হয়েছিলো, ব্লু রিজ শৈলশ্রেণীর একেবারে পাদদেশ অব্দি আমাদের নিয়ে যাবে ওয়াগনটা। তাতে তোলা হয়েছিলো দু-তিনদিনের উপযোগী রসদ–আশা ছিলো তার চেয়ে বেশি সময় আমাদের পাহাড়ে-পাহাড়ে কাটাতে হবে না। মিস্টার স্মিথ তো প্রচুর পরিমাণে মদ্য-মাংস সরবরাহ করতে পেরে ভারি খুশি। জলের জন্যে তো কোনো ভাবনা নেই, পাহাড়ি ঝরনা থেকে যত চাই তত টলটলে টাটকা জল পাওয়া যাবে, এখানে বসন্তে এত বর্ষাবদল হতে থাকে যে ঝরনার জল বছরের এই সময়টায় যেন উপচে পড়ে।

যদিও গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বেরিয়েছেন, মরগ্যানটনের মেয়র কিন্তু কাজের সঙ্গে তার খেয়ালখুশি জড়িয়ে ফেলতে ভোলেননিঃ শিকারি হিশেবে সঙ্গে এনেছেন তার বন্দুক, আর শিকারি কুকুর নিস্কো, সে পরমোৎসাহে আমাদের ওয়াগনের পেছন-পেছন ছুটে আসছে-বাইরে বেরুতে পেরে তার খুশি আর ধরে না। নিস্কোকে অবশ্যি উইলডনের খামারবাড়িতে রেখে যাবার কথা–কারণ সেখান থেকেই আমরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করবো। সে নিশ্চয়ই গ্রেট আইরির শিখর অব্দি আমাদের পেছন-পেছন যেতে পারবে না–একে তো ঢালটা খাড়া উঠে গেছে, তার ওপর মাঝে-মাকে পড়বে মস্ত সব ফাটল।

দিনটা চমৎকার ফুটেছিলো, টাটকা হাওয়ায় তখন এপ্রিলের সকালের হালকা ঠাণ্ডা আমেজ। মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে হালকা শাদা মেঘের পাঁজা, দূর অ্যাটলান্টিক থেকে মস্ত উপত্যকা পেরিয়ে যে-হাওয়া আসছে তারাই এই হালকা শাদা মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সূর্য মাঝে-মাঝেই উঁকি মারছে মেঘের আড়াল থেকে, আলো করে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জের নতুন শ্যামলিমা।

যে-বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, তাতে যেন অফুরান জীবজন্তুর মেলা বসে গেছে। আমাদের ওয়াগনের চাকার শব্দ শুনে হুড়মুড় ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। কাঠবেড়ালি, মেঠোইঁদুর, ঝলমলে সব পালকে সাজানো প্যারাকীট–তাদের অবিশ্রাম ডাকাডাকিতে কানে যেন তালা ধরে যায়, লাফিয়ে-লাফিয়ে আমাদের পেরিয়ে গেলো ওপোসুমরা, থলের মধ্যে বাচ্চাগুলোকে সাবধানে আগলে রেখে। পিপুল, তাল, রডোডেনড্রনের গুচ্ছ–আর তাদের ঘন পাতার ফাঁকে-ফাঁকে কত ধরনের যে পাখি, তার আর ইয়ত্তা নেই, সবগুলো আমি আবার চিনিও না।

আমরা প্লেজেন্ট গার্ডেনে এসে পৌঁছুলুম সন্ধেবেলায়। সেখানে আমরা বেশ আরামে-গরমেই আশ্রয় পেলুম প্লেজেন্ট গার্ডেনের মেয়রের বাড়িতে, তিনি আবার মিস্টার স্মিথের বিশেষ বন্ধু। প্লেজেন্ট গার্ডেন নেহাৎ অজ পাড়াগাঁ, কিন্তু তার মেয়র তবু উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের, বিশেষভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন আমাদের। কতগুলো বিশাল বীচগাছের ছায়ায় তার চমৎকার বাড়িটা–সেখানে বেশ পরিতোষভরেই রাজসিক আহারবিহার করা গেলো।

স্বভাবতই আলোচনাটা ফিরে-ফিরে এলো আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্যটায়–আমরা যে গ্রেট আইরির ভেতরটায় গিয়ে তার পেটের কথা টেনে বার করতে চাচ্ছি, সব কথাবার্তা সেখানটাতেই আসতে লাগলো ঘুরে-ফিরে । আপনারা ঠিকই করেছেন, বললেন আমাদের গৃহকর্তা, যতক্ষণ-না আমরা জানতে পারছি গ্রেট আইরির পেটের মধ্যে কী আছে, ততক্ষণ এখানকার বাসিন্দারা ভয়ে-শঙ্কায় অস্থির হয়ে দিন কাটাবে।

গ্রেট আইরির ওপর সেই-যে দাউদাউ শিখা দেখা দিয়েছিলো, আমি জিগেস করলুম, তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত নতুন-কিছু ঘটেনি কি?

কিছুই না, মিস্টার স্ট্রক। প্লেজেন্ট গার্ডেন থেকে আমরা পাহাড়ের পুরো শিখরটাই দেখতে পাই। কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ ভেসে আসেনি সেখান থেকে। কোনো ফুলকি ওঠেনি আগুনের। যদি-বা একপাল শয়তান এসে ওখানে আস্তানা গেড়ে থাকে, তবে এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই তাদের নারকীয় রান্নাবান্না শেষ করে ফেলেছে-তারপর ভুরিভোজ সেরে হয়তো অন্য-কোনো আস্তানায় চলে গিয়েছে।

শয়তান! মিস্টার স্মিথ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।আশা করি তাদের কাজকর্মের কোনো নিশানা ফেলে না রেখে তারা তাদের শিবির তোলেনি–দু-একটা পায়ের খুর, মাথার শিং কিংবা ল্যাজের ডগা নিশ্চয়ই ফেলে গেছে তারা। আমরা সে-সব খুঁজে বার করবো।

পরদিন, উনত্রিশে এপ্রিল, আবার আমরা ভোরবেলাতেই রওনা হয়ে পড়লুম। দ্বিতীয় দিনের শেষে-আমরা আশা করেছিলাম–পাহাড়ের পায়ের কাছে উইলডনের খামারবাড়িটায় পৌঁছে যাবো। যে-তরাইটার মধ্য দিয়ে চলেছি, সেটা হুবহু গতকালকার মতোই, তবে ছোট্ট একটা তফাৎও আছে–পথ ক্রমশ ঘুরে-ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। একান্তভাবে পথে পড়ছে বনজঙ্গল অথবা জলাভূমি, যদিও জলাশয়গুলোর সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে; যত ওপরে উঠছি মনে হচ্ছে রোদ্দুর তাদের গষে-গষে শুষে ফেলেছে। এখানটায় লোকজনের বসতিও তেমন নেই। ছোট-ছোট্ট কয়েকটা হ্যামলেট, বীচগাছের তলায় তারা যেন প্রায় হারিয়েই গেছে, মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে নিঃসঙ্গ একেকটা খামারবাড়ি, কত-যে ছোটোছোটো সোঁতা নেমে এসেছে জল নিয়ে, নিচে গিয়ে আছড়ে পড়ছে কাতাওয়াবা নদীর খাতে।

খুদে-খুদে সব পাখি আর ছোটো ছোটো জানোয়ারের সংখ্যা অবশ্য আরো-অনেক বেড়ে গিয়েছে। বড় লোভ হচ্ছে, কন্দুকটা বার করে নিয়ে নিস্কোর সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে যাই, দু-একবার কথাটা পেড়েছেন মিস্টার স্মিথ, আমার জীবনে এইই প্রথম বার আমি এখানটা দিয়ে যাচ্ছি, অথচ কোনো তিতির বা খরগোশ মারছি না। বেচারা জীবজন্তুগুলো পরে হয়তো আমায় চিনতেই পারবে না। তবে আমাদের কাছে যে যথেষ্ট খাবারদাবার আছে তা-ই নয়, পরে আজ আমাদের বড়োকোনোকিছুকে তাড়া করে যেতে হবে। তাড়া করতে হবে রহস্যকে।

আর, আশা করা যাক, আমি ফোড়ন কেটেছি, আমাদের নিরাশ শিকারি হয়ে ফিরে আসতে হবে না।

বিকেলবেলায় ব্লুরিজ-এর পুরো মালাটাই, মাইল ছয়েক দূরে, আমাদের চোখের সামনে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে গেলো। স্বচ্ছনীল আকাশের পটে শিখরগুলো যেন আরো-গাঢ় নীল রঙে স্পষ্ট করে আঁকা, নিচের দিকে নিবিড় বনানী, যত ওপরে উঠেছে ততই রুক্ষ ফাঁকা পাথুরে ঢাল, শিখর অব্দি তারপর উঠে গেছে কেবল স্থগিতবৃদ্ধি বেঁটে বেঁটে চিরহরিতের ঝোঁপ। শুটকো সিঁড়িঙে সব গাছ, কিম্ভুতভাবে তেড়েবেঁকে-যাওয়া, সেই পাথুরে শিখরকে কি-রকম যেন উদ্ভট আর বিমর্ষ বানিয়ে তুলেছে। এখানে-সেখানে শৈলশিরা উঠে গিয়েছে তীক্ষ্ণ চূড়ায়, আমাদের ডানদিকে আছে কালো গম্বুজ, ব্ল্যাক ডোম, প্রায় সাতহাজার ফিট ওপরে সে তার অতিকায় মাথা তুলেছে, মাঝে-মাঝে তার চুড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে ঝকমক করে উঠছে।

আপনি কখনও ঐ গম্বুজটার ওপরে উঠেছেন, মিস্টার স্মিথ? আমি জিগেস করেছি।

না, উত্তর দিয়েছেন এলিয়াস স্মিথ, তবে শুনেছি যে ঐ চূড়ায় ওঠা নাকি দারুণ কঠিন ব্যাপার। কয়েকজন পর্বতারোহী অবশ্য চূড়াটায় উঠেছিলো, তারা জানিয়েছে সেখান থেকে গ্রেট আইরির পেটের মধ্যে নাকি কিছুতেই দেখা যায় না।

ঠিক বলেছে তারা, বলেছে আমাদের গাইড হ্যারি হর্ন, আমি নিজেও দু-একবার চেষ্টা করে দেখেছি।

হয়তো, আমি সান্ত্বনা দিয়েছি, আবহাওয়া মেঘলা ছিলো।

মোটেই না, মিস্টার স্ট্রক, বরং আমি যেদিন উঠেছিলুম, সেদিন আবহাওয়া ছিলো চমৎকার–এত স্বচ্ছ সাধারণত থাকে না। কিন্তু গ্রেট আইরির দেয়াল এত খাড়াভাবে আকাশে উঠে গিয়েছে যে ভেতরটা সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছে।

সামনে, সামনে, মিস্টার স্মিথ চেঁচিয়ে উঠেছেন, ফরওয়ার্ড। যেখানে কেউ আগে কখনও পা ফ্যালেনি, কিংবা চাক্ষুষ দ্যাখেনি যে-জায়গা, এমনকী দেবদূতেরাও না, সেখানে গিয়ে প্রথম পা ফেলতে আমার কোনো দুঃখই হবে না!

সত্যিই, এমন-এক চমৎকার দিন ছিলো সেটা যে গ্রেট আইরিকে তখন দেখিয়েছে। ধীরগম্ভীর, প্রশান্ত, তার দিকে তাকিয়ে আমরা কোনো শিখা বা কোনো ধোঁয়ার রেশও দেখতে পাইনি।

বেলা পাঁচটা নাগাদ আমাদের অভিযান এসে থেমেছে উইলডন খামারে, যেখানে ভাড়াটেরা সবাই বেরিয়ে এসে একযোগে অভ্যর্থনা জানিয়েছে তাদের ভূস্বামীকে। তারা আমাদের আশ্বাস দিয়ে চলেছে গত কয়েকদিনে গ্রেট আইরিতে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনাই ঘটেনি। আমরা সবাই মিলে তারপর একটা মস্ত টেবিলে ভোজে বসেছি, খামারের সবাইও আমাদের সঙ্গে সেখানে খেতে বসেছে, আর সে-রাতে আমাদের ঘুম হয়েছে। গভীর, নিরুপদ্রব, ভবিষ্যতের কোনো অলুক্ষুণে আশঙ্কাই ঘুমের মধ্যেটায় হানা দেয়নি।

পরেরদিন, আলো ফোটবার আগেই, আমরা পাহাড়ে ওঠবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি। গ্রেট আইরির উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিটও হবে কি না সন্দেহ। নেহাৎ নাতি উচ্চ শিখর, আলেঘেনির এই অংশে এর চাইতে উঁচু শিখর আছে কতগুলো । আমরা যেহেতু তখন সমুদ্রতল থেকে তিনহাজার ফিট উঁচুতে ছিলুম, পাহাড়ে ওঠবার ক্লান্তি তাই ঘুব একটা বেশি হবার কথা নয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চয়ই আমরা শিখরের ওপর জ্বালামুখের কাছে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো। বাধাবিঘ্ন হয়তো থাকবে কিছু-কিছু, বেয়ে উঠতে হবে খাড়া ঢাল, শৈলশিরা, আর শৈলশ্রেণীর মধ্যেকার ফাটলগুলো হয়তো আমাদের বাধ্য করবে ক্লান্তিকর ও বিপজ্জনক ঘুরপথ দিয়ে যেতে। এই পাকদণ্ডী সম্পূর্ণ অজানা মানুষের, আমাদের প্রচেষ্টার পেছনে তাই একটা অদ্ভুত তাড়াও ছিলো– অজানাকে জয় করে নেবার তাড়া। এখান থেকে যে-উৎরাই শুরু, সেখানটা আমাদের গাইডদেরও অচেনা। আমাকে যেটা উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিলো, তা এই তথ্য : এর আগে সবাই বলেছে যে গ্রেট আইরি শুধু দুর্গম নয়, সম্পূর্ণ অগম্য। কিন্তু তা তো আর তর্কাতীতভাবে প্রমাণ হয়নি। তারপর আরেকটা নতুন উৎপাতের কথাও ভুললে চলবে না : কোনো নতুন ধস নেমে হয়তো পাথুরে ঢালটায় মস্ত-একটা ফাঁকা গহ্বর তৈরি করে দিয়ে গেছে।

অবশেষে, দিনে গোটা-কুড়িবার পাইপে তামাক ভরে পাইপ টানেন মিস্টার স্মিথ, এবার তার প্রথমটা ফুঁকতে-যুঁকতে তিনি আমায় বলেছেন, অবশেষে সত্যি অভিযান শুরু হলো আমাদের। উঠতে কত সময় লাগবে, অল্প, না বেশি

আমি বাধা দিয়ে বলেছি, অল্পই লাগুক, আর বেশিই লাগুক, আপনি আর আমি তো প্রতিজ্ঞাই করেছি যে এর শেষ না-দেখে ফিরবো না।

হ্যাঁ, সেটাই তো প্রতিজ্ঞা।

আমার বড়োকর্তা আমার কাঁধে দায় চাপিয়ে দিয়েছেন-যে-করেই হোক, গ্রেট আইরির দানবের সমস্ত রহস্য আমায় ভেদ করতে হবে।

দানবের কাছ থেকে গুপ্ত রহস্য আমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসবো, তা সে তা পছন্দ করুক, চাই না-করুক। অন্তরীক্ষকে সাক্ষী রেখে শপথ করেছেন মিস্টার স্মিথ, তাতে যদি পাহাড়ের আঁতের মধ্যে গিয়েও খোঁজাখুঁজি করতে হয়, তাও সই।

তার একটা সম্ভাবনা এই হতে পারে যে, আমি বলেছি, আমাদের অভিযান হয়তো আজকের দিনটাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। সেইজন্যে লটবহর ও রসদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নেয়া ভালো।

আশ্বস্ত হোন, মিস্টার স্ট্রক। আমাদের গাইডদের ন্যাপস্যাকে দু-দিনের উপযোগী খাবারদাবার আছে। তাছাড়া আমরাও তো কিছু খাদ্য বহন করে চলেছি। যদিও আমার বেপরোয়া নিস্কোকে আমি খামারে রেখে এসেছি, তবু সঙ্গে বন্দুকটা আনতে আমি ভুলিনি। বনের মধ্যে কিংবা নয়ানজুলিগুলোয় বিস্তর শিকার মিলবে-আর শিখরে উঠে আমরা হয়তো একটা অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাবো, যেখানে দিব্বি ঝলসানো যাবে মাংস, রসুই পাকাতে আমাদের কোনোই ঝামেলা হবে না।

অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাবেন, মিস্টার স্মিথ?

কেন নয়, মিস্টার স্ট্রক? ঐ শিখাগুলো! ঐ চমৎকার লকলকে লেলিহান শিখাগুলো! যা দেখে গাঁ-গঞ্জের লোক ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে! সেই আগুন কি বরফহিম নাকি? তাদের ছাইয়ের তলায় কোনোই ফুলকি পাওয়া যাবে না বুঝি? আর, তারপর ধরুন, এটা যদি সত্যি কোনো জ্বালামুখ হয়, আগ্নেয়গিরি কি তবে একেবারেই নিভে গেছে যে জ্বলন্ত একটা অঙ্গারও পাওয়া যাবে না? বাহ্, তাহলে এ আবার কেমনতর আগ্নেয়গিরি-যে একটা ডিম ভাজা যাবে না বা আলু ঝলসে নেয়া যাবে না? চলুন, চলুন, দেখাই যাক কী আছে ঐ পেটে–ঐ পাথরের জঠরে!

তদন্তের এখানটায় এসেও, প্রথমেই কবুল করে নেয়া ভালো, আমি কোনো তত্ত্বই খাড়া করিনি। আমার ওপর হুকুম হয়েছে গ্রেট আইরিকে সরেজমিন খুঁটিয়ে দেখে আসতে হবে। যদি মনে হয় যে সে একেবারেই নিরীহ, নিরুপদ্রব, কোনো উৎপাতেরই আশঙ্কা নেই, তবে তা ঘোষণা করে দেয়াই হবে আমার কাজ, কেননা তাহলে এখানকার লোকজন আশ্বস্ত হতে পারবে, নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তবে, এও কবুল করা ভালো, আমার মধ্যে বিষম কৌতূহল হানা দিয়েছিলো। আমার বরং ভালোই লাগবে, নিজের জন্যেও বটে, আমার অভিযানের জন্যেও বটে, যদি গ্রেট আইরির এই চমকপ্রদ কাণ্ডকীর্তির আসল কারণটা আমি বার করতে পারি।

আমাদের পর্বতারোহণ শুরু হলো এইভাবে : গাইড দুজন যাবে আগে-আগে, খুঁজে দেখবে কোন পথ ধরে এগুলে, বা উঠলে, সুবিধে হবে। এলিয়াস স্মিথ আর আমি এগুবো অপেক্ষাকৃত গদাইলস্করি চালে। একটা সংকীর্ণ গিরিসংকট বেয়ে পাথর আর গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছি গোড়ায়, খুদে একটা স্রোতস্বিনী সুতোর মতো ঝরে পড়েছে আমার পায়ের তলায়।বর্ষাকালে, কিংবা কখনও কোনো মুষলধারে বর্ষণের পরে,

এর জল নিশ্চয়ই পাথর থেকে পাথরে ঝমঝম করে আছড়ে পড়ে নামে। তবে এর খাতকে নিশ্চয়ই বৃষ্টিই জল খাওয়ায়, কারণ এখন তার ধারাটা সুতোর মতো বয়ে চলেছে। গ্রেট আইরির ভেতরকার কোনো মস্ত হ্রদের জল বেরুবার রাস্তা নিশ্চয়ই এটা নয়।

এক ঘণ্টা ধরে ওঠবার পর, পাহাড়ের ঢাল এতটাই খাড়া হয়ে পড়েছিলো যে আমাদের বেঁকে-বেঁকে যেতে হয়েছে, কখনও ডানদিকে, কখনও বামদিকে, আর আমাদের গতিও খুব মন্থর হয়ে এসেছে। একটু পরেই এই সংকীর্ণ গিরিসংকটটি পুরোপুরি অসাধ্য হয়ে উঠলো; এর পাহাড়ি খাড়া ঢালে পা রাখবার মতো কোনো খাঁজ নেই। আমাদের হয় গাছের ডাল থেকে ঝুলে, নয়তো বুকে হেঁটে হামাগুড়ি গিয়ে এগুতে হয়েছে। এই গতিতে এগুলে সূর্যাস্তের আগে কিছুতেই শিখরে পৌঁছুনো যাবে না।

আস্থা, আস্থায় বুক বাঁধুন। হাঁফ ছাড়বার জন্যে একঝলক থেমে মিস্টার স্মিথ বলেছেন। এতক্ষণে বুঝতে পারছি কেন দু-একজন ছাড়া কেউই গ্রেট আইরির ওপরে উঠতে চায়নি–আর তাই আমার অন্তত জ্ঞানত মনে পড়ে না কেউ কখনও এর ওপর উঠেছে কি না।

আসলে, আমি সায় দিয়ে বলেছি, এত পরিশ্রম করে লাভটাই বা কী হতো, বলুন। আমাদের যদি ওপরে ওঠবার জন্যে বিশেষ কোনো তাগিদ না-থাকতো

এর চেয়ে সত্যকথা জীবনে আপনি আর-কিছু বলেননি,হ্যারি হর্ন ঘোষণা করেছে, আমাকে থামিয়ে দিয়ে, আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে কতবারই তো ব্ল্যাক ডোমের ওপরে উঠেছি, কিন্তু পথে কোনোবারই এত বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হয়নি।

বাধাবিঘ্নই শুধু নয়, এদের অতিক্রম করাও দুঃসাধ্য, জুড়ে দিয়েছে জেমস ব্রাক।

এখন যে-প্রশ্নটা কুট করে আমাদের মগজে কামড়াচ্ছে তা এই : কোন নতুন পথ ধরে এগুবো আমরা, বুঝবো কী করে সেই পথেই ওপরে ওঠা যাবে। বাঁয়ে যাবো, না কি ডানদিকে যাবো? দু-দিকেই উঠেছে গাছপালা ঝোঁপঝাড়ের দুর্ভেদ্য ঘন বুনোট। সত্যি-বলতে, এর চেয়ে সরাসরি শিখরে উঠে-যাওয়াও সহজ হতো। একবার যদি এই নিবিড় বনানী ভেদ করে ওপাশে চলে যেতে পারি তবে হয়তো নিশ্চিততর পদক্ষেপে আমরা অগ্রসর হত পারবো। এখন তো আমরা কেবল এগুতে পারি অন্ধের মতো, হাড়ে-হাড়ে; অন্ধের মতোই আমাদের এই দুজন গাইডের স্বজ্ঞা ও সহজাত বোধের ওপর নির্ভর করতে হবে এখন। জেমস ব্রাকের বোধবুদ্ধিই বেশি কাজে এসেছে তখন, আমার বিশ্বাস, এই দুঃসাহসী তরুণটি হালকা চলাফেরায় বাঁদরদেরও হার মানাতো, আর ক্ষিপ্রতায় ছাগলছানারাও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো না। দুর্ভাগ্যবশত, না এলিয়াস স্মিথ, না আমি শ্রীযুক্ত স্ট্রক, তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারি, সে যেখানে উঠতে পারে আমাদের পক্ষে সেখানে পা দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

তবে যখন সত্যিই কোনোকিছু করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে, আমি অবশ্য সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নই-কারু থেকেই পেছিয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না; ধাতের মধ্যেই একগুয়েমি আর জেদ আছে আমার, আর আমার জীবিকাটাই এমন যে

শরীরটাকে সবসময় সামলেসুমলে সক্ষম রাখতে হয়, জেমস ব্রাক যেখানে যেতে পারে, আমিও সেখানে যেতে পারবো–এতে যদি কয়েকবার বিষম আছাড় খেয়ে পড়তে হয়, তাতেও কুছ পরোয়া নেই। তবে মরগ্যানটনের চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন সহজ ছিলো না; একে তো তিনি আর মোটেই তরুণ নন, তেমন চটপটে বা ক্ষিপ্রও নন আর, দশাসই শরীর, ভারি, আর একটু ধকলেই কাবু হয়ে পড়েন। যথাসাধ্য করেছেন এলিয়াস স্মিথ, যাতে আমাদের অগ্রগতিতে কোনো বাধা না-পড়ে, কিন্তু সারাক্ষণ ডাঙার ওপর সীল মাছের মতো খাবি খেয়েছেন তিনি–শেষে, একটু পরেই, আমাকে জোর দিয়ে বলতে হয়েছে বিশ্রাম নেবার জন্যে আমাদের একটু থামা উচিত।

অর্থাৎ, বোঝাই যাচ্ছিলো যে আমরা যতটা আন্দাজ করেছিলুম, তার চেয়েও অনেক বেশি সময় লেগে যাবে গ্রেট আইরির ঈগলের বাসায় উঠতে হলে। আমরা ভেবে রেখেছিলুম এগারোটার মধ্যেই আমরা পাথুরে দেয়ালটার পায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছে যাবো, কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি মধ্যদিনের সূর্যও আমাদের তার থেকে কয়েকশো ফিট নিচে দেখতে পাবে।

দশটা নাগাদ, যখন বার-বার অপেক্ষাকৃত সহজ কোনো রাস্তা খোঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আমরা হন্যে হয়ে উঠেছি, কতবার মোড় ঘুরেছি, কতবার পাকদণ্ডী আমাদের ফিরিয়ে এনেছে একই জায়গায়, তখন গাইডদের একজন সংকেত করে আমাদের থামতে বললে। অবশেষে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করলুম ঐ নিবিড় বনের ওপরকার স্তরে। গাছগুলো এবার আর তেমন গায়ে-পড়া নয়, গায়ে-গায়ে জড়িয়ে নেই ঘননিবিড়, ফলে তাদের ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পেলুম সেই পাথুরে দেয়ালের তলদেশ যেখান থেকে ওপরে উঠে গিয়েছে সত্যিকার গ্রেট আইরি।

উঃফ! একটা মস্ত পাইনগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মিস্টার স্মিথ হাঁফ ছাড়লেন। একটু জিরিয়ে নেয়া যাক। সেই সঙ্গে একটু না হলে দারুন জমে যাবে।

আমি বললাম, এখানে আমরা এক ঘণ্টা জিরিয়ে নেবো।

হ্যাঁ-হ্যাঁ; ফুশফুশ আর পাগুলোকে এতক্ষণ ধরে খাঁটিয়ে নেবার পর আমাদের জঠরগুলোকেও এবার একটু খাটানো যাক।

এই একটা ব্যাপারে কারুরই কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হলো না। একটু বিশ্রাম সবাইকেই আবার চাঙা করে তুলবে। আমাদের অস্বস্তির শুধু একটাই কারণ : পাহাড়ের ঢালটা দেখে মোটেই মনোরম বলে মনে হচ্ছেন না। যে-জায়গাগুলোয় কোনো গাছপালা গজায় না স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে সরসরি-মসৃণপিছল ঢাল। মাটিও সেখানে একটু আলগা, মাঝে-মাঝে চোখাচোখা পাথর বেরিয়ে আছে, আর হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে-বেরুনো পাথরের মধ্যে কোনো রাস্তাই নেই।

হ্যারি হর্ন তার সহকর্মীকে বললে, কাজটা খুব সহজ হবে না।

অসম্ভবই হবে, হয়তো, ব্রাক সায় দিয়ে বললে।

তাদের এই মন্তব্য আমার গোপন অস্বস্তিটাকে আরো চাগিয়ে দিলে। পাহাড়ের চূড়ায় না-উঠেই যদি আমাকে ফিরে যেতে হয়, আমার অভিযান তাহলে সমূহ ব্যর্থ হবে–আর কৌতূহল চরিতার্থ করতে না-পারার দরুন কী-যে কষ্ট পাবো, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।

আর তারপর যখন মিস্টার ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, পরাস্ত ও লজ্জিত, আমাকে দেখে তখন রাস্তার অচেনা লোকেরও সহানুভূতি উথলে উঠবে।

ন্যাপস্যাকগুলো খুলে আমরা রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস দিয়েই মোটামুটিভাবে ভোজ সারলুম। খাওয়া শেষ হতেই, আধঘণ্টার মধ্যেই, মিস্টার স্মিথ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, সতেজ ও উৎসুক, আবারও এগিয়ে-যাওয়া যাক। জেমস ব্রাক চললো সকলের আগে আগে; আমরা শুধু যতটা ভালোভাবে পারি তাকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করলুম।

আমাদের চলা হলো ধীরমন্থর। আমাদের গাইডরা তাদের দ্বিধা ও সন্দেহ চাপবার কোনো চেষ্টাই করছে না। একটু পরেই হ্যারি হর্ন আমাদের ছেড়ে একাই এগিয়ে গেলো– কোন রাস্তায় গেলে সবচেয়ে সুবিধে হবে, সেটাই আন্দাজ করে নিতে।

কুড়ি মিনিট পরেই সে ফিরে এলো, আমাদের নিয়ে চললো উত্তরপশ্চিমে। এই দিকটাতেই তিন-চার মাইল দূরে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ব্ল্যাক ডোম। আমাদের পথ এখনও কঠিন, কষ্টকর, আলগা পাথরের ওপর দিয়ে গেছে পথ, কখনও পাথরগুলো আটকে আছে নেহাৎই বরাৎজোরে, কোনো ঝোঁপের গায়ে। অবশেষে, বিস্তর ধকলের পর, একেবারে নাজেহাল, আমরা আরো দুশো ফিট ওপরে উঠতে পারলুম, তারপরেই দেখলুম কাটা ঘায়ের মতো মস্ত হা করে আছে একটা গহ্বর, সেখান থেকে কবে যেন মাটি ধসে পড়েছে নিচে। এখানে-সেখানে দেখা গেলো সদ্য-উৎপাটিত গাছের শেকড়, ভাঙা-ভাঙা ডালপালা, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে-যাওয়া মস্ত-সব পাথরের চাই, যেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সদ্য-সদ্য একটা ধস নেমে গিয়েছে, আভালাঁশ।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

এটাই নিশ্চয়ই গ্রেট আইরির ওপর থেকে মস্ত পাথরটা ধসে পড়বার চিহ্ন, মন্তব্য করলে জেমস ব্রাক।

নিশ্চয়ই তাই, মিস্টার স্মিথ সব দেখেশুনে সায় দিলেন, আমার মনে হয় আমরা বরং আমাদের জন্যে তৈরি-করা এই পথটা দিয়ে এগুলেই ভালো করবো।– এই পাহাড়চেরা গহ্বরের পাশটাকেই হ্যারি হর্ন পাহাড়ে চড়ার জন্যে বেছে নিয়েছে। রাক্ষুসে পাথরটা গড়িয়ে পড়বার সময় দেয়ালের যে-অংশটা ভেঙে না-পড়ে ঠেকিয়েছিলো, সেখানকার শক্ত জমির ওপরই আমাদের পা নির্ভর করতে পারলে। আমাদের পথচলা তাই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠলো এখানে, এখন আমরা প্রায় একটা সরল রেখার মতোই সোজা ওপরে উঠছি, আর তার ফলেই সাড়ে-এগারোটা নাগাদ আমরা ঐ সরসরি-র ওপরকার সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছুলুম।

আমাদের সামনে, একশো ফিটও দূরে হবে কি না সন্দেহ, কিন্তু মিনারের মতো সোজা খাড়া হয়ে ওপরে, শূন্যে উঠে গেছে একশো ফিট, দাঁড়িয়ে আছে সেই শিলাময় দেয়াল, যেটা এর আসল শিখর, গ্রেট আইরির শেষ প্রতিরোধব্যবস্থা।

এদিক থেকে চূড়ার দেয়ালকে দেখাচ্ছিলো উদ্ভট-খামখয়ালিতে-ভরা বন্ধুর পাথরের মতো, কখনও উগ্র রুক্ষ গম্বুজের মতো উঠেছে ওপরে, কখনও-বা উবড়োখেবড়ো দেখালো ঠিক যেন এক অতিকায় ঈগল আকাশের পটে ছায়ার মতো আঁকা, উড়াল দেবার জন্যে দু-দিক ছড়ানো তার দুই ডানা । এদিক থেকে, অন্তত, সেই চূড়ায় ওঠা অসম্ভব।

এক মিনিট সবুর করুন, বললেন, মিস্টার স্মিথ, আমাদের এবার খতিয়ে দেখতে হবে এই পাথরটার বুনিয়াদটার পাশ দিয়ে ওদিকে গিয়ে ওঠা যায় কি না।

এটা মনে হয়, হ্যারি হর্ন জানালে, ঐ মস্ত ধসটা নিশ্চয়ই চূড়ার এদিকটা থেকেই গড়িয়ে নেমে এসেছিলো–অথচ ভেতরে ঢোকবার মতো কোনো রাস্তা সে রেখে যায়নি।

তাঁদের দুজনের পর্যবেক্ষণই নির্ভুল। অন্য-কোথাও গিয়ে আমাদের ওঠবার পথ খুঁজে বার করে নিতে হবে। দশ মিনিট জিরিয়ে নেবার পর, আমরা কোনোরকমে পায়ে পায়ে দেয়ালটার ঠিক পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ালুম, তারপর তাকে ঘিরে চক্কর দেবার মতো ঘুরতে লাগলুম-যদি কোনো পথ পাওয়া যায়।

বলতে-কি, গ্রেট আইরি ততক্ষণে আমার চোখে রীতিমতো আশ্চর্য বলে ঠেকছে–আশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য। তার শিখরে যেন আছে যত ড্রাগন, রাক্ষুসে জীব, অতিকায় দানব। যেন কোনো অনল-ওগরানো দানব, পুরাণ থেকে উঠে এসেছে, মাথাটা সিংহের, ল্যাজটা মহানাগের, আর শরীরটা ছাগলের; যেন কোনো গ্রিফিন, যার মাথাটা ঈগলের, পাখাগুলো ঈগলের, কিন্তু শরীরটা সিংহের; পুরাণের যত অলৌকিক জীব এসে যদি তাকে পাহারা দিতো, তাহলেও হয়তো আমি অবাক হতুম না।

অত্যন্ত সাবধানে, বিপদ মাথায় করে, আমরা পাথরটার বেড় ঘিরে ঘুরতে লাগলুম। মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন মানুষেরই মতো মিস্ত্রির কাজ করে গেছে এখানে, যেন খুব সচেতন সুঠাম নীলনকশামাফিক কাজ করেছে প্রকৃতি। এই দুর্গের দেয়ালের মতো পাথরে কোথাও একটা খাঁজ নেই; পাথরের আস্তরে একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি, যেখানে পা

রেখে কেউ বেয়ে উঠতে পারে ওপরে। সবখানেই শুধু এই পাথুরে দেয়াল, এই ঢাল, সবখানেই সে একশো ফিট উঁচু!

দেড়ঘণ্টা-জোড়া এই কঠিন পরিশ্রম ও চংক্রমণের পর, আমরা আবার ফিরে এলুম সেখানেই, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলুম। আমি আর আমার হতাশা চেপে রাখতে পারিনি, আর মিস্টার স্মিথও আমার চেয়ে কম বিচলিত হয়ে পড়েননি।

হাজার শয়তানের বাসা! খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার স্মিথ, এই হতচ্ছাড়া গ্রেট আইরিটার ভেতরে যে কী আছে, তাই আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না–যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। এটা কোনো আগ্নেগিরির জ্বালামুখ কি না, তা শুঙ্কু জানি না।

আগুনের পাহাড় হোক বা না-হোক, আমি বললুম, এখন কিন্তু কোনো সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে না; ধোঁয়া কিংবা শিখাও নেই চূড়ার ওপর; এমনকিছু চোখে পড়েনি যা দেখে মনে হয় অগ্নদগারের কোনো সম্ভাবনা আছে।

মিথ্যে বলিনি কথাটা । গভীর-এক স্তব্ধতা বিরাজ করছে আমাদের ঘিরে; মাথার ওপর ঝলসাচ্ছে নিখুঁত-স্বচ্ছ নীল আকাশ। সমুদ্রতল থেকে অনেক উপরে উঠে এলে যে গভীর-গম্ভীর প্রশান্তি অনুভব করা যায়, আমরা এখন তাকেই চাখছিলম।

এখানে বলে রাখা ভালো ঐ বিশাল পাথরটার বেড় ছিলো বারোশো থেকে পনেরোশো ফিট। ভেতরে যে-জায়গাটা সে সুরক্ষিত রেখেছে, সে-যে কী হতে পারে, দেয়ালের প্রস্থ না-জেনে, দেয়ালটা কতটা পুরু না-জেনে, সে-সম্বন্ধে কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছিলো না।

পুরো জায়গাটাই যেন ফাঁকা, পরিত্যক্ত, প্রাণহীন।হয়তো কোনোদিনই কোনো জ্যান্তপ্রাণী এত উঁচুতে ওঠেনি-বড়ো-বড়ো শিকারি পাখিরা চূড়ার ওপরেই আকাশে উড়াল দিয়েছে যেন চিরকাল।

আমাদের ঘড়িতে তখন ঘণ্টার কাটা তিনটের ঘরে। মিস্টার স্মিথ প্রায় বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন, সারাদিন ধরে এখানে বসে থেকে আর কী লাভ? আর কিছুই আমরা এখানে বসে থেকে জানতে পারবো না। যদি আজ রাত্তিরেই প্লেজেন্ট গার্ডেনে ফিরে যেতে হয়, মিস্টার স্ট্রক, আমাদের তবে এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়তে হবে।

আমি এ-কথার কোনো উত্তর দিইনি। যেখানে বসে ছিলুম, সেখান থেকেও নড়িনি। কাজেই মিস্টার স্মিথ ফের একটু অধীরভাবেই বললেন, আরে, আসুন, মিস্টার স্ট্রক, কিছু-একটা তো বলবেন!

সত্যি-বলতে, বিফল হয়ে, মাঝপথেই অভিযানটায় ইস্তফা দিতে আমার নিদারুণ গাজ্বালা করছিলো : আরদ্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই আবার ঐ হতচ্ছাড়া পথ ধরে নিচে নেমে যাবো! ভেতরে-ভেতরে নাছোড় একটা তাগিদ অনুভব করছিলুম-কিছুতেই হঠবো না, লেগেই থাকবো; আমার কৌতূহল এখন দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কীই বা এখন আর করতে পারি? এই নিঃসাড় নির্বোধ দেয়ালটাকে দু-হাত দিয়ে টেনে ফেড়ে দেবো? লাফিয়ে উঠবো অতিকায় শিখরটায়? গ্রেট আইরির দিকে শেষবারের মতো রুষ্টভাবে তাকিয়ে আমি আমার সাথীদের অনুসরণ করলাম।

ফেরার পথে কিন্তু বিশেষ-কোনো বেগ পেতে হয়নি। এবার শুধু সরসর করে নেমে আসা, আগে যেখানে এত কষ্ট করে বেয়ে-বেয়ে উঠেছিলুম। পাঁচটার আগেই আমরা পাহাড়ের শেষ ঢাল বেয়ে নেমে আসতে পেরেছি। আর উইলডন খামারের গোমস্তা আমাদের অভ্যর্থনা করেছে সাগ্রহ ভূরিভোজে ।

জিগেস করেছে : তাহলে আপনারা ভেতরে যাননি?

না, উত্তরে জানিয়েছেন মিস্টার স্মিথ, তবে আমার মনে হয় ঐ ভেতরটা আছে। কেবল এখানকার গাঁয়ের লোকের কুসংস্কারেভরা কল্পনায়।

সাড়ে-আটটার সময় আমাদের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি এসে থেমেছে প্রেজেন্ট গার্ডেনের মেয়রের বাড়ির সামনে-সেখানেই আমরা রাতটা কাটিয়েছি তারপর। ঘুমিয়ে পড়বার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে আমি বারেবারে নিজেকে জিগেস করেছি আমার পক্ষে কী করা উচিত হবে–থেকে যাবো এই গ্রামে, আবার নতুন দলবল নিয়ে পাহাড়ে ওঠবার আরেকটা চেষ্টা করে দেখবো? কিন্তু প্রথম বারের বদলে এই দ্বিতীয় চেষ্টাটাই যে সফল হবে, তার কি কোনো পার্থিব কারণ আছে? নিশ্চয়ই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সরাসরি ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে মিস্টার ওয়ার্ডের মুখোমুখি বসে পুরো ব্যাপারটাকে কাটা-চেরা করে বিশ্লেষণ করে দেখা।

কাজেই, পরদিন, আমাদের গাইড দুজনকে বখশিশ দিয়ে, আমি মরগ্যানটনের মিস্টার স্মিথের কাছে থেকে বিদায় নিয়েছি, আর সেইদিনই সন্ধেবেলার ট্রেনে করে রওনা হয়ে পড়েছি ওয়াশিংটনের উদ্দেশে।

.

৪. স্বতশ্চল সংঘের অধিবেশন

তবে কি গ্রেট আইরির এই রহস্যের সমাধান হবে একদিন, দৈবাৎ, এমনই আচমকা যে আমরা যা কল্পনাও করতে পারছি না? কিন্তু তা তো ভবিষ্যৎই জানে। তবে এটাও জরুরি প্রশ্ন : সমাধানটা কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? তাতে অবশ্যি কোনো সন্দেহ নেই, যেহেতু তার সঙ্গে এত লোকের জীবনমরণের প্রশ্ন জড়ানো আছে-পশ্চিম ক্যারোলাইনার মানুষজনের নিরাপত্তার প্রশ্নটা তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

অথচ তবু ওয়াশিংটনে ফিরে-আসবার পনেরোদিন পরেই লোকের কৌতূহল এই সমস্যাটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখে অন্য-একটা, একেবারেই অন্যরকম একটা, সমস্যায় চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়ে গেলো–আর এই নতুন রহস্যটাও কম চমকপ্রদ নয়।

মে মাসের মাঝামাঝি পেনসিলভ্যানিয়ার খবরকাগজগুলো জানালে যে পেনসিল ভ্যানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নাকি এমন-সব ঘটনা ঘটে চলেছে, বুদ্ধিতে যার কোনো ব্যাখ্যা চলে না। রাজধানী ফিলাডেলফিয়া থেকে যে-সব রাস্তা অন্যান্য অঞ্চলের দিকে গেছে, সে-সব রাস্তায় না কি আশ্চর্য একটা শকট দেখা যাচ্ছে, কেউই স্পষ্ট করে যার চেহারাটার বর্ণনা দিতে পারছে না–তার আকৃতি, প্রকৃতি, এমনকী শকটের মাপটা পর্যন্ত কারু জানা নেই, এতই দ্রুতবেগে সেটা পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো চলে যায়। এটা যে একটা স্বতশ্চল শকট, অটোমোবাইল,-এ-বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু সে-যে কোন মোটর তাকে চালিয়ে

নিয়ে যায়, তা কেবল কল্পনাই জানে; আর যখন জনতার কল্পনা তেতে ওঠে, উসকে ওঠে, তখন জল্পনার কি আর-কোনো সীমা থাকে?

সবচেয়ে উন্নত স্বতশ্চল শকটগুলোও তখন–যাতেই তারা চলুক না কেন, বাষ্পে, গ্যাসোলিনে, বিদ্যুতে–ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশি বেগে যেতে পারতো না–এই গতিও ইওরোপ-আমেরিকার সেরা-সব রেলপথে, সবচেয়ে দ্রুতগামী এক্সপ্রেসও, তখনও অব্দি পেরিয়ে যেতে পারেনি। এখন, এই অভিনব স্বতশ্চল শকট কি না এর প্রায় দ্বিগুণ বেগে ছুটে চলে যায়–তাজ্জব করে যায় সবাইকে, এমনকী কল্পনাকেও যেন ভির্মি খাইয়ে দেয়।

এটা নিশ্চয়ই বলতে হবে না যে এমন দুর্বার গতি রাজপথগুলোও প্রচণ্ড দুর্বিপাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে–অন্য গাড়িগুলোর বিপদ যতটা, পথচারীদের বিপদও ততটাই, কিংবা তারও বেশি। এই দ্রুত-ধাবমান বস্তুটি–বজ্রের মতো এগিয়ে আসে সে–আসবার আগে শোনা যায় দুর্ধর্ষ এক গুমগুম গর্জন, চারপাশে সৃষ্টি করে দেয় ঘূর্ণিবায়ু, তা এমনকী আশপাশের গাছপালা থেকেও ডালপালা ছিঁড়ে-ছিড়ে ফ্যালে, আশপাশের মাঠে যে-সব গোরুভেড়া চরে বেড়ায় আঁৎকে দেয় তাদের, পাখিরা যারা ভয় পেয়ে উড়ে যায় তারা তো উদ্ধার পেলো কিন্তু অন্যরা মারা পড়ে তার তলায়, তার চলার পথে যে তীব্র শোষক হাওয়া ছড়ায় কিছুতেই তার টান এড়াতে পারে না, দুমদাম করে এসে আছড়ে পড়ে তার গায়ে, প্রচণ্ড গতিতে।

আর একটা কিম্ভুত অনুপুঙ্খ, খবরকাগজগুলো যার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো তা এই : এই স্বতশ্চল শকটের চাকা নাকি আদৌ ছোঁয় না রাস্তাকে, পথের ওপর তার চাকার নাকি কোনো আঁচড়ই পড়ে না, ভারি-ভারি সব গাড়ি পেছনে যে সব

আবর্জনা ফেলে যায় তাও নাকি সে পেছনে ফেলে রেখে যায় না। খুব-বেশি হলে হালকা একটু পরশ, শুধু ধুলোর ওপর যেন বুলিয়ে যায় বুরুশ। তার এই প্রচণ্ড দুর্বার গতিই তার চলার পথে পেছনে ফেলে রেখে যায় ধূলির অমন ঘূর্ণিহাওয়া।

সম্ভব যে, নিউইয়র্ক হেরাল্ড মন্তব্য করেছিলো, এই দুর্বার গতিই তার ভারকে উধাও করে দেয়।

স্বভাবতই চারপাশ থেকে তুলকালাম প্রতিবাদ উঠেছিলো। এ-রকম উম্মাদ গতিকে এতটা বেপরোয়াভাবে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেয়া যায় না : পথের পাশে যা-ই পড়বে, জিনিশপত্র, গোরুভেড়া, মানুষজন–তাকেই সে-যে ধ্বংস করে যাবে, এ কেমন কথা? কিন্তু একে ঠেকানোই বা যায় কীভাবে? এই দুর্দান্ত শকটটার মালিক কে, কারুরই তা জানা নেই; এও জানা নেই সে কোত্থেকে আচমকা এসে উদয় হয়, আর কোথায়ই বা মিলিয়ে যায়। এটা ঠিক যে এক চর্মচক্ষে দেখা গেছে, কিন্তু ঝলকের জন্যে, যেন কোনো বন্দুকের গুলি দুম করে ছুটে গিয়েছে পলকপাতের আগেই। কার সাধ্য হওয়ার মধ্যে গিয়ে লোফে কামানের গোলা, যখন সে তুলকালাম বেরিয়ে আসে আগুনওগরানো। নল থেকে?

আবারও জানিয়ে রাখি : এই দুর্বারগতি শকটের আকৃতিপ্রকৃতি যে কী, সে-সম্বন্ধে কারু কাছেই কোনো তথ্য নেই। পেছনে সে ফেলে রেখে যায় না ধোঁয়ার কুণ্ডলি, বাষ্পের শাদা ভাপ, পেট্রলের কোনো পোড়া গন্ধ-কিংবা অন্য-কোনো তেলেরও গন্ধ পাওয়া যায় না সে চলে যাবার পর। তাতে মনে হয় এই স্বতশ্চল শকট সম্ভবত বিদ্যুতের শক্তিতে চলে না।

তার শক্তির উৎস যে-সব কোষে জমানো থাকে, তা নিশ্চয়ই অজ্ঞাত কোনো কোষভাণ্ডার, সম্ভবত ব্যবহার করে কোনো অজ্ঞাত তরল পদার্থ।

লোকের কল্পনা, উত্তেজিত, প্রায় হুলুস্থুল বাধিয়ে বসেছে : এই রহস্যময় স্বতশ্চল শকট সম্বন্ধে যে-কোনো গুজবই লোকে চোষক কাগজে কালির মতো শুষে নিচ্ছে। কেউ বলে, এ হলো ভুতুড়ে গাড়ি, অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক । তাকে নাকি চালিয়ে নিয়ে যায় কোনো প্রেত, নরকের কোনো-এক শোফেয়ার-গাড়িচালক, অন্য পৃথিবীর কোনো নষ্ট জীব–কোনো অপদেবতা, পুরাণের কোনো পশুশালা থেকেই হয়তো বেরিয়ে এসেছে কোনো দানব, হয়তো-বা স্বয়ং শয়তানই, পিছে 666 খোদাই-করা, যে সমস্ত মানুষী বাধাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে, যেহেতু তার দখলে আছে অদৃশ্য ও সীমাহীন শয়তানি ক্ষমতা।

কিন্তু বিশেষ কোনো পারমিট, কোনো অনুমতিপত্র ছাড়া, স্বয়ং শয়তানেরও কোনো হক নেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে-ঘাটে এমন দুর্বার গতিতে তার গাড়ি চালায়। তার গাড়ির কোনো লাইসেন্স প্লেট নেই, কোনো নম্বর নেই, এমনকী কোথাও এই গাড়িটার কথা নথিভুক্ত করা নেই। আর এও ঠিক যে কোনো পুরসভাই তাকে ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগে হুলুস্থুল কাণ্ড করে চলবার কোনো অনুমতি দেয়নি। জননিরাপত্তার স্বার্থেই এক্ষুনি এমন-কোনো উপায় বার করা চাই, যার সাহায্যে এই ভয়াল শোফেয়ারের সব গুপ্তরহস্য এক্ষুনি প্রকাশ করা যায় ।

তাছাড়া, এই অদ্ভুত দুর্বার গতিনাট্যের নাট্যমঞ্চ তো শুধু পেনসিলভ্যানিয়াই নয় আর। পুলিশ জানালে যে অন্যান্য রাজ্যেও তাকে তুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে দেখা গেছে–তাকে দেখা গেছে, বিদ্যুৎঝলকের মতে, কেনটাকি রাজ্যে, ফ্রাংকফোর্টের কাছে; তাকে দেখা

গেছে ওহায়োতে, কলম্বাসের রাস্তায়; তাকে দেখা গেছে টেনোসিতে, ন্যাশভিলে; মিসুরিতে, জেফারসনে; আর সবশেষে দেখা গেছে ইলিনয় রাজ্যে, শিকাগোের আশপাশে।

বিপদসংকেত বেজে উঠলো ঢং ঢং ঢং। কর্তৃপক্ষের এখন প্রথম ও প্রধান কাজ এই বিপজ্জনক শকটের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া। এহেন দুর্বার গতিতে যে ছায়াশকট (না কি মায়াশকট?) ছুটে বেড়ায়, তাকে থামিয়ে, চালকটিকে গ্রেফতার করার কোনো কথাই ওঠে না। সবচেয়ে ভালো হয় বড়ো-বড়ো রাস্তার মাঝখানে, যদি বিশাল সব গেটওয়ে তৈরি করা যায়, যা বন্ধ থাকবে, সবসময়, আর কখনও-না-কখনও সেই দুর্বার গতি শকট এসে তার গায়ে আছড়ে পড়ে হাজার টুকরো হয়ে চারপাশে ভেঙে পড়ে। থাকবে।

যত আজগুবি। ঘোষণা করলে, যারা অবিশ্বাসী। এই উম্মাদ নিশ্চয়ই ঠিক জেনে ফেলবে কী করে এইসব বাধা এড়িয়ে যেতে হয়–হয়তো ঘুরপথেই যাবে!

আর যদি দরকার হয়, জুড়ে দিলে অন্যরা, ঐ ভুতুড়ে গাড়ি নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠে ও-সব বাধা টপকে চলে যাবে?

আর সে যদি সত্যি খোদ শয়তানই হয়, তবে, প্রাক্তন দেবদূত হিশেবে, সে নিশ্চয়ই তার পাখাজোড়ার দেখভাল করে–দরকার হলে সে উড়াল দিয়েই চলে যাবে।

তবে এই শেষ মন্তব্যটা এসেছিলো বোকাহাবা বুড়োহাবড়াদের কাছে, যারা সব একেকজন কুসংস্কারের একেকটা ডিপো, তারা এ-ব্যাপার নিয়ে আদপেই কখনও মাথা

ঘামায়নি। কারণ হেডেসের রাজার যদি সত্যি-সত্যি একজোড়া পাখা থেকেই থাকে, সে কেন তবে খামকা ও-রকম একগুয়ের মতো পৃথিবীর পথে-ঘাটে তার আদরের প্রজাদের পিষে মেরে দুর্বার গতিতে ছুটে যাবে, যখন সে অনায়াসেই মহাশূন্য থেকে উড়াল দিয়েই যেতে পারতো তার কাজে-অকাজে, মেটাতে পারতো তার যত কিম্ভুত খামখেয়াল। স্বাধীন-কোনো অতিকায় পাখির মতো। তার কি তবে ডানাজোড়া কাটা গেছে?

এই ছিলো যখন হালচাল, তখন মে মাসের শেষ হপ্তায়, এমন-একটা নতুন ঘটনা ঘটলো, যা থেকে বোঝা গেলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন অসহায়ভাবে কোনো অজানা দানবের হাতে খাবি খাচ্ছে। আর নতুন জগতের সমূহ বারোটা বাজিয়ে দিয়ে, সে কি তারপর পুরোনো জগতের দিকে তার নজর দেবে না? এই স্বতশ্চল শকটের বেপরোয়া উন্মাদ কি তারপর ইওরোপকে ছেড়ে কথা কইবে?

নিম্নোক্ত ঘটনাটির কথা মার্কিন দেশের সবগুলো কাগজেই একযোগে বেরুলো, আর তার সঙ্গে কী-যে তুলকালাম মন্তব্য আর হুলুস্থুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেলো, তা আর বিশদ করে খুঁটিয়ে বলবার দরকার পড়ে না।

উইসকনসিনের স্বতশ্চল সংঘ একটা মোটররেসের আয়োজন করেছিলো–এমন সব রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটবে যা একসময়ে এসে পৌঁছুবে ঐ রাজ্যের রাজধানী ম্যাডিসন এ। যে-রুটটা ঠিক করা হয়েছিলো মোটররেসের পক্ষে তা ছিলো চমৎকার রাস্তা–দুশো মাইল মতো লম্বা, পশ্চিম সীমান্তের প্রেয়ারি দু শিয়েন-এ তার শুরু, ম্যাডিসনের পাশ কাটিয়ে, যা এসে শেষ হবে মিশিগান হ্রদের কাছে মিলাউঁকির একটু ওপরে। শুধু যে অংশটা জাপানি রাস্তা, নিক্কো থেকে নামোদে অব্দি, যে-রাস্তার দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

অতিকায় সব সাইপ্রেস, সেই অংশটা বাদ দিলে উইসকনসিনের এই রেসকোর্সের মতো চমৎকার রেসকোর্স পৃথিবীতে আর নেই। সোজা নাক-বরাবর গেছে রাস্তা, তীরের গতিপথের মতো সমান, কোথাও-কোথাও একটানা পঞ্চাশ মাইল অব্দি। এই প্রতিযোগিতার জন্যে বিস্তর শকট নাম লিখিয়েছিলো–তাদের মধ্যে কত-যে বিখ্যাত যন্ত্র। ছিলো তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সব ধরনের মোটর গাড়িকেই রেসে নাম লেখাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, এমনকী মোটর সাইকেলদেরও, অটোমোবাইলগুলো তো আছেই। নানা দেশে তৈরি সে-সব যন্ত্র, নানান তাদের গড়ন। বিভিন্ন পুরস্কারের অঙ্ক যোগ করলে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার ডলার, নেহাৎ ফ্যালনা টাকা নয়, তাই প্রতিযোগিতা খুবই জমে যাবে, কেননা সবাই তাতে মরীয়ার মতো যুঝে যাবে। নতুন-সব রেকর্ড যে তৈরি হবে, তাতে কারুরই কোনো সন্দেহ ছিলো না।

এ-পর্যন্ত বিভিন্ন রেসে সবচেয়ে বেশি গতি যা উঠেছিলো, সম্ভবত ঘণ্টায় আশি মাইল, সেটা মাথায় রেখে এটা আন্দাজ করা হয়েছিলো এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অন্তত তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। আর, সমস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে, উইসকনসিনের কর্তৃপক্ষ প্রেয়ারি দু শিয়েন থেকে মিলাউঁকি তিরিশের মে-র সকালবেলায় সেদিন তিনঘণ্টার জন্যে সমস্ত যানবাহনের চলা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এর পরেও যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তারাই চোটজখম পাবে যারা নিজেরাই সাধ করে এই প্রতিযোগিতায় এসে নাম লিখিয়েছে, আর কারু ঘাড়েই তারা কোনো দোষ চাপাতে পারবে না।

জমায়েৎ হয়েছিলো কাতারে-কাতারে লোক, বিশাল ভিড়। শুধু-যে আস্ত উইসকনসিন ঝেটিয়েই লোক এসেছে তা নয়, লোক এসেছে আশপাশের রাজ্য থেকেও–এসেছে

ইলিনয়, মিশিগান, আইওয়া, এমনকী নিউইয়র্ক থেকেও। যে-সব চালাক নাম লিখিয়েছিলো, তাদের মধ্যে ছিলো বিস্তর বিদেশী-ইংরেজ, ফরাশি, আলেমান, অস্ট্রিয়ান–প্রত্যেক দেশের লোকই যে-যার দেশের শোফেয়ারদের সমর্থন করছে। তার ওপর, এটা যেহেতু খোদ মার্কিন মুলুক, পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত (মতান্তরে কুখ্যাত) জুয়াড়িদের দেশ, কত ধরনের যে বাজি ধরা হলো তার ঠিক নেই-টাকার অঙ্কও কখনও কখনও এমন যে শুনেই চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

রেসের সূচনা হবে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আটটায়, সকালবেলায়; আর ভিড়ভাট্টা ও দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে ঠিক হয়েছিলো এককেটা গাড়ি বোঁ করে বেরুবে ঠিক দু মিনিট অন্তর-রাস্তার দুপাশে থাকবে কাতারে-কাতারে দর্শক।

প্রথম তিনজন প্রতিযোগী, লটারি করে এককেজনকে এককেটা নম্বর দেয়া হয়েছিলো, বেরিয়ে পড়লো আটটা থেকে আটটা বিশ মিনিটের ভেতর। রাস্তায় যদি কোনো গাড়ি ডিগবাজি না-খায়, অথবা একটা আরেকটাকে ধাক্কা না-মারে, তবে এগারোটার মধ্যে এদের কোনো-কোনো গাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। অন্যরা এই একই শৃঙ্খলা ও সূচি ধরে রচনা হবে।

দেড় ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। প্রেয়ারি দু শিয়েনের রাস্তায় তখন একজন প্রতিযোগীই ঝড়ের বেগে ছুটেছে, টেলিফোন মারফৎ প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর সর্বত্র খবর পৌঁছে যাচ্ছে কোন গাড়ি আগে, কোন গাড়িগুলো তার পেছনে, পর-পর। ম্যাডিসন আর মিলাউঁকির মাঝখানে সকলের আগে-আগে রয়েছে রেনোভাইদের চার সিলিণ্ডারের কুড়ি

অশ্বশক্তির গাড়িটা, টায়ারগুলো মিশেলিনের। তার গায়ে প্রায় নাকটা ঠেকিয়ে আসছে। হার্ভার্ড ওয়াটসন গাড়ি, আর দিওন-বুতো। এরই মধ্যে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, অন্য গাড়িগুলো হু-ই কোথায় পেছনে পড়ে আছে। জনা-বারো প্রতিযোগীই শেষ পর্যন্ত প্রথম স্থানের জন্যে লড়ে যাবে। কয়েকজন চালক এর মধ্যেই জখম হয়েছে, তবে কারু চোট-আঘাতই তেমন সাংঘাতিক নয়। তাদের কেউ-কেউ যদি দুর্ঘটনায় মরেও যেতো, মানুষের মৃত্যু তখন হতো কতগুলো অনুপুঙ্খ মাত্র, পরিসংখ্যানের হিমশীতল অঙ্ক : তাজ্জব মুলুক আমেরিকায় মানুষের মৃত্যুকে কেউই খুব-একটা গুরুত্ব দেয় না।

স্বভাবতই উত্তেজনা আর হৈ-হৈ একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছে, যেখানটায় মিলাউঁকির কাছে এই দৌড়বাজির শেষ। সেখানে এসে জড়ো হয়েছে সবচেয়ে যারা কৌতূহলী আর সবচেয়ে যারা আগ্রহী, সেখানে মুহূর্তের রাগ-অনুরাগ দপদপ করে জ্বলছে-কে কাকে শান্ত করবে। দশটা নাগাদ এটা বোঝা গিয়েছে যে প্রথম পুরস্কার, কুড়ি হাজার ডলার, সাকুল্যে পাঁচটা গাড়ির আয়ত্তের মধ্যে–এ ওর মধ্যে ব্যবধান এই কমছে, এই বাড়ছে, আর এই পাঁচজনের মধ্যে আছে দুজন মার্কিন, দুজন ফরাশি আর একজন ইংরেজ। কাজেই কল্পনা করে নেয়া যায় জাতীয় গৌরবের অছিলায় কেমন খ্যাপার মতো একেকজনে বাজি ধরছে। বুকিরা, যাদের মারফৎ বাজি ধরা হয়, তারা আর এই উত্তেজনার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না–এত লোকে এসে বাজি ধরতে চাচ্ছে। মুখ থেকে মুখেই ছড়িয়ে পড়ছে টাকার অঙ্ক, যেন জ্বরের ঘোরে সবাই হন্যে হয়ে গিয়েছে। হার্ভার্ড-ওয়াটসনের ওপর দর এখন একে-তিন! দিওন-বুতোর ওপর দর একে-দুই।রেনোর ওপর সমান-সমান। টেলিফোনে একবার করে খবর আসে, আর দর্শকদের কাছে ঢেউয়ের মতো এই নতুন দর ছড়িয়ে যায়।

হঠাৎ, প্রেয়ারি দু শিয়েন-এর পুরসভার ঘড়িতে যখন সাড়ে-নটা বেজেছে, শহর থেকে দু-মাইল দূরে শোনা গেলো প্রচণ্ড এক দ্রুতধাবমান আওয়াজ আর কোনো কিছুর গড়িয়ে-আসার শব্দ-যে-আওয়াজ বেরিয়ে আসছিলো ধুলোয়-ধুলোয় ধুল পরিমাণ মেঘের মধ্য থেকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেলো তীক্ষ্ণ সিটির শব্দ, যেমন ভোঁ শোনা যায় ধাবমান জাহাজ থেকে, কুয়াশার মধ্যে।

আঁৎকে উঠে, ভিড় একদিকে সরে যাবার আগেই, মেঘ প্রায় হারিকেন তুফানের মতো সে-জায়গাটা ঝেটিয়ে গেলো : আতঙ্কিত হয়ে হঠে না-গেলে তখন যে তাণ্ডব হতো তার বলি হতো অন্তত কয়েকশো দর্শক। এমন জোরে চোখের সামনে দিয়ে কী-যে ছুটে গিয়েছে, লোকে তা চোখেই দেখতে পারেনি, কিছু বুঝবে যে, সে-তো দূরের কথা। কিছু-একটা যে এখান দিয়ে গেছে, এইমাত্র, বলতে-না-বলতে, শুধু সেটাই সবাই টের পেয়েছে। কোনো অত্যুক্তিই হতো না যদি কেউ তখন ঠাণ্ডা মাথায় হিশেব কযে বলতো যে তার গতি ছিলো ঘণ্টায় দেড়শো মাইল।

ছায়াশকট এসেছে, আর গেছে, দূরে মিলিয়ে গেছে পলকের মধ্যে, পেছনে ফেলে রেখে গেছে শাদা ধুলোর দীর্ঘ রেশ, যেমন কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন পেছনে ফেলে রেখে যায় অপস্রিয়মাণ ধোঁয়ার পুচ্ছ। এটা যে কোনো স্বতশ্চল শকট তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর তার মোটরটাও দুর্দান্ত, অসাধারণ, বাড়িতে লিখে জানাবার মতো। এটা যদি তার এই তীরের বেগে ধাওয়া বজায় রাখে, এ তবে প্রতিযোগীদের একেবারে সামনে গিয়ে পৌঁছুবে–শুধু-যে পৌঁছুবে তা-ই নয়, তাদের পেরিয়েও যাবে–তাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গাড়ির যা বেগ, এর গতি তার দুননা তো বটেই–অর্থাৎ এই ছায়াশকট সবার আগে গিয়ে পৌঁছুবে লক্ষ্যে, রেসের শেষ সীমায়।

আর তারপর, হকচকিয়ে-যাওয়া ভাবটা কেটে যেতেই, সবখান থেকে উঠলো প্রচণ্ড হট্টগোল–বিশেষ করে দর্শকরা যখন টের পেলে যে বিপদটা আপাতত কেটে গিয়েছে।

এ সেই জাহান্নামের গাড়িটা!

হ্যাঁ, এ সেই গাড়ি পুলিশ যার ল্যাজের ডগাটাও ছুঁতে পারে না!

কিন্তু গত পনেরো দিনে এর কথা কোখাও শোনা যায়নি।

কে-যে বলেছিলো এটা নাকি উলটে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছে–চিরকালের মতো খতম!

এ হলো গিয়ে খোদ শয়তানের গাড়ি, নরকের আগুনে চলে, আর শয়তান স্বয়ং এটাকে চালায়।

সত্যি-বলতে, এর শোফেয়ার যদি খোদ শয়তান না-হয়, তাহলে কোন মহাজন? এই অবিশ্বাস্য গতিতে ধেয়ে এলো, তার এই রহস্যময় গাড়িতে–এই মাস্তানটি তবে কে-হে? অন্তত এটায় কোনোই সন্দেহ নেই যে এই গাড়িটা সেই রহস্যময় গাড়িই যাকে ঘিরে এই ক-দিন ধরে এত চেল্লাচিল্লি হয়েছে-মুখে, ও লেখায়; পুলিশ যদি ভেবে থাকে

যে তারা তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, চিরকালের মতো একে মুলুক ছাড়া করে। দিয়েছে, পগাড় পার, তবে পুলিশ বিষম ভুল করেছে–আর অন্যদেশেও যেমন, মার্কিন মুলুকেও তেমনি, পুলিশ আখছার ভুলের পর ভুল করেই চলেছে।

বিস্ময়ের প্রথম স্তম্ভিত দশাটা কেটে যেতেই অনেকেই ছুটে গেলো টেলিফোনের কিওস্কগুলোয়-পরে যারা আছে আগে থেকেই তাদের সাবধান করে দেবে বলে। এই উন্মাদ শকট শুধু পথের পাশের দর্শকদেরই মারাত্মক বিপদ নয়, পথের ওপর কত যে গাড়ি যে উলটে দেবে, চুরমার করে দেবে, তার ঠিক কী। এই ভয়াল উন্মাদ যখন পাহাড়ের ধস নামার মতো এসে আর্বিভূত হবে, অন্য গাড়িগুলো তো চিড়ে চ্যাপটা হয়ে যাবে, গুঁড়ো-গুড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, সর্বনাশ হয়ে যাবে তাদের!

আর অন্য গাড়ির সঙ্গে পর-পর ঠোকাঠুকি লাগলে, সংঘর্ষ হলে, এই শোফেয়ারই কি নিজে তার গাড়ি থেকে নিরাপদে বহাল তবিয়তে বেরুতে পারবে? হয়তো সে পাকা শোফেয়ার, ওস্তাদের ওস্তাদ, শোফেয়ারদের রাজা, কিন্তু তার যন্ত্রটি তাকে এমন নিখুঁতভাবে চালনা করতে হবে, হাতে-আর-চোখে এমন অটুট সম্বন্ধ থাকতে হবে তার, যে, সে হয়তো ভেবে বসে আছে, সে নিজে হ্যাঁসবরকম পরিস্থিতিতেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে। একটাই বাঁচোয়া, যে, উইসকনসিনের কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই স্থির করে নিয়েছিলেন, রাস্তায় শুধু প্রতিযোগী গাড়িগুলো ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে তাকে এমন হৈ-হৈ কাণ্ড ফেলে দেবার অনুমতি কে দিয়েছে? এখানে থাকবার কোন হক আছে তার?

আর প্রতিযোগীরাও বা নিজেরা কী বলছে, টেলিফোনে এই-যে আগেভাগে তাদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে, ওহে, সরে থাকো, গ্র্যাণ্ড প্রাইজের লোভে পিতৃদত্ত প্রাণটা খুইয়ো না, তাদেরই বা এ-বিষয়ে কী বক্তব্য? তাদের হিশেব অনুযায়ী এই আশ্চর্য শকটটা নাকি ঘণ্টায় একশো তিরিশ মাইল বেগে যাচ্ছিলো। তাদের নিজেদের গাড়িরও গতি সাধারণ গাড়ির চাইতে অনেক বেশি, তবু তাদের দিকে এই গাড়ি এমন প্রচণ্ড

গতিতে ধেয়ে এসেছিলো এবং হয়তো প্রচণ্ডতর গতিতে বন্দুকের গুলির মতো পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলো যে তারা স্পষ্ট করে শকটটাকে খেয়াল পর্যন্ত করতে পারেনি, যেন একটা টেনে-লম্বা-করা টাকু, তবু হয়তো তিরিশ ফিটের চাইতে বেশি লম্বা নয়, তার চাকাগুলো এমন বিদ্যুৎক্ষিপ্র গতিতে ঘুরছিলো যে প্রায় চোখেই পড়ছিলো না। আর যখন পাশ কাটিয়ে চলে গেলো এই তাজ্জব লম্বা গাড়ি পেছনে না-রেখে গেলো কোনো ধোঁয়া না বা কোনো গন্ধ।

আর তার চালক? সে ছিলো তার যন্ত্রের ভেতটায়, দৃষ্টির অগোচর। দেশের নানা রাস্তায় প্রথম যখন হৈ-চৈ তুলে হাজির হয়েছিলো, তখন-যেমন, এখনও-তেমনি অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে সে।

মিলাউঁকিকে তো তক্ষুনি জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই উড়ে-এসে-রেসে-নাম লেখানো অদ্ভুত প্রতিযোগীর কথা। খবরটা যে কেমন হুলুস্থুলু বাধিয়ে বসেছিলো তা নিশ্চয়ই খানিকটা আন্দাজ করা যায়। তক্ষুনি প্রস্তাব নেয়া হলো যে এই চলন্ত তুবড়িটাকে যে-করেই হোক থামাতে হবে রাস্তার মবখানে এমন-একটা বাধা তৈরি করতে হবে যার গায়ে আছাড় খেয়ে সে যাতে হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে-রকম কোনো প্রতিরোধের প্রাচীর গড়বার সময় কই? যে-কোনো মুহূর্তেই তো উল্কার বেগে সেই শকট এসে হাজির হবে! তবে প্রতিরোধ গড়বার গরজটাই বা কী? রাস্তা কি সটান, সরাসরি, লেক মিশিগানের পাড়ে এসে শেষ হয়নি?হয় গাড়িটা নিজের গরজেই সেখানে দুম করে থেমে যাবে, আর নয়তো তার অতিপ্রাকৃত চালকটি হয়তো ডাঙায় যেমন তেমনি জলেও তার যানটাকে উল্কার গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।

এখানেও, দৌড়বাজির সারা রাস্তাটা ধরে যেমন হয়েছে, যত রাজ্যের আজগুবি প্রস্তাব উঠলো। এমনকী যারা এটা মানবে না যে এই রহস্যময় চালক খোদ শয়তান যদি নাও হয় তারই কোনো-এক দোসর, তার পর্যন্ত তা-না-না-না করে বললে এ হয়তো প্রলয়কালেরই কোনো অপার্থিব জীব, সংবর্তের বর্ণনা থেকে সরাসরি উঠে এসেছে, জ্যান্ত ও কিম্ভূত। আর তার ওপর এখন আর এক মুহূর্তও সময় নেই ভেবে-ভেবে নষ্ট করার। যে-কোনো মুহূর্তেই এখন এসে উদয় হবে সেই ছায়াশকট মায়াশকট ।

তখনও এগারোটা বাজেনি, হঠাৎ রঞ্জির দূর প্রান্ত থেকে একটা গুমগুমগুম শব্দ উঠলো, আর ঘূর্ণি তুলে খ্যাপার মতো বয়ে গেলো ধুলোর ঝড়। রূঢ় কর্কশতীক্ষ শিসের শব্দ ভেসে এলো হাওয়ায়, প্রবল এক হুঁশিয়ারি, পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, রাস্তা খোলা রাখো ।

শেষ মুহূর্তেও, সমাপ্তিরেখায় এসেও, সে তার গতি শ্লথ করেনি। সমাপ্তিরেখা থেকে মিশিগান আধমাইল দূরে হবে কি না সন্দেহ। শকটটা নিশ্চয়ই মিশিগান হ্রদের জলে গিয়ে আছড়ে পড়বে। তাহলে কি যন্ত্রটা আর তার চালকের নিয়ন্ত্রণে নেই?

নেই বলেই তো মনে হয়। কক্ষচ্যুত উল্কার মতো, যানটা মিলাউঁকি দিয়ে ঝলক তুলে চলে গেলো। যখন শহরটা পেরিয়ে যাবে, তখন কি নিজের বিনাশ ডেকে আনবে, আছড়ে পড়বে লেক মিশিগানের জলে–যেটা হবে তার সলিল সমাধি?

যা হবে, সে-তো পরে হবে। কিন্তু যখন যানটা একটা মোড় ঘুরে উধাও হয়ে গেলো, এই মাটিতে-চলা-ধূমকেতুটার চলার পথে তার চলে-যাওয়ার কোনো চিহ্নই কিন্তু পড়ে রইলো না।

.

৫. নিউ–ইংল্যাণ্ডের তীর ঘেঁসে

খবরকাগজগুলোয় যখন এই অদ্ভুত রেসের খবর ছাড়া আর-কোনো খবর নেই, আমি তখন আবারও ওয়াশিংটনে এসে হাজির হয়েছি। ফিরে এসেই আমি আমার বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর দফতরে গিয়েছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি তখন। পারিবারিক ঝামেলায় হঠাৎ তাকে চলে যেতে হয়েছে ওয়াশিংটন ছেড়ে, কয়েক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকবেন। মিস্টার ওয়ার্ড অবশ্য জানেন যে আমার অভিযান বিফল হয়েছে। খবরকাগজরা, বিশেষ করে নর্থক্যারোলাইনার খবরকাগজেরা, গ্রেট আইরিতে ওঠবার চেষ্টা করে আমরা যে সফল হতে পারেনি, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছে।

স্বভাবতই, অপ্রত্যাশিত এই বাধার দরুন, আমার অস্থির কৌতূহল আরো-অস্থির হয়ে উঠেছিলো। এর পরে যে কী করবো, তার কোনো পরিকল্পনাই আমি মিস্টার ওয়ার্ডের সঙ্গে পরামর্শ না-করে করতে পারছিলুম না। তাহলে কি গ্রেট আইরির রহস্যটা ভেদ করার সমস্ত আশাতেই জলাঞ্জলি দিতে হবে? না, বারেবারে বিফল হই তাও সই, তবু আমি বারেবারে ঐ পাহাড়ে ফিরে যাবো, নতুন উদ্যমে চেষ্টা করবো পাহাড়ে চড়তে।

তবে, এটা ঠিক যে, ঐ দেয়াল বেয়ে চূড়ায় গিয়ে পৌঁছুনো মানুষের সাধ্যাতীত। পাহাড়ের চূড়া অব্দি একটা ভারা বানানো যায় যদি? কিংবা যদি তার দেয়াল ছুঁড়ে খোঁড়া যায় একটা সুড়ঙ্গ? আমাদের এনজিনিয়াররা তো প্রতিদিনই এর চেয়েও কঠিন সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফ্যালে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য খরচের কথাটাও ভেবে দেখা উচিত–গ্রেট

আইরির ভেতরে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে কোথাও কিছু নেই, সব ভো ভা, তখন এত হাজার ডলার নিছকই বাজে খরচ হবে। সুড়ঙ্গটা অনেক হাজার ডলার খরচ করে বানানো যায়–কিন্তু তাতে আমার এই বেদম কৌতূহল চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোন উপকার হবে লোকের?

আমার নিজের হাতে যা-টাকা আছে তা দিয়ে এই কাজে হাত দেয়া যায় না। সরকারি টাকার দায়িত্ব মিস্টার ওয়ার্ডের ওপর–তিনি তো আপাতত এখানে নেই। একবার ভেবেছিলুম এতসব লক্ষপতি ধনকুবেরদের কোনো-একজনকে বাজিয়ে দেখলে হয় না? হায়রে, যদি আমি তাদের কাউকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারতুম যে ঐ পাহাড়ে সোনারুপোর খনি আছে! কিন্তু এমন কথা শুনে পাগলেও হাসবে। প্রশান্ত সাগরের কূলে যে-সব পাহাড় আছে, ট্রান্সভালে বা অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে হয়তো জমি খুঁড়লে সোনা পাওয়া গেলে যেতেও পারে, কিন্তু আপালাচিয়ার শৈলশ্রেণী তত সোনার খনি পেটে পুরে রাখে না।

পনেরোই জুনের আগে মিস্টার ওয়ার্ড তার কাজে ফেরেননি। আমার ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমাকে কিন্তু তিনি বেশ সমাদরই করেছেন। এই-যে, স্ট্রক! বেচারা! হেসে আমায় স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। বেচারা স্ট্রক, যে কি না একটা তুচ্ছ পাহাড়ের কাছে হেরে এসেছে।

আপনি যদি আমায় চাঁদের পিঠে কী আছে দেখে আসতে বলতেন তাহলে যতটাই হার মেনে আসতুম, তার চাইতে বেশি হার স্বীকার করতে হয়নি কিন্তু, আমিও হেসেই উত্তর

দিয়েছি। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো নৈসর্গিক বাধা, তখন আমাদের হাতে যা-ক্ষমতা ছিলো তাতে ঐ বাধা অতিক্রম করা অসাধ্য ছিলো।

তাতে আমার সন্দেহ নেই, স্ট্রক, তাতে আমার একফোঁটাও সন্দেহ নেই। তবু, তথ্যটা কিন্তু থেকেই যায়। যে, গ্রেট আইরির ভেতরে কী তোলপাড় হচ্ছে, কী। ওলোটপালোটকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, তার কিছুই তুমি আবিষ্কার করতে পারোনি।

কিছুই পারিনি, মিস্টার ওয়ার্ড।

আগুনের কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ দ্যাখোনি?

কিছুমাত্র না।

আর সন্দেহজনক কোনো গুমগুম আওয়াজও শোনোনি?

না।

না। তাহলে এখনও আমরা ঠিকঠাক জানি না ওখানে কোনো আগ্নেয়গিরি আছে কি না?

এখনও জানি না, মিস্টার ওয়ার্ড। তবে যদি থেকে থাকে, সে-যে এখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।

তবু, মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, এটাও তো জানা নেই সে শিগগিরই কোনোদিন কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে কি না। স্ট্রক, কোনো আগ্নেয়গিরি যে ঘুমিয়ে আছে, এটা কোনো

বড়ো কথা নয়–আমাদের চেষ্টা করতে হবে তাকে সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলতে। যদি-না, অবশ্য, অত-সব গুজবের জন্ম হয়ে থাকে ক্যারোলাইনার লোকদের তেতে ওঠা কল্পনায়।

সে কিন্তু সম্ভব নয়, সার, আমি বলেছি, মরগ্যানটনের মেয়র মিস্টার স্মিথ, এবং তার বন্ধু, প্লেজেন্ট গার্ডেনের মেয়র-দুজনেই বিস্তর কাণ্ডজ্ঞান ধরেন, চোখকান খোলা রাখেন। দুজনেই তারা নির্ভরযোগ্য মানুষ। আর তারা এ-বিষয়ে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সব খুলে বলেছেন। গ্রেট আইরির ওপরে যে শিখা দেখা গিয়েছিলো, সে-তথ্য মিথ্যে নয়। অদ্ভুত সব আওয়াজও উঠেছিলো ওখানে। অন্তত এই দুই বিষয়ে সন্দেহ করবার মতো কোনো কারণ নেই।

মানলাম, ঘোষণা করেছেন মিস্টার ওয়ার্ড, মানলাম যে এই দুটি বিষয় কারু বিকৃত মস্তিষ্কের অলীক বিভ্রম নয়। তাহলে তা থেকে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায় : গ্রেট আইরি এখনও তার ভেতরকার রহস্য কিছুই ফাঁস করে দেয়নি।

আমরা যদি তা একান্তই জানতে চাই, মিস্টার ওয়ার্ড, তবে সমাধানটা আসতে পারে কেবল অকাতরে অর্থ ব্যয় করলেই। খন্তা, কোদাল আর ডায়নামাইট অনায়াসেই ঐ নিরেট দেয়ালগুলো উড়িয়ে দিতে পারবে।

তাতে কোন সন্দেহ নেই, বড়োকর্তা উত্তরে জানিয়েছেন, কিন্তু পাহাড় এখন যখন ঘুমিয়ে আছে, নিরীহ ও নিরুপদ্রব, তখন এত-বড়ো একটা কাজে হাত দেবার কোনো মানে হয় না। আমরা বরং কিছুদিন চুপচাপ বসে-বসে দেখি, যদি পাহাড় নিজেই কোনো-একদিন তার রহস্য ফাঁস করে দেয়।

মিস্টার ওয়ার্ড, বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি, তবু আপনি আমার কাঁধে যে-দায়িত্ব দিয়ছিলেন, তা পালন করতে পারিনি বলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

বাজে কথা বোলো না, স্ট্রক! মিথ্যে নিজেকে এ নিয়ে অস্থির কোরো না। তোমার এই হারটাকে তুমি বরং দার্শনিকদের ভঙ্গিতেই নাও। আমরা তো আর সবসময় কৃতকার্য হতে পারি না, পুলিশের চাকরি করলেও না। কত পাজি লোকই তো আমাদের হাত এড়িয়ে চলে যায়! সত্যি-বলতে, অপরাধীরা যদি একটু চালাক আর হুঁশিয়ার হতো, তবে হয়তো তাদের কাউকেই আমরা পাকড়াতে পারতাম না। সবসময়েই তারা নিজেরাই হাঁদার মতো এমন-কিছু করেছে যে আমরা তাদের পাকড়াতে পেরেছি। কোনো দুষ্কর্ম–চুরি বা খুন-হিশেব করে প্ল্যানমাফিক করার মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই, কেননা সে সব কাজ করা ভারি সহজ;কঠিন ও কারু সন্দেহ না-জাগিয়ে সেগুলো হাসিল করা, আরো-কঠিন পেছনে কোনো সূত্র ফেলে না-রাখা–যে-সব সূত্র ধরে যে-কেউ পুরো ব্যাপারটা ধরে ফেলতে পারে।বুঝেছে, ঈক, আমি মাস্টারি করে অপরাধীদের সবকিছু শিখিয়ে দিতে চাই না–আমি বরং চাই তার যেমন হাঁদা আছে, তেমনি আকাট বোকা থাকুক। তবু, এ-কথাও ঠিক, এমন অনেক অপরাধী আছে পুলিশ কখনও যাদের চুলের ডগাটিও ছুঁতে পারবে না-পারেনি।

এই বিষয়ে অবশ্য আমার বড়েকর্তার সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। পাজির পাঝাড়া বদমায়েশগুলোর মধ্যেই সবচেয়ে বেশিহাবা লোক দেখা যায়। শুধু এই কারণেই আমি ভারি তাজ্জব হয়ে গেছি প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ রাক্ষুসে যানটা সকলের নাকের ডগা দিয়ে চলে গেলো, অথচ কর্তৃপক্ষ এখনও তাতে কোনো আলোকসম্পাত করতে পারলো না!

এবং যখন মিস্টার ওয়ার্ড এই প্রসঙ্গটা তুলেছেন, তখন আমি কিছুতেই আমার বিস্ময় প্রকাশ না-করে পারিনি।

মিস্টার ওয়ার্ড বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন যে ঐ রাক্ষুসে যানটার পেছন নেয়া একেবারেই সম্ভব ছিলো না; আগে যতবারই সে দেখা দিয়েছে, টেলিফোনে কাউকে কোনো খবর দেবার আগেই সে উধাও হয়ে গেছে। সারা দেশে কত-যে পুলিশকে শুধু এরই ওপর নজর রাখবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই–অথচ তবু কেউ এই দুবৃত্তের মুখোমুখি পড়েনি। সে তার এই তাজ্জব-করা ক্ষিপ্র গতি সত্ত্বেও অবিশ্রাম এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় যায় না–বরং কোথাও সে এক পলকের জন্যে দেখা দেয়, তারপরেই যেন হাওয়ায় উবে যায়। সত্যি-যে, অবশেষে তাকে প্রেয়ারি দু শিয়েন থেকে মিলাউঁকি অব্দি মোটররেসের পুরো রাস্তাটাতেই দেখা গেছে, আর এতটা রাস্তা সে গেছে দেড় ঘণ্টারও কম সময়ে, আর রেসট্র্যাকটা তো কম করেও দুশো মাইল হবে।

কিন্তু তারপর থেকেই ঐ অদ্ভুত স্বতশ্চল শকটের আর-কোনো পাত্তাই নেই। সে রেসট্র্যাকের একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, নিজেরই চলার তাড়ায় তারপরও ছুটেছে, কিছুতেই থামতে পারেনি; তবে কি সত্যি সে আছড়ে পড়েছে লেক মিশিগানের জলে, আর একেবারে তলিয়ে গেছে? আমাদের কি তবে ধরে নিতে হবে যে এই যান আর তার চালক দুজনেই ধ্বংস হয়ে গেছে? তবে কি আর এদের কার কাছ থেকে আর-কোনো বিপদআপদের আশঙ্কাই নেই আমাদের? জনসাধারণের একটা বড়ো অংশই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে অস্বীকার করছে। তাদের মতে, আবারও হঠাৎ কোনোখান থেকে ঐ অলৌকিক গাড়ি এসে হুলুস্থুল বাধাবে।

মিস্টার ওয়ার্ড তো খোলাখুলি স্বীকারই করে বসলেন যে পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে অসাধারণ ও চমকপ্রদ বলে ঠেকছে; আর তার এই মতের সঙ্গে আমারও কোনো বিরোধ ছিলো না। যদি এই নারকীয় শোফেয়ার আবার এসে উদয় না-হয়, তার ছায়ামূর্তি (কেননা কেউই তাকে চোখে দ্যাখেনি একবারও) নিশ্চয়ই তবে বুদ্ধিতে-যার-ব্যাখ্যা-চলে না এমনি-কোনো অতিমানুষিক রহস্যের অংশ বলে ধরে নিতে হবে।

বড়োকর্তা আর আমি অনেকক্ষণ ধরে, সবদিক তলিয়ে দেখে, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিলুম। তারপর যখন ভাবছি আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে, তখন। হঠাৎ, মিস্টার ওয়ার্ড ঘরটার মধ্যে বার-কয়েক পায়চারি করে আচমকা বলে উঠেছেন : হা, সত্যি, মিলাউঁকিতে সেদিন যা ঘটে গেলো, তা ভারি আশ্চর্য। কিন্তু আমার হাতে আরো-একটা রহস্য আছে, আর তাকেও মোটেই কম আশ্চর্য বলা যাবে না।

এই কথা বলে আমার হাতে বস্টন-থেকে-পাওয়া একটা প্রতিবেদন তুলে দিয়েছেন– এমন-একটা বিষয় সম্বন্ধে সেই প্রতিবেদন যা নিয়ে সান্ধ্য কাগজগুলি সদ্য তাদের পাঠকদের অবহিত করতে শুরু করেছে। আমি যখন প্রতিবেদনটা পড়ছি, তখন হঠাৎ ব্যস্তসমস্তভাবে মিস্টার ওয়ার্ডকে অন্যকোথাও ডেকে নিয়ে-যাওয়া হলো। আমি জানলার পাশে জমিয়ে বসে প্রতিবেদনটায় মনোনিবেশ করলুম।

গত কিছুদিন ধরে মাইন, কানেটিকাট আর ম্যাসাচুসেটসের উপকূল ধরে সাগরজলে এমন-একটা কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউই যাকে সঠিক বর্ণনা করতে পারেনি। চলন্ত একটা-কিছু এসে হঠাৎ দেখা দেবে জলের ওপর, তীর থেকে দু-তিন মাইল দূরে, জলের

ওপর, আর তার ভীষণ চাকা চালিয়ে জলে হুলুস্থুল তুলবে, ঢেউয়ের মধ্যে সেটা ঝিলিক দেবে ক-বার, এদিক-ওদিক, তারপর ফের তীর বেগে দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে।

জিনিশটা এতই বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করে যে সবচেয়ে সেরা জাতের টেলিস্কোপ দিয়েও তার ওপর নজর রাখা যায় না-দৈর্ঘ্যে সে তিরিশ ফিটের বেশি হবে না, অনেকটা একটা লম্বা চুরুটের মতো দেখতে, রংটা সবুজেমতো, আর সেইজন্যেই সমুদ্রের জল থেকে তাকে সহজে আলাদা করে চেনবার উপায় থাকে না। তাকে সবচেয়ে বেশিবার দেখা গেছে কেপ কড থেকে নোভাস্কোশিয়ার জলে। প্রভাইডেন্স, বস্টন, পোর্টসমাউথ, আর পোর্টল্যাণ্ড থেকে মোটরহোট আর স্টীমলঞ্চেরা তাকে দেখে বারেবারে এই চলন্ত বস্তুটির কাছে যাবার চেষ্টা করেছে–এমনকী তার পেছনে ধাওয়া করে যাবারও চেষ্টা। করেছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তারা তার ধারে-কাছে ঘেঁসতে পারেনি। শুধু-যে অসাধ্যই মনে হয়েছে, তা নয়, পশ্চাদ্ধাবন মনে হয়েছে অর্থহীন। প্রত্যেকবারই সে ধনুক-থেকে-ছোঁড়া তীরের মতো দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে।

স্বভাবতই, বস্তুটি যে কী, কী তার প্রকৃতি, সে-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; আর তা ব্যাপারটাকে আরো জট পাকিয়ে তুলেছে। কিন্তু সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়-করানো কোনো অনুমানই এ-পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। এমনকী ওস্তাদ খালাশিরা পর্যন্ত এটাকে নিয়ে কেবলই মাথা চুলকোচ্ছে, কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। গোড়ায় নাবিকরা ভেবেছিলো এ বুঝি কোনো বৃহদাকার মৎস্য, হয়তো তিমি বা তিমিজিল। কিন্তু এটাও, তো ভালো করেই জানা যে এ-সব জীব জলের ওপর ভেসে ওঠে একটা নির্দিষ্ট সময়। অন্তর, নিশ্বাস নিতে, আর ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে দেয়-আকাশে-জলের আর হাওয়ার ধারা। অথচ এই আশ্চর্য জীবটি–যদি সে কোনো জলচর প্রাণীই হয়–ককখনো ফোয়ারা

ছেটায়নি; যেমন বলে নাবিকেরা। ককখনো সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার ফেস-ফেস আওয়াজও করেনি। অথচ এ যদি কোনো অতিকায় সামুদ্রিক জীব না-হয়, এই অজ্ঞাত জলরাক্ষসকে তবে কোন শ্রেণীতে ফেলা হবে? সে কি তবে পুরাণ-কিংবদন্তির জলচর জীব, গভীর জলে যারা ঘুরে বেড়ায়, ক্রাকেন, অক্টোপাস, লেভিয়াথান, কিংবা সেই বহুশ্রুত মহানাগ?

সে যা-ই হোক, এই জলদানব, সত্যিকারই হোক বা পুরাণের জীবই হোক, বারে বারে দেখা দিয়েছে নিউ-ইংল্যাণ্ডের তীর ঘেঁসে, আর ছোট্ট মোটরবোট, জেলেডিঙি বা প্রমোদতরীগুলো ওখানকার জলে আর ঘুরে বেড়াবার সাহসই পায় না। যখনই সে দেখা দিয়েছে, নৌকোগুলো আতঙ্কিত হয়ে চম্পট দিয়ে ফিরে এসেছে সবচেয়ে কাছে যে-বন্দর থাকে, সেখানে সাবধানের অন্তত মার নেই। জন্তুটি যদি হিংস্র হয়ে থাকে, তবে কারু প্রাণেই তার মুখোমুখি গিয়ে পড়ার দুঃসাহস বা গূঢ় বাসনা নেই।

আর বড়ো-বড়ো জাহাজ এবং উপকূলের মস্ত স্টীমারগুলো? তাদের তো কোনো জলদানবের কাছ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই–তা সে তিমিই হোক, বা তিমিজিলই হোক। কয়েক মাইল দূর থেকে এ-রকম কয়েকটি জলপোত তাকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু যখন তারা তার কাছে যাবার চেষ্টা করেছে, সে দ্রুতবেগে অন্যদিকে চলে গিয়েছে। একদিন, এমনকী, মার্কিনরাষ্ট্রের এক দ্রুতগামী গোলন্দাজ রণতরী বস্টন থেকে বেরিয়েছিলো, জলদানবের পেছন নেবার উদ্দেশ্য যদি নাও তার থেকে থাকতো, ইচ্ছে ছিলো তাকে লক্ষ্য করে অন্তত কয়েকবার কামান ছোঁড়ে। কিন্তু দূর থেকে তাকে দেখবামাত্র চক্ষের পলকে এই জলের জীব উধাও হয়ে যায়, পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যায়, তবে এটা ঠিক এ-যাবৎ এই জলদানব নৌকো বা মানুষ কাউকেই আক্রমণ করার কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

এ-পর্যন্ত পড়তে-না-পড়তেই মিস্টার ওয়ার্ড আবার তার খাশকামরায় ফিরে এলেন, আর আমি প্রতিবেদনটার ওপর থেকে চোখ তুলে পড়া থামিয়ে জিগেস করেছি, এখনও অব্দি তো এই সিন্ধুনাগকে নিয়ে অভিযোগ তোলার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। বড়ো জাহাজ দেখতে পেলেই সে পালিয়ে যায়। ছোটো জাহাজগুলোকে সে কখনোই তাড়া করে না। আবেগ-অনুভূতি বা বুদ্ধিশুদ্ধির বড়াই করতে পারে এমন মাছ আর ক-টাই। বা আছে?

ভুল বললে, স্ট্রক। মাছেরও আবেগ-অনুভূতি আছে, আর যদি কখনও খেপে যায়–

কিন্তু, মিস্টার ওয়ার্ড, এখনও তো এই জীবটিকে খুব-একটা বিপজ্জনক বলে বোধ হচ্ছে না। দুটোর একটা জিনিশ নিশ্চয়ই শিগগিরই ঘটবে। হয় সে এখানকার উপকূল ছেড়ে পাততাড়ি গোটাবে, আর নয়তো কেউ-না-কেউ একদিন তাকে পাকড়াবে-কোনো ধীবরের জালে ধরা পড়বার পর তাকে বেশ রয়ে-সয়ে স্টাডি করে দেখা যাবে ওয়াশিংটনের এই মিউজিয়ামে আরো-একটা আশ্চর্য জীবের আমদানি হবে।

আর এটা যদি সত্যি-কোনো সামুদ্রিক জীব না-হয়? মিস্টার ওয়ার্ড তখন জিগেস করেছেন।

আমি অবাক হয়ে প্রতিবাদ তুলেছি, তাছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে?

আগে পড়েই নাও পুরোটা, মিস্টার ওয়ার্ড আমাকে তাতিয়ে দিয়েছেন।

এবং তারপর আমি গভীর মনোযোগ দিয়েই বাকি অংশটা পড়েছি। এবং লক্ষ করেছি যে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশটায় আমার বোকর্তা কতগুলো অনুচ্ছেদের তলায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে রেখেছেন।

বেশ কিছুকাল ধরেই, এ-যে কোনো সমুদ্রের জীব, এ নিয়ে লোকের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। আর এও সবাই ধরে নিয়েছিলো যে, যদি দল বেঁধে প্রাণপণে এটাকে তাড়া করা যায়, তবে আর-কিছু না-হোক, একে আমাদের এই উপকূলভাগ থেকে ভাগিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু তারপরেই লোকে মত বদল করেছে। লোকে জিগেস করতে শুরু করেছে, মাছ না-হয়ে, এ যদি হয় কোনো অভিনব ও দারুণ শক্তিশালী কোনো নৌকো?

সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার দুর্দান্ত এনজিনটার ক্ষমতা অপরিসীম। হয়তো উদ্ভাবনকর্তা তার এই উদ্ভাবনের মূল সূত্রগুলো বিক্রি করে দেবার আগে, এভাবেই যন্ত্রটা সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল চাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে, চাচ্ছে যে লোকে যাতে এই স্টীমবোট সম্বন্ধে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে–আর গোটা নৌজগৎকে তাক লাগিয়ে দেয়াই বোধকরি তার উদ্দেশ্য : বাহবা পেতে কার না ইচ্ছে থাকে? তার এই স্টীমবোটের চলায় এমন একটা নিশ্চিন্ত দৃঢ়তা, তার প্রত্যেকটি নড়াচড়ায় এমন-একটা সুন্দর ছন্দ, এমন সহজ অনায়াসভঙ্গিতে সে তীরের বেগে পেছন-নেয়া নৌকোর হাত এড়িয়ে যায়–নিশ্চয়ই এত-সব আশ্চর্য গুণের জন্যে তার এই স্টীমবোট জগৎ-জোড়া এক প্রচণ্ড আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে।

গত কয়েক বছরে জাহাজের এনজিন বানাবার বিদ্যা দারুণ উন্নতি করেছে। অতিকায় সব অ্যাটলান্টিক পাড়ি দেয়া স্টীমার পাঁচদিনের মধ্যে এ-মহাদেশ থেকে ও মহাদেশে

যাওয়া সম্ভব করে তুলেছে। আর এনজিনিয়াররা এখনও তাদের শেষ কথা বলেননি। জগতের নৌশক্তিগুলোও খুব-একটা পেছিয়ে পড়ে নেই। ক্রুজার, টর্পেডোবোট, টর্পেডো-বিধ্বংসী জাহাজ-খুব সহজেই অ্যাটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্রুততম জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, ভারত মহাসাগরে যারা বাণিজ্যের ছলে ঘুরে বেড়ায় তাদেরও এরা আদপেই রেয়াৎ করে না।

এ যদি, সত্যি, কোনো নতুন নকশা অনুযায়ী তৈরি-করা স্টীমবোট হয়, এ পর্যন্ত তার চেহারাটা, আদলটা, খুঁটিয়ে দেখবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায়নি। আর কোন এনজিন : যে তাকে এমন দ্রুতবেগে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তার শক্তির উৎস নিশ্চয়ই এখনও কারু জানা নেই। কোন শক্তি মারফৎ তার কলকজা চলে, সেটাই হয়তো প্রধান প্রশ্ন। যেহেতু এই নৌকোটার কোন পাল নেই, এ নিশ্চয়ই হাওয়ার তোড়ে ছোটে না; আর যেহেতু তার কোনো নল দিয়ে ধোঁয়া ওঠে না কুণ্ডলি পাকিয়ে, এ নিশ্চয়ই বাষ্পের জোরেও চলে না।

প্রতিবেদনটার এখানটায় পৌঁছে, আমি আবার পড়া থামিয়ে আমরা প্রশ্নটা উত্থাপন করবো কি না ভাবছি, এমন সময় আমার দ্বিধা লক্ষ করে মিস্টার ওয়ার্ড জানতে চেয়েছেন : কোথায় তোমার ধাঁধা লাগছে, স্ট্রক?

এখানটায়, মিস্টার ওয়ার্ড। এই তথাকথিত জলযানটির চালকশক্তি যে কী, তা কারু জানা নেই, শুধু এটা জানা যে এর গতি প্রচণ্ড, আশ্চর্য দ্রুতবেগে সে চলতে পারে। এর সঙ্গে আমাদের ঐ তাজ্জব মোটর গাড়িটার কী আশ্চর্য মিল–

তাহলে এতক্ষণে তুমি এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছে?

হ্যাঁ, মিস্টার ওয়ার্ড।

সত্যি, একটাই শুধু সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায়। যদি সেই রহস্যময় শোফেয়ার উধাও হয়ে গিয়ে থাকে, যদি সে তার শকট নিয়ে লেক মিশিগানে সলিল সমাধি লাভ করে থাকে, তবে এখন তেমনি জরুরি হয়ে উঠেছে এই রহস্যময় নৌচালকের গুপ্ত রহস্যটি জানা। আর, সে সমুদ্রের তলায় চিরকালের মতো হারিয়ে যাবার আগেই, সেটা জেনে নেয়া জরুরি। কিন্তু এ কেমনধারা বৈজ্ঞানিক? কোথায় এমন অত বৈজ্ঞানিক আছে। যে তার উদ্ভাবনের কথা কাউকেই জানাতে চায় না? মার্কিন সরকার–আর বলতে-কি অন্য যে-কোনো সরকারই–সে যা দাম চায় তা-ই দিতে নিশ্চয়ই রাজি হবে–তার যন্ত্রটা এমনই আশ্চর্য।

অথচ, অবাক কাণ্ড!, দুর্ভাগ্যবশতই বলা যায়, ডাঙার ওপরকার যানটির আবিষ্কর্তা তার গোপন রহস্য বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে জলে ডুবে মরেছে! এই জলে-ভাসা যানটির আবিষ্কর্তাও কি তেমনিভাবে নিজের আবিষ্কারের রহস্য নিয়ে হারিয়ে যাবে? প্রথম যানটি যদি–ধরে নেয়া যাক, যদি–এখনও টিকে থাকে কোথাও, এর কথা আজকাল আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না; দ্বিতীয়টাও কি, সেই একইভাবে, নিজের বাহাদুরি দেখিয়ে সকলের শাবাশি পেয়ে, শেষটায়, কোনো চিহ্ন না-রেখেই, বেমালুম হারিয়ে যাবে?

এই সম্ভাবনাটাকে যে আদৌ উড়িয়ে দেয়া যায় না, তার পক্ষে যে যুক্তি আছে, সেটা এই : চব্বিশ ঘণ্টা আগে ওয়াশিংটনে এই প্রতিবেদন এসে পৌঁছুবার পর এই আশ্চর্য জলযানটির কোনো হদিশই কোনোখান থেকে পাওয়া যায়নি–কেউ আর তাকে কোথাও

চোখে দ্যাখেনি। আদৌ তাকে আর-কখনও দেখা যাবে কি না, দেখা গেলেও–কবে এবং কোথায়, এই কূট প্রশ্নের উত্তর কেউ-বা জানে?

আমার চোখে অবশ্য আরো-একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধরা পড়েছে। ঠিক যখন আমি কথাটা পাড়বো কি না ভাবছি, ঠিক তখনই মিস্টার ওয়ার্ড প্রসঙ্গটা তুলেছেন। এ এক অদ্ভুত কাকতাল। তথ্যটা এই : ঐ আশ্চর্য স্থলযানটি বেমালুম উধাও হয়ে যাবার পরেই এই আশ্চর্য নৌযানটি সকলের চোখে পড়েছে। দুটোরই এনজিনে আছে অজ্ঞাত শক্তি–যার ক্ষমতা প্রচণ্ড। যদি জলে-ডাঙায় একযোগে এই দুই যান তীব্রবেগে ছুটে চলে, তবে মানবজাতির সমূহ বিপদ-জলে-ডাঙায়, নৌকোয়-গাড়িতে, পদব্রজে–কিছুতেই এর খপ্পর থেকে পালানো যাবে না। সেইজন্যে, জলসাধারণের চলাফেরার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে এক্ষুনি পুলিশকে কোনোভাবে আসরে নেমে পড়তে হবে।

মিস্টার ওয়ার্ড কথাটা বিশদ করে বলবামাত্র আমাদের কাজ কী হবে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । কিন্তু কী করে আমরা পাকড়াবো এই আবিষ্কর্তাকে? কিছুক্ষণ আলোচনা করে আমি যাবার জন্যে যেই উঠে দাঁড়িয়েছি, মিস্টার ওয়ার্ড তার ভাবনাটা ভেঙে বলেছেন : এই নৌকো আর ঐ গাড়ি–এই দুয়ের চমকপ্রদ মিলটা খেয়াল করেছে কি, স্ট্রক?

আমিও তা-ই ভাবছিলুম।

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে দুটোই আসলে এক–এটা একটা উভচর যান।

প্রথম চিঠি

৬. প্রথম চিঠি

মিস্টার ওয়ার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি লং স্ট্রিটে আমার নিজের আস্তানাটায় ফিরে এসেছিলুম। সেখানে বৌ-বাচ্চার হৈ-হুঁল্লোড় নেই বলেই এই আশ্চর্য মামলাটা নিয়ে ঠাণ্ডাভাবে বসে-বসে মাথা ঘামাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমার বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে এক বুড়ি, আমার মায়ের আমল থেকে সে আমার দেখাশুনো করে আসছে-তারপর মা মারা যাবার পর আমার এখানেই সে কাটিয়ে দিয়েছে পনেরো বছর।

দু-মাস আগে আমি চাকরি থেকে ছুটি নিয়েছিলুম। ছুটি ফুরোতে এখনও দু-হপ্তা বাকি, যদি-না অপ্রত্যাশিত কোনোকিছু এসে গোল পাকায়–কখনও-কখনও এমন-সব মামলা এসে পড়ে যা নিয়ে এককোঁটাও সবুর করা চলে না, তখন এইসব ছুটি-টুটি মাথায় উঠে যায়, ফের হন্তদন্ত হয়ে কাজে লেগে পড়তে হয়। এই ছুটির অনেকটাই যে মাঠে না-হোক, পাহাড়ে মারা গেছে, তার বিবরণ তো আগেই দিয়েছি, যখন গ্রেট আইরির গুপ্ত রহস্য ভেদ করবার জন্যে পাহাড়ে ছুটতে হয়েছিলো।

আর এখন? এখনও কি আমার পক্ষে উচিত হবে না ছুটির কথা ধামাচাপা দিয়ে জলে-ডাঙায় এই-যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে চলেছে তার ওপর আলো ফেলবার জন্যে আদানুন খেয়ে আবারও কাজে লেগে-পড়া? এই যুগল রহস্য ভেদ করবার সুযোগ পেলে আমি অনেককিছুই দিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু কেমন করে, কোন সূত্র ধরে, এই স্বতশ্চল শকট অথবা বিদ্যুৎক্ষিপ্র তরণীর পেছনে ছুটবো আমি?

ছোটোহাজরি সেরে, পাইপটা জ্বালিয়ে, আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে আমি অলস ভঙ্গিতে সকালবেলার খবরকাগজটা খুলেছি, ভাবছি কোন পাতায় চোখ বোলাবো। রাজনীতি আমাকে থোড়াই টানে, রিপাবলিকান আর ডেমোক্রাটদের মধ্যে এই চিরন্তন কচকচি আর ঝগড়াঝাটি আমাকে বড্ড বিরক্ত আর অসহিষ্ণু করে তোলে। সমাজের হাই সোসাইটির কীর্তিকলাপও আমায় টানে না, খেলার পাতাতেও আমার মোটেই কৌতূহল নেই। কাজেই, শুনে নিশ্চয়ই কেউ আশ্চর্য হবে না যে, প্রথমে ঠিক করেছিলুম দেখি গ্রেট আইরি সম্বন্ধে নর্থ ক্যারোলাইনার কোনো খবর আছে কি না। খবরকাগজের পাতায় নতুন-কিছু থাকার আশা অবশ্য কমই, কারণ মিস্টার স্মিথ আমায় কথা দিয়েছিলেন যে নতুন-কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেই টেলিগ্রাম করে তক্ষুনি আমায় জানিয়ে দেবেন। এ নিয়ে আমার মধ্যে কোনোই সংশয় ছিলো না যে মরগ্যানটনের মেয়র তার চোখকান খোলা রাখবেন–আমি নিজে যতটা সজাগ থাকতুম, ততটাই। খবরকাগজ আমায় নতুন-কিছুই বললে না। একটু পরেই সেটা আমার হাত থেকে খসে পড়ে গেলো, আমি গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেলুম।

বারেবারে ঘুরে-ফিরে গানের ধুয়োর মতো একটা কথাই আমার মনের মধ্যে হানা দিচ্ছিলো : মিস্টার ওয়ার্ড যে-কথাটি বলেছেন, সেই কথাটিই : ডাঙার গাড়ি আর জলের জাহাজ-দুটোই আসলে একই জিনিশ নয় তো? আর-কিছু না-ই হোক, দুটো যন্ত্রই যে। একই হাতের তৈরি, তাতে হয়তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে দুটো এনজিনই একই রকম, একই শক্তির উৎস তাতে এমন প্রচণ্ড গতি সৃষ্টি করে, জলে বা ডাঙায় এর আগে কখনোই যার কোনো তুলনা দেখা যায়নি।

একই আবিষ্কর্তা! নিজেকেই আবারও আমি বোঝাবার চেষ্টা করলুম।

এ-রকম কোনো সিদ্ধান্ত করার পক্ষে যুক্তি ছিলো যথেষ্টই। দুটো যন্ত্র যে কখনোই একসঙ্গে একযোগে আবির্ভূত হয়নি, এই তথ্যটাই সিদ্ধান্তটাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলো। আপন মনেই আমি নিজেকে শোনালুম :গ্রেট আইরির ঐ রহস্যের পরই পর-পর এসে হাজির মিলাউঁকি আর বস্টন। এই নতুন সমস্যাটার জট খোলাও কি আগেরটার মতো এত কঠিন হবে?

অলসভাবে বসে-বসে আমি ভাবছিলুম যে এই নতুন সমস্যাটার সঙ্গে আগেরটার কিন্তু ভারি অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে-যেহেতু দুটোই সাধারণের জীবনহানির ক্ষমতা রাখে। সত্যি-বলতে, গ্রেট আইরির অগ্ন্যুৎপাতে বা ভূমিকম্পে শুধু ব্লু-রিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরই বিপদের সম্ভাবনা ছিলো। এদিকে এখন, মার্কিন মুলুকের প্রতিটি রাস্তা, কিংবা তার উপকূল বা বন্দর ধরে প্রতিটি মাইলেই দেশের মানুষ এই গাড়ি কিংবা

নৌকোর আতঙ্কে ভুগছে-যে-কোনোখানে যে-কোনো সময় ফেটে পড়তে পারে বিপদ, যখন এই গাড়ি বা নৌকো তার খ্যাপা গতিকে নিয়ে বোঁ করে ছুটে বেরুবে।

এটাও দেখলুম–এবং তা প্রত্যাশিতই ছিলো–যে খবরকাগজগুলো নিছক ইঙ্গিতই। করেনি, বরং এই বিপদের সম্ভাবনাটাকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে বড়ো করে দেখিয়েছে। নিরীহ নির্বিরোধী লোকেরা চিরকালই এ-সব ক্ষেত্রে ভয়ে আধমরা হয়ে যায়। যে-বুড়ি আমার দেখাশুননা করে, সে একে কুসংস্কারে ভোগে, তায় সহজেই সবকিছু বিশ্বাস করে বসে–সে-তো এ-সব দেখেশুনে ভীষণ ঘাবড়েই গিয়েছে। সেইদিনই, খাবার সময়, টেবিল

পরিষ্কার করতে-করতে সে হঠাৎ আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালে, এক হাতে জলের বোতল, অন্য হাতে একটা ট্রে, সে একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই জিগেস করলে :কোনো খবর নেই, সার?

সে কী জানতে চাচ্ছে, বুঝতে পেরেই আমি বললুম, না। কোনো খবর নেই।

ঐ ভুতুড়ে গাড়িটা আর ফিরে আসেনি?

না।

আর ঐ অলৌকিক জলযান?

সেই জলযানেরও কোনো পাত্তা নেই। যাদের খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো, তাদেরও কাগজে এ-সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি।

তবে, আপনাদের পুলিশের দফতরে কোনো গোপন খবর আসেনি?

আমরাও একই রকম অন্ধকারে আছি।

তাহলে, সার,–কিছু মনে করবেন না–পুলিশ পুষে আর লাভ কী?

এমনতর প্রশ্ন আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়, আর কখনোই আমি তার কোনো সদুত্তর দিতে পারি না।

এবার দেখবেন কী হবে, বুড়ির গলায় নালিশের সুর, একদিন ভোরবেলায় সে এসে উদয় হবে, কোনো হুঁশিয়ারি না-দিয়েই এসে হাজির হবে এই ভয়ংকর শোফেয়ার, আমাদের রাস্তায় প্রচণ্ড বেগে চালাবে তার গাড়ি, আর আমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলবে!

ভালোই তো! তা যখন হবে তখন তাকে পাকড়াবার একটা সুযোগ পাবো আমরা।

তাকে, সার, আপনারা ককখনো পাকড়াতে পারবেন না।

কেন?

কারণ, সার, সে হলো শয়তান স্বয়ং, খোদ বীলজেবাব, আর শয়তানকে আপনারা গ্রেফতার করবেন কীভাবে?

আমি মনে-মনে ভাবলুম, শয়তানও বিস্তর কাজে লাগে; শয়তান যদি কোথাও নাও থাকতো, আমরা তবু তাকে উদ্ভাবন করে নিতুম, ব্যাখ্যাতীতকে ব্যাখ্যা করবার একটা অস্ত্র তুলে দিতুম লোকের হাতে। সে-ই ঐ লেলিহান শিখা জ্বালিয়েছিলো গ্রেট আইরির চূড়ায়। সে-ই উইসকনসিনে মোটররেসে পুরোনো সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলো। সে-ই ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়েছে কানেটিকাট আর ম্যাসাচুসেটসের জলে। না-হয় যারা অশিক্ষিত তাদের জন্যে একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা গেলো এই শয়তানকে, কিন্তু তবু মানতেই হয় আমরা সত্যিই এখন এক দুর্বোধ প্রহেলিকার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। দুটো যন্ত্রই কি তবে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে? উল্কার বেগে ছুটে বেরিয়েছে তারা, যেন মহাশূন্যে কোনো তারা খসে পড়েছে; আর আগামী একশো বছরে এই রগরগে

কাহিনীটা কিংবদন্তি হয়ে উঠবে, পরের শতাব্দীর মানুষজনের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে দিব্বি মুখরোচক এক কেচ্ছা হিশেবে।

কয়েকদিন ধরেই আমেরিকা আর ইওরোপের খবরকাগজগুলো এই ব্যাপার নিয়ে বেদম মাতামাতি করলে। সম্পাদকীয় মন্তব্যের পর লেখা হলো আরো সম্পাদকীয়; একটা গুজবের গায়ে গিয়ে জেল্লা চড়ালো নতুন আরো-একটা গুজব। গল্প বানাতে পেরেই যাদের প্রাণের আরাম, তারা একের পর এক গল্প ফাঁদলে। দুই মহাদেশেরই জনসাধারণ বেজায় উসকে উঠেছে। ইওরোপের কতগুলো দেশে আবার হিংসে হচ্ছিলো : কেন আমেরিকাই এমন-সব চমকপ্রদ ঘটনার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। যদি এই আশ্চর্য আবিষ্কারগুলো কোনো মার্কিনের হয়, তবে মার্কিন মুলুকের সমরবাহিনী অন্য সব দেশের তুলনায় সমরসজ্জায় অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। মার্কিন দেশের প্রতাপ আর দেমাক তাতে যে আরো বেড়ে যাবে!

দশই জুনের তারিখ দিয়ে, নিউইয়র্কের এক খবরকাগজ এই বিষয় নিয়ে অতীব সুচিন্তিত একটি প্রবন্ধ ছাপলে। সবচেয়ে দ্রুতবেগে যেতে পারে বলে জানা আছে এমন জলযানের সঙ্গে তুলনা করলে এই অলৌকিক জলযানের গতির–সবচেয়ে-কম কী ছিলো তার গতি; তারপর সেই সন্দর্ভ চুলচেরা যুক্তি সাজিয়ে প্রমাণ করে দিলে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যদি এই উদ্ভাবনের গোপন সূত্র থেকে থাকে, তবে ইওরোপ তার কাছ থেকে মাত্র তিন দিন দূরে থাকবে-যে-কালে মার্কিন দেশ থাকবে ইওরোপ থেকে পাঁচদিন দূরে।

যদি আমাদের নিজেদের পুলিশবাহিনী নাছোড়ভাবে গ্রেট আইরির রহস্যভেদ করবার চেষ্টা করে থাকে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই গুপ্ত বাহিনীগুলো নাছোড়ভাবে এই সমস্যার পেছনেই লেগে আছে।

যতবারই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, ততবারই মিস্টার ওয়ার্ড এই প্রসঙ্গটা পেড়েছেন। আমাদের কথাবার্তা শুরু হবে নর্থ ক্যারোলাইনায় আমার ব্যর্থতা নিয়ে টীকা টিপ্পনী দিয়ে, আর আমি তাকে মনে করিয়ে দেবো যে সাফল্যটা নির্ভর করতে কত ডলার খরচ করতে পারতুম, তারই ওপর।

ভেবো না, স্ট্রক, মিথ্যে মনখারাপ কোরো না, বারে-বারেই সান্ত্বনা দিয়েছেন মিস্টার ওয়ার্ড, আমাদের ইনসপেক্টরের কাছে আবারও শিরোপা পাবার কত সুযোগ আসবে, বরং ঐ স্বতশ্চল শকট আর অলৌকিক জলযানের কথাই ভেবে দ্যাখো। জগতের সব ধুরন্ধর গোয়েন্দার আগেই যদি তুমি এদের রহস্য ভেদ করে দিতে পারো, তাহলে ভেবে দ্যাখো এই দফতরের পক্ষে তা কেমন গৌরবের ব্যাপার হবে! আর তোমারই বা গৌরব কতটা হবে!

সন্দেহ নেই, বিভাগের মহিমা বেড়ে যাবে, আমিও প্রত্যুত্তর দিয়েছি, শুধু যদি আপনি এই সমস্যাটার জট খোলবার ভার আমার ওপর দিতেন–

ভবিষ্যতের গর্ভে কী-যে আছে, তা কে বলতে পারে স্ট্রক! বরং একটু সবুর করেই দেখা যাক! একটু অপেক্ষাই করা যাক না-হয়।

অবস্থা যখন এমনি ন-যজৌ ন-তথৌ দাঁড়িয়ে আছে, তখন পনেরোই জুনের ভোরবেলায় আমার বুড়ি দাসী হরকরার কাছ থেকে একটা চিঠি এনে দিলে আমায়, রেজিস্টারি চিঠি, আমাকে সেটা সই করে রাখতে হবে। আমি প্রেরকের ঠিকানাটার দিকে তাকালুম। হাতের লেখাটা আমার একেবারেই অচেনা। ডাকটিকিটের ওপর মরগ্যানটনের ছাপ, দু-দিন আগেকার একটা তারিখ।

মরগ্যানটন! অবশেষে তাহলে মিস্টার এলিয়াস স্মিথের কাছ থেকে এত্তেলা এলো!

হ্যাঁ, আমি আমার বুড়ি দাসীকে শুনিয়ে-শুনিয়েই বললুম, নিশ্চয়ই অবশেষে মিস্টার স্মিথের কাছ থেকে কোনো খবর এলো। মরগ্যানটনে তো আর-কাউকেই আমি চিনি না। আর হঠাৎ যদি তিনি আমায় চিঠি লিখে থাকেন, তবে সেটাই হবে খবর, সংবাদ, বাঁকা হরফে।

মরগ্যানটন? বুড়ি একটু অবাক সুরেই বললে, আচ্ছা, ঐখানেই তো শয়তানের সাঙ্গোপাঙ্গরা তাদের পাহাড়ে আগুন জ্বেলেছিলো, তাই না?

ঠিক তাই।

ওহ্, সার! আশা করি আবার আপনাকে ওখানে ফিরে যেতে হবে না!

কেন? গেলে কী হবে?

তাহলে যে আপনি গ্রেট আইরির ঐ উনুনটায় পুড়ে মরবেন! আমি কিন্তু আপনার অমনতর অপধাত-মরণ চাই না।

আরে, অত মনখারাপ করার কী আছে? দেখাই যাক না, হয়তো ভালো খবরই পাওয়া যাবে এই চিঠিতে।

লেফাফাটার ওপর গালা দিয়ে মোহর-করা, আর পাশে তিনটে তারা খোদাই-করা। কাগজটা শুধু যে খুব পুরু তা-ই নয়, বেশ শক্তপোক্ত। আমি খামটা খুলে ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে নিয়ে এলুম। একটাই কাগজ, দামি, চার ভাজ করা, তার শুধু একদিকেই লেখা। আমি প্রথমে পত্রলেখকের স্বাক্ষরটা খুঁজলুম।

কোথাও কারু কোনো স্বাক্ষর নেই! শেষ পঙক্তির পরে শুধু কারু পুরো নামের তিনটে আদ্যক্ষর।

চিঠিটা দেখছি মরগ্যানটনের মেয়রের কাছ থেকে আসেনি।

তাহলে কার কাছ থেকে এলো চিঠি? বুড়ি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিগেস করলে। তার কৌতূহল আর বাগ মানছে না।

তিনটে হরফের দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে আমি বললুম, এই হরফগুলো দিয়ে নাম হতে পারে, এমন-কাউকেই আমি চিনি না। মরগ্যানটনেও নয়, অন্য কোথাও নয়!

হাতের লেখা স্পষ্ট, দানাদার। সবশুদু কুড়ি লাইনও হবে কি না সন্দেহ। এই রইলো চিঠিটা, ভাগ্যিশ কী ভেবে তখন আমি তার একটা নকল রেখেছিলুম। আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে চিঠিটার নাম/তারিখ আমাকে জানালে যে সে এসেছে ঐ রহস্যময় গ্রে টু আইরি থেকে :

গ্রেট আইরি, ব্লু-রিজ মাউন্টেনস
নর্থ ক্যারোলাইনা; জুন ১৩

মিস্টার স্ট্রক বরাবরে
চীফ ইন্সপেক্টর অভ পুলিশ
৩৪ লং স্ট্রিট, ওয়াশিংটন, ডি. সি.

সবিনয় নিবেদন :

আপনার উপর গ্রেট আইরির রহস্য ভেদ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল।

আপনি ২৮শে এপ্রিল পাহাড়ে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মরগ্যানটনের মেয়র এবং দুইজন পথপ্রদর্শক।

আপনি দেয়ালটির পাদদেশ অব্দি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাস ঘিরিয়া একবার পাকও খাইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন যে ইহা অত্যন্ত উঁচু এবং এতই খাড়াই যে ইহার চূড়ায় চড়া একেবারেই অসম্ভব।

আপনারা তন্নতন্ন করিয়া হাৎড়াইয়া দেখিয়াছিলেন কোথাও কোনো খাঁজ বা ফাটল আছে কি না-থাকিলে হয়তো উপরে উঠা যাইবে। কিন্তু আপনারা ঐ-রূপ কোনোকিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

জানিয়া রাখুন : গ্রেট আইরিতে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই; যদি কেহ তবুও দৈবাৎ, তাহার ভিতর ঢোকে, তবে সে আর-কখনও ফিরিয়া আসে না।

কখনও আর এইরূপ চেষ্টা করিবেন না, কেননা দ্বিতীয় বারের বেলায় প্রথম বারের মতো ফল হইবে না–বরং আপনার পক্ষে ফলাফল রীতিমতো মারাত্মক হইবে।

এই সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করিবেন না, নতুবা আপনার কপালে বিশেষ দুর্ভোগ আছে।

আবারও : সাবধান!

মা. অ. ও.

.

৭. তিন নম্বর যন্ত্র

কবুল করতেই হয় যে চিঠিটা পড়ে গোড়ায় আমি একেবারেই বোমকে গিয়েছিলুম। আপনা থেকেই আমার মুখ ফুটে বেরিয়ে আসছিলো উঃ আর আঃ। বুড়ি দাসী আমার হাবভাব দেখে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, কী-যে ভাববে কিছুই বুঝতে পারছিলো না।

অ্যাঁ, সার? কোনো খারাপ খবর নাকি?

আমি উত্তরে–কারণ সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি তার কাছে কোনোকিছু গোপন করিনি–চিঠিটা তাকে আদ্যোপান্ত, আগাপাশতলা, পড়ে শোনালাম। শুনতে-শুনতে উৎকণ্ঠায় তার প্রায় ভির্মি খাবার জোগাড়।

ঠাট্টা করেছে নিশ্চয়ই কেউ, আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে শুধু আমার কাঁধ ঝাঁকালুম।

তা, আমার কুসংস্কারে-ভরা পরিচারিকা বললে, এ যদি খোদ শয়তানের কাছ থেকে নাও এসে থাকে, শয়তানের মুলুক থেকে তো এসেছে!

বুড়ি হাতের কাজ সামলাতে চলে যেতেই, আমি আবারও এই অপ্রত্যাশিত চিঠিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিলুম। ভেবে-টেবে মনে হলো কেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করে আমাকে ভড়কে দিতে চেয়েছে। আমি যে গ্রেট আইরি গিয়েছিলুম, অভিযানে, সে-কথা তো সব্বাই জানে। খবরকাগজগুলোয় তার বিশদ বিবরণ বেরিয়েছে। কোনো রসিক ব্যক্তি–এমনকী মার্কিন মুলুকেও এমনতর রসিক আছে কয়েকজন নিশ্চয়ই আমাকে বিদ্রূপ করে এই হুমকিভরা চিঠিটা পাঠিয়েছে।

আইরি যে সত্যি-সত্যি একদল দুর্বৃত্তের গোপন আস্তানা হয়ে পড়েছে, তা কেমন যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, পুলিশ তাদের গোপন ডেরাটা খুঁজে বার করে ফেলবে, এইই যদি তাদের আশঙ্কা হয়ে থাকে, তবে তারা নিশ্চয়ই যেচে সাধ করে নিজেদের দিকে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে না। তাদের নিরাপত্তা ততদিনই অটুট থাকবে,

যতদিন তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানবে না। তারা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারবে যে এভাবে হুমকি দিয়ে নিজেদের জানান দিয়ে নিজেদের জাহির করে–তারা গোটা পুলিশবাহিনীকেই তাতিয়ে দেবে–আবার তাদের আইরিতে ডেকে আনবে। ডায়নামাইট বা মেলিনাইট অনায়াসেই তাদের দুর্গে ঢোকবার রাস্তা তৈরি করে দেবে। তাছাড়া, তারা নিজেরাই বা কেমন করে আইরির ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে–যদি-না আইরিতে যাবার এমন-কোনো গোপন রাস্তা থেকে থাকে যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে? নিশ্চয়ই এটা কোনো ভাড় না-হয় পাগলের কীর্তি : এই শাসানিতে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই–এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাববারই কিছু নেই-না-হলে এই ভড়কে বড্ড-বেশি আশকারা দেয়া হবে।

কাজেই, যদিও একবার আমি ভেবেছিলুম মিস্টার ওয়ার্ডকে গিয়ে চিঠিটা দেখিয়ে আসি, আমি ঠিক করলুম, না, এ নিয়ে আর-কোনো উচ্চবাচ্যই নয়। তিনি নিশ্চয়ই এই হুমকিটাকে কোনো পাত্তাই দেবেন না। তবে আমি অবশ্য চিঠিটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিইনি, বরং সযত্নে আমার ডেস্কে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। যদি এই একই মা অ, ও আদ্যক্ষর সমেত আরো এই ধরনের হুমকি আসে, তখন না-হয় এ-চিঠি নিয়ে আবার ভাবা যাবে। .

বেশ শান্তভাবেই কেটে গেছে কয়েকদিন । শিগগির যে আমায় ওয়াশিংটন ছেড়ে বুনো হাঁসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হবে, এমন কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিলুম না। তবে আমি যে-ধরনের কাজ করি তাতে পরের দিন যে কী হবে, তা কেউই আগে থেকে বলতে পারে না। যে-কোনো মুহূর্তে আমাকে তলব করে বলা হতে পারে, ওহে স্ট্রক, অরেগন থেকে ফ্লরিডা ছোটাছুটি করে মরো, ধেয়ে যাও মাইন থেকে টেক্সাস। আর

ঐঅস্বস্তিটা খচখচ করে বেঁধে সারাক্ষণ : আমার হাতে যে-নতুন কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, তা যদি গ্রেট আইরির অভিযানটার মতোই ব্যর্থ হয়, তাহলে আমার বোধহয় দফতরে ফিরে গিয়ে মাথা নিচু করে ইস্তফাই দিয়ে আসতে হবে। রহস্যময় শোফেয়ার সম্বন্ধে আর-কোনো খবরই নেই। জানতুম যে আমাদের সরকার–অন্যান্য বিদেশী দেশের সরকারও–আমেরিকার জলে-ভাঙায় সারাক্ষণ কড়া নজর রেখে চলেছে। অবশ্য এটা ঠিক আমাদের এই মার্কিন মুলুক এতই বিশাল-একটা দেশ যে তার সর্বত্র সবসময় সজাগ পাহারা রাখা সম্ভব নয়; কিন্তু এই যুগল আবিষ্কর্তা এর আগে তো তাদের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে কোনো জনমানবশূন্য ফাঁকা এলাকা বেছে নেয়নি, বরং বাহবা পাবার জন্যে এমন সব জায়গায় আবির্ভূত হয়েছে যেগুলো খুবই জনবহুল। শুধু তা-ই নয়, একটা বহুবিজ্ঞাপিত রেসের দিনে সে এসে হাজির উইসকনসিনের রাস্তায়, সবসময় যেখানে হাজার জলযান চলে সেখানে, বস্টনে, আবির্ভাব হয়েছে তার জল্যান নিয়ে। একে মোটেই আত্মগোপন করে থাকবার ব্যাকুল চেষ্টা বলে বর্ণনা করা যায় নঐ দুঃসাহসী বেপরোয়া চালকটির যদি সলিল সমাধি না-হয়ে থাকে তার ডুবে-মরার সম্ভাবনাটা হয়তো অলৌকিক জলযানটি এখন ইওরোপের জলে তোলপাড় তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর নয় তো গিতে আশ্রয় নিয়েছে কোনো গোপন আস্তানায়। আর, সেক্ষেত্রে–

আহ! বারেবারে এই একটা কথাই আমি শোনালুম নিজেকে। এ-রকম কোনো আশ্রয়, যদি এই বাহাদুর উদ্ভাবক চায়, যেটা যুগপৎ গোপন এবং অগম্য, তাহলে গ্রেট আইরির চেয়ে ভালো আর-কোন জায়গা সে পাবে! কিন্তু কোনো জলযান সেখানে যাবে কী করে, আর কোনো মোটরগাড়ির বা কী করে বেয়ে উঠবে পাহাড়ের ঢাল! শুধু সেইসব শিকারি পাখি, যারা মহাশূন্যে পাক খায়, ঈগল কিংবা কণ্ডর, তারাই সেখানে আশ্রয় পেতে পারে।

উনিশে জুন আমি আমার দফতরে যাবো বলে বেরিয়েছি, রাস্তায় দেখি দুটি অচেনা লোক কিরকম তা তে আমাকে দেখছে। লোকগুলোকে আদপেই চিনি না বলে গোড়ায় আমি ব্যাপারটা খেয়াল করিনি। সত্যি বলতে, আমি তাদের কোনো পাত্তাই দিতুম না, যদি-না বাড়ি ফিরে-আসার পর আমার বুড়ি দাসী এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতো।

কয়েকদিন ধরেই নাকি–সে খেয়াল করেছে এই দুটো লোক রাস্তায় আমার ওপর কড়া নজর রেখে চলেছে। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে–আমার বাড়ি থেকে একশো পা দূরে হবে কি না সন্দেহ, এমন জায়গায়, প্রকাশ্যে; আর তার অনুমান : আমি যেখানেই যাই তারা বোধহয় ছায়ার মতো আমার পেছনে এঁটে থাকে, আমাকে সর্বত্র অনুসরণ করে।

এটা তুমি ঠিক জানো? আমি জানতে চেয়েছি।

হ্যাঁ, সার; এই-তো কালকেই, আপনি যখন বাড়ি ফিরে এলেন, লোকগুলো পায়ে-পায়ে ঠিক আপনার পেছন-পেছন এলো, একেবারে দরজা অব্দি, তারপর ভেতরে ঢুকে আপনি যেই দরজা বন্ধ করে দিলেন, অমনি তারা চটপট কেটে পড়লো।

নিশ্চয়ই তোমার বোঝবার কোনো ভুল হয়েছে?

মোটেই না।

লোক দুটোকে আবার দেখতে পেলে তুমি চিনবে পারবে?

নিশ্চয়ই।

বেশ, আমি হেসে ফেলেছি, দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যেও গোয়েন্দা হবার মতো মালমশলা আছে। আমাদের দফতরেই তোমাকে একটা কাজ দেবার সুপারিশ করবো।

বেশ, যত-ইচ্ছে ঠাট্টা করুন। তবে আমার চোখ-দুটোয় এখনও ছানি পড়ে যায়নি– লোককে দেখে চেনবার জন্যে এখনও আমার কোনো চশমা লাগে না। কেউ-একজন যে আপনার ওপর সারাক্ষণ নজর রেখে চলেছে, এ-বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। আপনার বরং উচিত হবে এরা কে তা জানবার জন্যে এদের পেছনে পুলিশের লোক লেলিয়ে দেয়া।

ঠিক আছে, তা-ই করবো না-হয়, তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আমি বলেছি। আর আমাদের লোক যখন ছিনে জোঁকের মতো তাদের এটে বসবে, তখনই আমরা বুঝতে পারবো এই রহস্যময় লোকেরা আমার কাছে কী চায়।

সত্যি-বলতে, আমি তার আশঙ্কা বা উত্তেজনাটাকে খুব-একটা পাত্তা দিইনি। তবু, তার মন রাখার জন্যে, বলেছি, এবার বাইরে গেলে আমার আশপাশে কারা আছে, সেটা ভালো করে লক্ষ করে দেখবো।

তা-ই সবচেয়ে ভালো হবে, সার।

আমার এই বুড়ি দাসী অকারণেই নিজেকে সবসময় ভয় পাইয়ে দেয়; সে বলেছে, আবার যদি তাদের আমি দেখতে পাই, আপনি বাড়ির বাইরে বেরুবার আগে আপনাকে আমি তাদের কথা জানিয়ে দেবো।

ঠিক আছে! রাজি।এই বলে এই আলোচনাটায় আমি ইতি টেনে দিয়েছি। কারণ, জানাই ছিলো, তাকে যদি এ নিয়ে আরো কিছু বলতে দিই তো সে শেষটায় খোদ বীলজেবাবকে না-হোক তার দক্ষিণ হস্তটিকে আমার পেছনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

পরের দু-দিন অন্তত কেউই আমার ওপর নজর রাখেনি-বেরুবার সময়েও না, ফেরবার সময়ও না। কাজেই আমি ধরে নিয়েছি যে আমার বুড়ি দাসী আবারও কিছুই

থেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একটা গন্ধগোকুলের টিবি তৈরি করে বসেছে। কিন্তু বাইশে জুনের সকালবেলায় হুড়মুড় করে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে ছুটে এসেছে ওপরতলায়, আমার ঘরে দুম করে ঢুকে পড়ে উত্তেজনায় খাবি খেতে-খেতে বলেছে :সার! সার!

কী?

আবার তারা এসে হাজির হয়েছে!

কারা?

ঐ দুই খোচর–নাছোড়বান্দার মতো!

দুই খোচর! অ্যাদ্দিন ধরে সে যে-কাহনটা ফাঁদছিলো আমি সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম।

ঐ তারাই! রাস্তায়! ঠিক আমাদের জানলার সামনে! বাড়িটার ওপর নজর রাখছে, খেয়াল রাখছে কখন আপনি বাড়ি থেকে বেরোন।

আমি জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়িটা একটু ফাঁক করে বেশি তুলিনি, কারণ সত্যি কেউ যদি নজর রেখে থাকে তবে তার মনে উটকো সন্দেহ ঢুকে যেতে পারে–আমি দেখতে পেলুম, সাইডওয়াকে, ফুটপাথে, দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ভালো দেখতে তাদের, স্বাস্থ্যবান, চওড়া-কাঁধ, প্রাণের প্রাচুর্যে যেন টগবগই করছে, বয়েস দুজনেরই চল্লিশের নিচে, পরনে হালফ্যাশানের পোশাক, চোখ অব্দি টেনে নামানো টুপি, ভারি পশমের কোট-পাঁৎলুন, মজবুত বুটজুতো, হাতে ছড়ি। না, কোনো সন্দেহই আর নেই, এরা সারাক্ষণ আমার বাড়ির ওপরই নজর রেখে চলেছে-আমার বাড়িতে যেহেতু কোনো দারোয়ান নেই তাতে তাদের সুবিধেই হয়েছে। তারপর, নিজেদের মধ্যে কী-সব বলাবলি করে, তারা পায়চারি করতে-করতে একটু দূরে চলে গেলো–এবং ফিরে এলো আবার, ঠিক জানলার নিচে।

তুমি ঠিক চিনতে পেরেছে এদের? এরাই সেই লোক, যারা আগেও নজর রেখেছিলো?

হ্যাঁ, সার।

না, বেঘোর-বিভ্রম বলে আর ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়া চলে না। ঠিক করলুম, এক্টা হেস্তনেস্ত করে ফেলবো। আমি নিজেই যে তাদের অনুসরণ করবো, তা হয় না, কারণ আমি নিশ্চয়ই তাদের কাছে অতি-পরিচিত। সরাসরি গিয়ে তাদের সঙ্গে কিছু বলেও ঠিক কোনো ফায়দা হবে না। কিন্তু আজই, সম্ভব হলে এক্ষুনি, আমাদের দফতরের একজন সেরা গোয়েন্দাকে আমার বাড়িটাকে পাহারা দিতে বলতে হবে। যদি তারা কালকেও আবার এসে হাজির হয়, তবে তাদের পেছন নিয়ে গিয়ে তাদের আস্তানাটা দেখে আসতে

হবে–যতক্ষণ-না জানা যাচ্ছে এরা কে, বা কারা, ততক্ষণ এদের ওপর থেকে নজর সরানো চলবে না।

এখন কি তারা অপেক্ষা করে আছে জানতে, কখন আমি দফতরে যাই? কারণ, যেমন রোজই যাই, আজও তো সেখানেই যাবো আমি। যদি তারা আমার সঙ্গ নেয় তবে তাদের আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে আমন্ত্রণও জানাতে পারি, যদিও সেজন্যে তারা আমায় কোনো ধন্যবাদ দেবে না।

আমার টুপিটা তুলে নিলুম আমি; বুড়ি দাসী সমানে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে; আমি নিচে নেমে, দরজা খুলে, রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

লোক দুটো সেখানে আর নেই।

সারাক্ষণ সজাগ থেকেও সেদিন আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় তাদের টুপির ডগাটিও আর দেখতে পাইনি। সেইদিন থেকে আমার বুড়ি দাসী, অথবা আমি, কেউই তাদের আর বাড়ির সামনে দেখতে পাইনি, অন্য-কোনোখানেও তাদের সঙ্গে আমার আর-কোনো মোলাকাৎ হয়নি। তাদের চেহারাছিরি অবিশ্যি আমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো। এদের আমি কোনোদিনই ভুলবো না।

তাদের নজরদারির লক্ষ্য আমিই ছিলুম, এটা ধরে নিয়েও হয়তো বলা যায় যে এরা ঠিক আমার পরিচয় জেনে নিতে পারেনি–অর্থাৎ আমায় শনাক্ত করতে পারেনি।

একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তারা এখন আর আমার পেছনে ছায়ার মতো, লেগে নেই। কাজেই শেষটায় আমার মনে হলো মা, অ, ও-র চিঠিটা যেমন, এও বোধকরি তেমনি-কোনো ব্যাপার : গুরুত্বহীন, এলেবেলে।

তারপর চব্বিশে জুন, এমন-একটা নতুন ঘটনা ঘটলো যে তাতে আগেকার অলৌকিক জলয়ান বা স্বতশ্চল শকটের মতোই এই নতুন ঘটনায় জনসাধারণের এবং আমার কৌতূহল বেজায় উসকে উঠলো। ওয়াশিংটন ইভনিংস্টার নিচের বিবরণটি দিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলে সবখানে, আর পরদিন ভোরে সবগুলো কাগজেই সেই বিবরণ বিশদভাবে বেরুলে।

টোপেকা থেকে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে, ক্যানসাস-এ কিরডাল নামে একটা হ্রদ আছে, যার কথা খুব বেশি লোকের জানা নেই। অথচ এই হ্রদটার কথা সকলেরই জানা উচিত ছিলো, এবং আশা করা যায় সবাই এখন থেকে লেক কিরডাল সম্বন্ধে আগ্রহী হবে– কেননা একটি ভারি অদ্ভুত ঘটনার ফলে এর দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

চারপাশে দুর্গম পাহাড়, মাঝখানে এই হ্রদ, সেখান থেকে জল বেরুবার কোনো রাস্তাই বোধহয় নেই। মেঘ হয়ে, বাষ্প হয়ে যা উবে যায়, তাকেই পূরণ করে দেয় আশপাশের ছোটো-ছোটো পাহাড়ি সোঁতা আর বর্ষার মুলধারে বৃষ্টি।

লেক কিরডাল প্রায় পঁচাত্তর বর্গমাইল আয়তনে, আর যে-পাহাড়গুলো তাকে ঘিরে আছে তার চাইতে তার উপরিতল অল্প-একটু নিচে। পাহাড়ের মধ্যে বন্দী, সেখানে পৌঁছুতে গেলে পেরুতে হয় সংকীর্ণ ও উপলবন্ধুর কতগুলো নয়ানজুলি। তার তীরগুলোয় অবশ্য

কতগুলো ছোটো-ছোটো পাড়াগাঁ গজিয়ে উঠেছে। হ্রদে অজস্র মাছ আছে, জেলেডিঙিগুলো সারাক্ষণই ঘুরে বেড়ায় হ্রদের জলে।

কোনো-কোনো জায়গায় লেক কিরডাল পঞ্চাশ ফিট গভীর, তাও তীরের আশপাশেই। এই বিশাল অববাহিকার ধারে-ধারে উঠে গিয়েছে তীক্ষ্ণ, ধারালো পাথর। জোরে যখন হাওয়া দেয়, ঢেউগুলো খ্যাপার মতো তীরে আছড়ায়, কাছাকাছি যে-সব বাড়ি থাকে, তাতে পিচকিরির মতো জল ঝরে পড়ে, কখনও প্রায় হারিকেনের মতোই তীব্র। লেকটা তীরের কাছেই জায়গায় জায়গায় বেশ গভীর, মাঝখানটা আরো-গভীর, সেখানে কোথাও-কোথাও মেপে দেখা গেছে যে সেখানে তিনশো ফিটেরও বেশি জল আছে।

এখানকার মাছের ব্যাবসা বেশ কয়েক হাজার লোকেরই জীবিকানির্বাহের উপায়, শুধু-যে কয়েকশো জেলেডিঙিই আছে সেখানে তা নয়, গোটা বারো ছোটো-ছোটো স্টীমারও রয়েছে ধীবরদের সাহায্যের জন্যে। পাহাড়ের গণ্ডিটা পেরিয়ে গেলে পৌঁছুনো যায় রেলের রাস্তায়,– যেখান থেকে মাছ চালান হয় গোটা ক্যানসাস রাজ্যে, ও আশপাশের রাজ্যেও।

আমরা যে-চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ দিতে বসেছি, সেটা বোঝবার জন্যে লেক কিরড়ালের এই পরিচয় মনে-করে-রাখা খুবই জরুরি।

কিছুকাল ধরে, জেলেরা লক্ষ করছে লেকের জলে মাঝে-মাঝেই তুমুল আলোড়ন উঠছে। কখনও জল এতটাই ফেনিয়ে ফুলে ওঠে যে মনে হয় কিছু-একটা যেন ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে সবেগে উঠে আসতে চাচ্ছে। এমনকী আবহাওয়া যখন অতীব প্রশান্ত, যখন–

www.bengaliebook.com

কোথাও কোনো হাওয়ার রেশমাত্র নেই, তখনও মাঝে-মাঝে ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে জল স্তম্ভের মতো উঠে আসে।

প্রচণ্ড ঢেউ আর ব্যাখ্যাতীত সব চোরাস্রোতের পাল্লায় পড়ে, কোনো-কোনো জেলেডিঙি পাগলের মতো আছড়ায় জলে, আয়ত্তের, বাইরে চলে যায়। কখনও একটার গায়ে আরেকটা এসে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ে, ধাক্কা খায়, তার ফলে অনেক নৌকোরই সমূহ ক্ষতি হয়েছে, এই ক-দিনে।

জলের এই দুর্দম আলোড়নের স্পষ্টতই কোনো উৎস আছে এই লেকের গভীরে; ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে অনেকরকম ব্যাখ্যা দেবারই চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে, এরকম-একটা মত শোনা গিয়েছিলো যে, এই উৎপাতের মূল কারণ হয় জলের তলায় কোনো ভূকম্পন অথবা কোনো আগ্নেয়গিরির আড়মোড়া ভাঙা। কিন্তু, এই অনুমানটিকে এই জন্যেই বাতিল করতে হয়েছে যে জলের এই আলোড়ন কোনো-একটা বিশেষ জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয়, যখন-তখন যে-কোনোখানে, সারা হ্রদেই, এই জলস্তম্ভ ফিনকি দিয়ে উঠে যেতে পারে। এই তীরে, ঐ তীরে, মাঝখানে কিংবা পাড় ঘেঁসে, প্রায় একটা সরলরেখায় এই জলস্তম্ভ ছুটে চলে–আর তাইতে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির কথাটা পুরোপুরি বাতিল করে দিতে হয়েছে।

আরো একটা অনুমান একসময় বেশ চলেছিলো, লোকে ৮ ভেবেছিলো বুঝি কোনো অতিকায় জলরাক্ষস এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, সে-ই জলের মধ্যে এমন অস্থির আলোড়ন তোলে। কিন্তু জন্তুটি যদি এই হ্রদে জন্মে না-থাকে, এবং এই হ্রদেই যদি সে এমন অতিকায় আকার না-নিয়ে থাকে, যেটা বোধকরি আদৌ বিশ্বাস্য নয়–তাহলে সে

নিশ্চয়ই বাইরে থেকে একদিন এখানে এসে হাজির হয়েছে। লেক কিরডালের সঙ্গে, আবারও মনে করিয়ে দিই, অন্যকোনো জলাশয়ের কোনো যোগাযোগই নেই। লেকটা যদি কোনো সমুদ্রের ধারে অবস্থিত হতো, হয়তো জলের তলায় গভীর-গোপন খাল থাকতে পারতো; কিন্তু মার্কিন মুলুকের একেবারে মাঝখানে, সমুদ্রতল থেকে কয়েক হাজার ফিট ওপরে, এ-রকম কিছুই হতে পারে না। অর্থাৎ, এটা এমনই-একটি ধাঁধা যার উত্তরটা কারুই জানা নেই; এই হিংটিংছট হেঁয়ালিটির কী কী যে সুষ্ঠু সমাধান নয়, তা বলা যতখানি সহজ, এর সত্যিকার মীমাংসাটা যে কীসে, সেটা বলা তার চেয়ে শতগুণে কঠিন।

এমন কি সম্ভব যে লেকের জলের তলায় কেউ কোনো ডুবোজাহাজ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে? ডুবোজাহাজ তো আজ আর কল্পনার সামগ্রী নয়, অসম্ভবও নয়। কাপ্তেন নেমোর নটিলাসএর কথা বাদ দিলেও, এটা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন যে কয়েক বছর আগে কানেটিকাটের ব্রিজপোর্টে দ্য প্রোটেক্টর নামে একটা জাহাজ ভাসানো হয়েছিলো, সেটা জলের ওপর দিয়ে যেমন যেতে পারতো, জলের তলাতেও তেমনি সে অবাধে আনাগোনা করতে পারতো, এমনকী সেটা ছিলো উভচর-ডাঙার ওপর দিয়েও চলাফেরা করার ক্ষমতা তার ছিলো। লেক নামক এক বৈজ্ঞানিক এই প্রোটেক্টর-এর উদ্ভাবন করেছিলেন, তার ছিলো দুটি মোটর, যেটা বিদ্যুতে চলতো সেটা ছিলো পঁচাত্তর অশ্বশক্তির, আর যেটা গ্যাসোলিনে অর্থাৎ পেট্রলে চলতো সেটা ছিলো আড়াইশো অশ্বশক্তির, তার আবার একগজ বেড়ের চাকাও ছিলো একাধিক, যার সাহায্যে সে ডাঙার ওপর দিয়ে গড়গড় করে চলে যেতে পারতো–সমুদ্রেও সাঁৎরে যেতে পারতো।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও, যদি ধরেই নেয়া যায় যে লেক কিরডালে জলস্তম্ভ ওঠায় কোনো শক্তিশালী ডুবোজাহাজ, আগেরগুলোর চাইতে যেটা আরো-নিখুঁত, তবু এই ধাঁধাটা থেকেই যায় : এই ডুবোজাহাজ লেক কিরডালে এসে পৌঁছুলো কী করে। পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই হ্রদ কোনো জলরাক্ষসের কাছে যেমন, কোনো ডুবোজাহাজের কাছেও তেমনি অগম্য।

যেভাবেই এই হেঁয়ালিটির সমাধান হোক না কেন, এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারটির সত্যতা সম্বন্ধে বিশে জুনের পর থেকে আর-কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন, অপরাহ্নে স্কুনার মার্কেল সব পাল খাঁটিয়ে তরতর করে ভেসে যাচ্ছিলো, হঠাৎ সে জলের তলায় কিসের সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খায়, সেখানে কাছাকাছি কোনো ডুবোপাহাড়, বা পাথর, ছিলো না– কেননা হ্রদটা সেখানে ছিলো অন্তত নব্বই ফিট গভীর। স্কুনারটির গলুই এবং পাশ ভয়ংঙ্কর চোট খেয়ে জখম হয়ে যায়, প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলো। তার ডেকগুলো সম্পূর্ণ ডুবে যাবার আগে সে কোনোমতে ধুঁকতে ধুঁকতে তীরে এসে পৌঁছুতে পেরেছিলো।

যখন পাম্প করে জল সরিয়ে মার্কেলকে ডাঙায় তোলা হয়, পরীক্ষা করে দেখা যায় যে কোনো চোখা ধারালো কিছুর সঙ্গে ঘা খেয়ে তার গলুইটা একেবারেই ভেঙে গিয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে লেক কিরডালের জলের তলায় সত্যিই কোনো পরম শক্তিশালী ডুবোজাহাজ অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

এটা অবশ্য সত্যিই ব্যাখ্যার অগম্য। শুধু-যে এই ধাঁধাটার কোনো উত্তর নেই- ডুবোজাহাজটা সেখানে গেলে কী করে, তা-ই নয়, এটাও একটা বড়ো প্রশ্ন : ঐ

ডুবোজাহাজ লেক কিরডালের জলের তলায় কী করছে? কেন সে কখনও জলের ওপর ভেসে ওঠে না? কেন তার উদ্ভাবক বা মালিক এ-রকমভাবে আত্মগোপন করে আছে? তার এই উদ্দাম ছোটাছুটির জন্যে আরো-কত বিপর্যয় বা সর্বনাশ আমরা প্রত্যাশা করবো?

সেদিন ছিলো একটা রহস্যময় স্বতশ্চল শকট, তারপর এলো রহস্যময় জলযান। এখন এসে হাজির এক রহস্যময় ডুবোজাহাজ–যেন নটিলাসেরই দোসর।

আমরা কি তবে এই সিদ্ধান্ত করবো যে তিনটি এনজিনই একই উদ্ভাবকের দুর্দান্ত প্রতিভার পরিচায়ক? এও কি হতে পারে এই তিনই আসলে একটিই যান–একে-তিন-তিনে-এক সর্বত্রগামী অসীম শক্তিশালী কোনো শকট?

.

৮. যেমন করেই হোক

ইভনিং স্টার-এর ইঙ্গিতটা প্রায় যেন কোনো উদ্ভাস, যেন কোনো দিব্যদৃষ্টির ফল । সকলেরই সেটা মনে ধরে গেলো। এই তিনটি যন্ত্র যে একই উদ্ভাবকের প্রতিভার ফসল তাই নয়, তিনটি যন্ত্রই আসলে এক–ভিন্ন-ভিন্ন কোনো যান নয়। ডাঙায় যেটা চলে, সেটা জলের ওপরেও ভাসে, আবার জলের তলা দিয়েও চলে যায়–একে-তিন-তিনে এক–কিন্তু কেমন করে যে একটি যান থেকে তার অন্য যানে রূপান্তর হয়, সেটা অবশ্য সহজে বোঝা যায় না। কেমন করে একটা মোটরগাড়ি জাহাজ হয়ে যায়? তারপর সেটা, আবার, ডুবোজাহাজ? এই চমকপ্রদ যান যেন একটা জিনিশই করতে পারে না–এখনও জানে না

কী করে আকাশপথে উড়ে যেতে হয়। তবে এই তিনটি যান সম্বন্ধে এখন অনেক তথ্যই জানা : কী তাদের আকৃতি, কেমন গড়ন, তাদের চলার পথে না-থাকে গন্ধ না-থাকে বাষ্পজনিত কোনো ধোঁয়া, আর তাদের ঐ সব-হার-মানানো চমকপ্রদ দুর্ধর্ষ গতি–এই সমস্তকিছু জুড়ে দিয়েই এখন তাদের শনাক্ত করা গেছে একই যান বলে। জনসাধারণ পর-পর এত-সমস্ত আশ্চর্যের বাহার দেখে কেমন যেন থম মেরে গিয়েছিলো, এবার এই অভিনব আশ্চর্যটি আবার তাদের কৌতূহল উসকে দিলে।

খবরকাগজগুলো এখন কেবলই এই আশ্চর্য উদ্ভাবনের গুরুত্ব সাতখানা করে ব্যাখ্যান করছে। এই নতুন এনজিন, তা সে একটী যানের মধ্যেই পোরা থাক অথবা তিনটে ভিন্ন-ভিন্ন যানে, অনায়াসেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছে তার কেরামতি। তাক লাগিয়ে দেবার মতোই ক্ষমতা ধরে এই এনজিন। যে-কোনো দামে, যে-করেই-হোক, যেন তেনপ্রকারেণ কিনে নিতে হবে একে দখল করে নিতে হবে। সারা জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উচিত এক্ষুনি এই এনজিনটা কিনে নেয়া। সন্দেহ নেই, ইওরোপের হাষড়া শক্তিগুলোও যে-কোনো-প্রকারে এই যন্ত্রটাকে হাতিয়ে নিতে চাইবে- সামরিক শক্তির কথা বিবেচনা করলে এই যন্ত্রের দারুণ সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করবে কে? জলে-ডাঙায় কী প্রচণ্ড শক্তি পাবে, যদি কোনো রাষ্ট্র এই এনজিনটা কিনে নিতে পারে। এর গুণপনাই বা কী, সীমাবদ্ধতাই বা কী–এ-সব জানা না-গেলে এর বিধ্বংসী ক্ষমতা অবশ্য পুরোপুরি আঁচ করা যাবে না। এর গুপ্তরহস্যটা যদি জানা যায়, তবে কুবেরের ভাণ্ডারও উজাড় করে দেয়া যায়: আমেরিকা তার কোটি-কোটি ডলার এর চেয়ে ভালো আর-কীসের জন্যে খরচ করতে পারতো?

কিন্তু যন্ত্রটা কিনে নিতে হলে যে তার উদ্ভাবকের সন্ধান পাওয়া চাই। আর সেটাই তো দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। খামকাই লেক কিরডালের জল তোলপাড় করে এই কিনার থেকে সেই কিনার অব্দি খোঁজা হলো। এমনকী সবখানে জলের গভীরতাও তন্নতন্ন করে মেপে দেখা হলো। উঁহু, উদ্ভাবকের কোনো খোঁজ নেই–সে তার যন্ত্রটা নিয়ে বেমালুম যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে। তবে কি ধরে নিতে হবে ডুবোজাহাজটা আর ঐ জলে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই? কিন্তু তা যদি হয়, তবে এই ডুবোজাহাজ এখান থেকে চলে গেলে কী করে? আর সেই কথা যদি ওঠে, তবে এই ধাঁধাটারই বা উত্তর কী-যন্ত্রটা এখানে আগে এসেছিলোই বা কেমন করে? দুর্বোধ রহস্য, দুর্ভেদ্য!

ডুবোজাহাজের কথা আর-কোথাও শোনা যায়নি, না লেক কিরলে, না-বা অন্য কোথাও। ডাঙার রাস্তা থেকে যেমন একদিন উধাও হয়ে গিয়েছিলো স্বতশ্চল শকট, আমেরিকার জল থেকে যেমন একদিন উধাও হয়ে গিয়েছিলো ঐ অলৌকিক জলযান, ঠিক তেমনিভাবেই এই দুর্ধর্ষ ডুবোজাহাজ এখন লেক কিরডালের জল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। মিস্টার ওয়ার্ডের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করবার সময়ে আমরা বারে বারে এই প্রসঙ্গটায় ফিরে গেছি। আমাদের চরেরা হাজার চোখকান দিয়ে সবখানে কড়া নজর রেখেছে–অন্য দেশেরও চর নিশ্চয়ই আছে এমন কিন্তু তার চিহ্নমাত্রও যেন কোথাও নেই।

সাতাশে জুনের সকালবেলায় মিস্টার ওয়ার্ডের ঘরে আমার তলব হলো।

শোনা, স্ট্রক, কোনো ভনিতা না-করেই ঘরে পা দেবামাত্র মিস্টার ওয়ার্ড আমায় বলেছেন, এতদিনে তোমার কাছে শোধ নেবার একটা চমৎকার সুযোগ এসেছে।

গ্রেট আইরির ব্যর্থতার শোধ?

নিশ্চয়ই।

কী সুযোগ? উনি কি ঠাট্টা করছেন, না সীরিয়াসভাবে বলছেন? কোন সুযোগ?

বা রে, এই-তো, মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, সুবর্ণসুযোগ! এই একে-তিন-তিনে এক যানটার বাহাদুর বৈজ্ঞানিকটিকে তুমি খুঁজে বার করতে চাও না?

চাই, মিস্টার ওয়ার্ড। আমাকে শুধু একবার ব্যাপারটার দায়িত্ব দিয়ে দেখুন, আমি একেবারে অসাধ্যসাধন করে ফেলবোসফল হতে গেলে যা-যা করতে হবে তা-ই করবো। আমি জানি, কাজটা খুব-একটা সহজ হবে না।

কঠিন কাজ, স্ট্রক, কঠিন কাজ। হয়তো গ্রেট আইরির পাষাণ ভেদ করে ভেতরে যাবার চেষ্টা করার চাইতেও কঠিন।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম, আমার ব্যর্থতার কথা তুলে মিস্টার ওয়ার্ড আমায় তাতিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এটা আমি জানতুম যে আমার প্রতি তার অগাধ আস্থা না-থাকলে গ্রেট আইরির কথা তিনি এখন তুলতেন না। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে জেদ জাগিয়ে দেবার জন্যেই কথাটা তিনি তুলেছেন। আমাকে তিনি ভালোই জানেন; এটাও জানেন যে আগের বারের হার মানার শোধ তোলবার জন্যে আমি মরীয়া হয়ে উঠবো। আমি শুধু চুপচাপ বসে তার নির্দেশেরই অপেক্ষা করেছি।

মিস্টার ওয়ার্ড ঠাট্টা ছেড়ে দিয়ে এবার সীরিয়াসভাবেই বলেছেন : আমি জানি, স্ট্রক, যে তুমি মানুষের সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তার সবটাই করেছিলে; কোনো গাফিলতির দোষ অন্তত তোমার ঘাড়ে চাপানো যায় না। কিন্তু এখন আমরা যে-রহস্যটার মাথামুণ্ডু বুঝতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছি, গ্রেট আইরির রহস্যের চাইতে তা একেবারেই অন্যরকম। যেদিন সরকার চাইবেন যে গ্রেট আইরির পাথর উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে কী আছে দেখবেন সেইদিনই সরকার সেটা করতে পারবেন। আমাদের শুধু কয়েক হাজার ডলার ওড়াতে হবে–আর অমনি–চিচিং ফাঁক–রাস্তাটা খুলে যাবে।

আমি অন্তত সেটাই করতে বলবো।

কিন্তু এখন, মিস্টার ওয়ার্ড মাথা নেড়ে বলেছেন, আমাদের কাছে আরো-জরুরি হলে এই অদ্ভুতকর্মা বৈজ্ঞানিকটিকে হাতে পাওয়া–সে যেন ঈল মাছের মতো বারে বারে তমাদের হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ-কাজটা একজন গোয়েন্দার–সত্যি-বলতে, একজন ধুরন্ধর গোয়েন্দার কাজ।

তার আর-কোনো নতুন খবর পাওয়া যায়নি?

না। আর যদিও এ-কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে সে ছিলো এবং এখনও আছে-হা, লেক কিরডালেরই জলের তলায় –অথচ তবু কোথাও তার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। মাঝে-মাঝে মনে হয় লোকটার বুঝি জাদুগরদের মতো নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলবার ক্ষমতা আছে–এই যন্ত্রবিদদের প্রোটেউস বোধহয় মায়াবী। কেউ!

আমার তো মনে হয়, আমি তখন বলেছি, সে স্বেচ্ছায় দেখা না-দিলে কেউ তাকে কোনোদিন চোখেও দেখতে পাবে না।

তুমি ঠিক কথাই বলেছো, স্ট্রক। আর আমার মনে হয় তার সঙ্গে বুদ্ধির প্যাঁচ কষার চাইতে বরং অন্য-একটাই রাস্তা আছে আমাদের : তার আবিষ্কারের জন্যে এমন বিপুল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা যে সে তখনই আর তার উদ্ভাবন নিয়ে এসে হাজির হবে।

মিস্টার ওয়ার্ড ভুল বলেননি। সরকার সত্যি এরই মধ্যে এই যুগন্ধর বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, তাকে যুগন্ধর বলে অন্যায়ও কিছু করেননি সরকার, কারণ, সত্যি-তো, আর কাকেই বা এই খেতাব মানাতো? খবরকাগজগুলো ফলাও করে এই খবর ছাপিয়েছে এবং এই অসাধারণ মানুষটি নিশ্চয়ই এতটা হাঁদা নন যে তিনি জানেন না সরকার তার কাছ থেকে কী চান–এবং তাও আবার তিনি যে-শর্ত আরোপ করতে চান, সেই শর্তেই।

সত্যি-বলতে, মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, এই আবিষ্কার তার নিজের আর-কোন ব্যক্তিগত কাজে লাগবে যে তাকে সবকিছু আমাদের কাছ থেকে চেপে রাখতে হবে? কেন-যে তাকে আবিষ্কারটা বিক্রি করতে হবে, তার পেছনে হাজারটা কারণ আছে। প্রশ্ন হচ্ছে : এই অজ্ঞাতকুলশীল মহাশয়টি কি এর মধ্যেই দুর্বত্তগিরিতে এতটাই হাত পাকিয়েছেন যে তার অদ্ভুতকর্মা যন্ত্রের সাহায্যে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চিরকাল আড়ালে-আড়ালেই থাকতে চান? তিনি কি ভেবেছেন যে সকলের হাত এড়িয়ে তিনি পার পাবেন?

মিস্টার ওয়ার্ড তারপর বিশদ করে বলেছেন এই আবিষ্কর্তাকে আবিষ্কার করার জন্যে কী-কী সব অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। এমনও হতে পারে যে বেপরোয়াভাবে কোনো দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক কাজে যন্ত্রটা চালাতে গিয়ে সে তার যন্ত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে, তবে ঐ ভেঙে-পড়া যন্ত্রটাও যন্ত্রজগতে অন্যদের কাছে মহামূল্যবান ও শিক্ষণীয় বলে গণ্য হবে। কিন্তু স্কুনার মার্কেল-এর সঙ্গে লেক কিরড়ালে আচমকা ধাক্কা লাগার পর থেকে, তার সম্বন্ধে কোনো খবরই এ-যাবৎ পুলিশের কাছে এসে পৌঁছোয়নি।

এই কথা বলবার সময় মিস্টার ওয়ার্ড কিছুতেই তার হতাশা ও উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি। হ্যাঁ,উজেগও, কারণ জনসাধারণকে বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বটা ক্রমেই তার কাছে খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। কেমন করে আমরা দুবৃত্তদের গ্রেফতার করবো, যদি তারা এমন বিদ্যুদ্বেগে জলে বা ডাঙায় পালিয়ে যেতে পারে? কেমন করেই বা সমুদ্রের তলায় গিয়ে আমরা তার পেছন নেব? আর যখন বেলুনবিদ্যাও চূড়ান্ত উন্নতি করে বসবে, তখন আমাদের কিনা আকাশেও দুবৃত্তদের পেছনে ধাওয়া করতে হবে! আমি ভাবছিলুম কালক্রমে আমি এবং আমার সহকর্মীরা একান্তই অসহায় হয়ে পড়বে কি না! যদি পুলিশবিভাগ সমাজের কোনো কাজেই না লাগবে, সমাজ তবে এত টাকা খরচ করে খামকা তাকে পুষবে কেন?

এটা ভাবতেই আমার হঠাৎ সেই-পাওয়া হুমকিটার কথা মনে পড়ে গেলো– টিটকিরির সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে আমাকে আবার বেশ করে শাসানো হয়েছে। এও মনে পড়ে গেলো, তখন তারা সর্বক্ষণ আমরা ওপর নজর রাখছিলো। মিস্টার ওয়ার্ডকে কি সব কথা এখন খুলে বলবো? কিন্তু এখন হাতে যে-সমস্যাটা এসে পড়েছে, যা নিয়ে আমরা সবাই চোখে

সর্ষেফুল দেখছি, তার সঙ্গে তো এদের কোনো সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। গ্রেট আইরির রহস্যটা সরকার তো আপাতত শিকেয় তুলে রেখেছে।–যেহেতু এখন আর কোনো অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা আগের মতো ভয় দেখাচ্ছে না। এখন বরং সরকার আমাকে নতুন একটা তদন্তে লাগাতে চাচ্ছে। তাহলে পরেই না হয় একদিন মিস্টার ওয়ার্ডকে এই চিঠির কথা খুলে বলবো-তখন হয়তো এই বিদঘুঁটে ঠাট্টাটাকে আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো লাগবে না।

মিস্টার ওয়ার্ড তখনও বলে চলেছেন : আমরা ঠিক করেছি যে-করেই হোক এই আবিষ্কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবো। সত্যি-যে সে এখন উধাও হয়ে গিয়েছে; কিন্তু সে যে-কোনো মুহূর্তে এই মস্ত দেশটার যে-কোনো অংশে ফের এসে উদয় হতে পারে। আমি ঠিক করেছি সে আবার আবির্ভূত হবামাত্র তুমি তার পেছন নেবে। যে কোনো মুহূর্তে ওয়াশিংটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে হবে। ককখনো তোমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ো না।–শুধু দিনে একবার করে এই দফতরে এসে হাজিরা দিয়ে যাবে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় টেলিফোন করে আমায় জানাবে, আর এখানে এসেই সটান আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে।

আপনি যা বলবেন, তা-ই হবে। আমি উত্তর দিয়েছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? আমাকে কি একাই কাজ করতে হবে, না সঙ্গে আর-কেউ–

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বড়োকর্তা বলেছেন : আমি চাই যে তুমি নিজেই এখান থেকে দুজন লোক বেছে নাও-যাদের তোমার মনে ধরে তাদের

ঠিক আছে। তা-ই হবে। তবে, ধরুন, কখনও যদি এই আবিষ্কর্তার মুখোমুখি পড়ি, তখন আমি তাকে নিয়ে কী করবো?

আর যা-ই করো, ককখনো তাকে চোখের আড়াল কোরো না। আর-কোনো উপায় যদি না-থাকে, তবে তাকে গ্রেফতার কোরো। তোমার সঙ্গে সবসময় একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকবে।

সে না-হয় হলো। কিন্তু সে যদি তার যানে লাফিয়ে ওঠে, আর অমন তীরের মতো তার যান ছোঁটায়, তাহলে তাকে আমি থামাবো কী করে? ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগে যে তার যান চালাতে পারে, তার সঙ্গে তর্ক করার সময় কোথায় পাবো?

সে যাতে দুশো মাইল বেগে তার যান ছোটাতে না পারে, তোমাকে তারই চেষ্টা করতে হবে, স্ট্রক। আর তাকে গ্রেফতার করেই আমাকে টেলিগ্রাম কোরো। তারপর থেকে পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব আমার কাঁধে থাকবে।

যতই দুঃসাধ্য হোক, আপনি আমার ভরসা করতে পারেন, মিস্টার ওয়ার্ড দিনে রাতে, যে-কোনো সময় রওনা হবার জন্যে আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে তৈরি থাকবো। মামলাটার ভার আমাকে দেবার জন্যে আবারও আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি যদি এর কোনো সুরাহা করতে পারি, তবে সে-যে কী গৌরবের এবং লাভের ব্যাপার হবে, তা বুঝিয়ে বলা যাবে না, এই তো? এই বলে আমার রডোকর্তা সেদিনকার মতো আলোচনার ইতি টেনেছেন।

বাড়ি ফিরে এসে আমি যাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিলুম কবে, কোথায়, কখন, কতদিনের জন্যে বেরুবো, কিছুই জানা নেই। আমার তোড়জোড় দেখে আমার বুড়ি দাসী ভাবছিলো আমি বুঝি ফের গ্রেট আইরিতে যাবার উদযোগ করছি-সে-জায়গাটা তো অর কাছে জাহান্নামের খাশমহাল বৈ আর কিছু নয়। মুখে কিছু বললো না বটে, কিন্তু এমনভাবে নিজের কাজ করতে লাগলো যে আমি যেন এর মধ্যেই খোদ বীলজেবারের কবলে পড়েছি। জানি যে সে কখ গুপ্তকথা ফাঁস করবে না, তবু আমি আসল কথা কিছুই বলিনি। এই দুরূহ কাজে কাউকেই কিছু খুলে বলা যাবে না।

দফতরের কোন-দুজনে আমার সঙ্গে যাবে, সেটা বেছে নিতে আমার একটু দেরি হয়নি। দুজনেই আমার সঙ্গে আমার বিভাগে কাজ করে, অনেকবার তাঁরা আমার সঙ্গে কাজও করেছে–চটপটে, চেকশ, কর্মঠ, সবসময়েই টগবগ করে ফুটছে, আবার বুদ্ধিও ধরে। এদের একজন ইলিনয়-এর জন হর্ট, বয়েস তিরিশ; অন্য জন, বয়েস বত্রিশ, ম্যাসাচুসেটসের ন্যাব ওয়াকার। এদের চাইতে ভালো সহকর্মীর কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কয়েকদিন কেটে গেলো, কিন্তু কিছুরই কোনো খবর নেই, না সেই গাড়ির, না সেই জাহাজের, না-বা সেই ডুবোজাহাজের। গুজব কিন্তু ছড়াচ্ছিলো হাজার মুখে, কিন্তু পুলিশ জানতো সবই মিথ্যে। আর যে-রকম উদ্দাম বলগাছাড়া কল্পনার পরিচয় দিয়ে খবরকাগজগুলো খবর ছাপতে লাগলো, তাদের কোনোটারই কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিলো না। সত্য নয় জেনেও এই হুজুগে আজগুবি কোনো খবর ছাপবার প্রলোভন অন্তত কোনো কাগজই ছাড়তে রাজি ছিলো না–এই মওকায় যদি কাগজের কাটতি বাড়িয়ে নেয়া যায়, ক্ষতি কী।

তারপর, পর পর দু-বার, প্রতিবেদন এলো, আমাদের এই প্রহরের মহামানবটি নাকি আবার দেখা দিয়েছেন। প্রথমটায় জানা গেলো, তাকে নাকি দেখা গেছে আরকানসাসের রাস্তায়, লিটল রকে। দ্বিতীয়টায় জানা গেলো, তাকে নাকি দেখা গেছে লেক সুপিরিয়রের অথই জলে।

পুলিশের কাছে পাকা খবর এলেও কী হবে–এই দুটি তথ্যকে একেবারেই মেলানো যাচ্ছিলো না। কেননা প্রথমটা তার আবির্ভাবের সময় দিয়েছে ছাব্বিশে জুনের অপরা, আর দ্বিতীয়টার সময় সেই দিনই সন্ধেবেলা। এখন, মার্কিন মুলুকের এই দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব কম করেও তো না-হোক কোন-না আটশো মাইল হবে। যদি ধরেও নেয়া যায়, যে এ-যাবৎ যত স্বতশ্চল শকট দেখা গেছে তার তুলনায় এই অভূতপূর্ব যন্ত্রের গতি প্রায় অচিন্ত্যনীয়ই, কিন্তু মধ্যবর্তী অঞ্চলটা সে কারু চোখে না-পড়ে পেরুবে কী করে? কেমন করে সে পর-পর পেরিয়ে আসবে আরকানসাস, মিসুরি, আইওয়া, উইসকনসিন, এ-কিনার থেকে ও-কিনার, অথচ আমাদের চরেরা তার কোনো আঁচই পেলে না, কেউই ছুটে গেলো না সবচেয়ে কাছের টেলিফোনে?

এই দুই আশ্চর্য আবির্ভাবের পর, যদি অবশ্য তাদের আবির্ভাব বলা যায়, যন্ত্রটি আবার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। খবর যখন এসে পৌঁছেছিলো, তখন আর ও দুই জায়গার কোনোটাতেই যাবার কোনো মানে হতো না–মিস্টার ওয়ার্ড অন্তত আমাদের কাউকেই ও-সব জায়গায় পাঠাতে চাননি। অথচ এই অদ্ভুতকর্মা যন্ত্রটি যেহেতু এখনও ধ্বংস হয়ে যায়নি, কিছু-একটা তো করা উচিত। মার্কিন মুলুকের সব খবরকাগজেই তেসরা জুলাই নিচের এই সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি বেরুলো, তার বয়ানটা রীতিমতো গুরুগম্ভীর।

বর্তমান বৎসরের বিগত এপ্রিল মাসে একটি স্বতশ্চল শকট পেনসিলভ্যানিয়া, কেনটাকি, ওহায়ো, টেনোসি, মিসুরি এবং ইলিনয় প্রদেশের বিভিন্ন রাস্তায় চলাফেরা করিয়াছিল; এবং, সাতাশে মে তারিখে, আমেরিকান অটোমোবাইল ক্লাব যে মোটররেসের আয়োজন করিয়াছিল, তাহাতে সে উইসকনসিনের পুরা রাস্তাটাই অতিক্রম করিয়াছিল। অতঃপর সে অদৃশ্য হইয়া যায়।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি জলযান অত্যন্ত দ্রুতবেগে নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূলে, কেপ কড হইতে কেপ সেবল-এর মধ্যে, বিশেষত বস্টনের নিকট, সমুদ্রের জল তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া যায়। তাহাঁর পর অকস্মাৎ এই জলযানটিও বেমালুম হাওয়ায় উবিয়া যায়।

সেই একই মাসের দ্বিতীয় ভাগে, একটি ডুবোজাহাজ ক্যানসাস রাজ্যের লেক রিলের জলের তলায় চলাফেরা করিয়াছিল। পরে সেও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

সমস্তকিছু লক্ষ করিয়া ইহাই বিশ্বাস হয় যে একই আবিষ্কর্তা নিশ্চয়ই এই তিনটি যন্ত্রের নির্মাতা; অথবা তিনটি নহে, উহারা সকলে মিলিয়া সম্ভবত একটিই যন্ত্র, জলেস্থলে সর্বত্রই যাহার অবাধ গতিবিধি।

ঐ যন্ত্রটি অধিকার করিবার জন্য উক্ত আবিষ্কর্তার নিকটতা তিনি যে-ই হোন না কেন–তাই একটি প্রস্তাব করা হইতেছে।

তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তিনি যেন সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং বিজ্ঞাপিত করেন যে কী-কী শর্তে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সহিত কাজকারবার করিবেন। তাহাকে এই অনুরোধও করা হইতেছে যে তিনি যেন যথাসত্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি. সি.-স্থিত আন্তঃরাজ্য পুলিশ দফতরের সহিত অনুগ্রহ করিয়া যোগাযোগ করেন।

বড়ো-বড়ো হরফে, মার্কিন মুলুকের সব খবরকাগজেরই প্রথম পাতায় এই বিজ্ঞপ্তিটি বেরিয়েছিলো। যার প্রতি এটা উদ্দিষ্ট, সে যে-ই হোক না কেন, তার চোখে এটা না পড়েই পারবে না। সে নিশ্চয়ই এটা পড়বে। সেই একইভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়েও সে তার উত্তরটা জানাতে পারে। আর এ-রকম একটা প্রস্তাব সে উপেক্ষাই বা করবে। কেন–ডলারের অঙ্ক যেখানে যা-খুশি তা-ই হতে পারে! আমাদের শুধু তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে জনসাধারণের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি কীরকম কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছিলো। পুলিশের দফতরের সামনে, সকাল থেকে গভীর রাত অব্দি, এক উৎসুক ও মুখর জনতা ঠেলাঠেলি করছিলো–অপেক্ষা করছিলো কখন এই আবিষ্কর্তার কাছ থেকে কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাম আসে–সে হয়তো সরাসরি ফেডারেল পুলিশেরই সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সেরা প্রতিবেদকরা নিঘুম, ক্লান্তিহীন, দাঁড়িয়েছিলো সেখানে। যে-এই তুলকালাম খবরটা প্রথম ছাপাতে পারবে, সেই সংবাদদাতা কিংবা সেই খবরকাগজ যে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে তা-ই নয়, বিস্তর মুনাফাও লুঠে নিতে পারবে! যে-অজ্ঞাতকে অ্যাদ্দিনের চেষ্টাতেও কোথাও অবিষ্কার করা যায়নি, তার নাম ও হালহকীকৎ বাৎলানো যাবে তবে শেষকালে! আর এও জানা যাবে।

সরকারের সঙ্গে সে কোনো দরকষাকষিতে রাজি হবে কি না! এটা বোধহয় না-বললেও চলে আমেরিকা সবকিছুই দারুণ কেতায় করে থাকে। কোটি-কোটি ডলার পেতে পারে এই উদ্ভাবক। যদি দরকার হয়, দেশের সব ক্রোড়পতিই তাদের কোষাগার উন্মুক্ত করে দেবে!

একটা দিন কেটে গেলো! উত্তেজিত ও অধীর জনতার কাছে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিলো যে দিনটার মধ্যে যেন চব্বিশ ঘণ্টার চাইতেও বেশি সময় আছে। আর একেকটা ঘণ্টায় যেন আছে যাট মিনিটের চাইতেও অনেক-বেশি মিনিট। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া নেই-না কোনো চিঠি, না-বা কোনো টেলিগ্রাম! রাতটাও কেটে গেলো। তবু কোনো খবর নেই। আর এইভাবেই নিরুত্তর কেটে গেলো পরের দিন–এবং তারও পরের দিন।

অন্য-একটা ফল হলো বটে এই বিজ্ঞপ্তির-এবং সেটা আগেভাগেই অনুমান করা গিয়েছিলো। কেবলের পর কে গেলো ইওরেপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবিষ্কর্তার কাছে কী প্রস্তাব করেছে সেটা মুহূর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এই আশ্চর্য উদ্ভাবনটিকে হাতে পাবার আশা ইওরোপেরও বড়ো-বড়ো দেশগুলো করেছিলো। এমন প্রচণ্ড একটা ক্ষমতা হাতে পাবার জন্যে তারাই বা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না কেন? তারাই বা কেন? তাদের কোষাগার উন্মুক্ত করে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে না?

সমস্ত বড়ো-বড়ো দেশই ধুমধাম করে ঢাকঢোল পিটিয়ে আসরে নেমে পড়লো–ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুশদেশ, ইতালি, অস্ট্রিয়া, আলেমানদেশ। শুধু অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোই এই চমকপ্রদ নিলেমের আসরে নামেনি–তাদের অত টাকা কোথায় যে খামকা চেষ্টা করবে? ইওরোপের খবরকাগজগুলোও মার্কিন সরকারের বিজ্ঞপ্তিটির অনুসরণ করে

বিজ্ঞপ্তি ছাপালে। এই রহস্যময় শোাফেয়ারকে শুধু একটা মুখের কথা খসাতে হবে-অমনি সে হয়ে উঠবে ফাডেরবিল্ট, অ্যাস্টর, গুল্ড, মরগ্যান বা রথচাইল্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ধনকুবের।

কিন্তু তাতেও যখন এই রহস্যময় আবিষ্কর্তার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না, তখন অবাক হয়ে সবাই ভাবতে বসলো সে-কোন চমকপ্রদ প্রস্তাব করলে সমস্ত গোপনীয়তা ঝেড়ে ফেলে সে আত্মপ্রকাশ করবে? সারা জগৎটাই যেন এক মস্ত নিলেমের আসর হয়ে উঠেছে–এমন-এক নিলোম যেখানে চোখ-কপালে-তোলা সমস্ত দাম হাঁকা হচ্ছে। দিনে দু-বার করে খবরকাগজগুলো কোটি-কোটি টাকা যোগ করে চলেছে–আর যেন প্রতিবারই তা লাফিয়ে-লাফিয়ে প্রায় আকাশে উঠে যেতে চাচ্ছে। এই দর-হাঁকাহাঁকির শেষ এলো, যখন মার্কিন কংগ্রেস বিস্তর তর্কাতর্কির পর, ভোটে ঠিক করলে যে দুশো কোটি ডলার দেয়া হবে এই আবিষ্কর্তাকে। আর এই আশ্চর্য যানটির ওপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো যে দেশের কোনো নাগরিকই এই প্রস্তাবে কোনো আপত্তিই তোলেনি। আমি? আমি আমার বুড়ি দাসীকে বলেছিলুম :যন্ত্রটা কিন্তু এর চেয়েও অনেক দামি?

জগতের অন্যান্য দেশ কিন্তু আমার মতো ভাবেনি, তাদের প্রস্তাব দুশো কোটি ডলারের ধারে-কাছেও ছিলো না। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই রেষারেষি কতটাই যে অর্থহীন ছিলো! এই আবিষ্কর্তা যেন জম্মায়ইনি কোনোদিন! সবটাই যেন মার্কিন খবরকাগজগুলোর মস্ত এক ধাপ্পা! সেটাই, অন্তত শেষকালে, দাঁড়ালো ইওরোপের সব খবরকাগজের বিঘঘাষিত অভিমত।

এদিকে দিনের পর দিন কিন্তু কেটেই চলেছে। এই আবিষ্কর্তার আর-কোনো খবরই নেই কোনোখানে, তার কাছ থেকে টু শব্দটি অব্দি নেই! আর-কোথাও তার এই আশ্চর্য শকট সকলকে বোমকে দিয়ে দেখা দেয়নি। আমি তো কী-যে ভাববো কিছুই বুঝতে পারছিলুম না–এই আশ্চর্য রহস্যের কোনোদিন যে কোনো মীমাংসা হবে, সেই আশাই আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম।

তারপরে, হঠাৎ, পনেরোই জুলাই, ফেডারেল পুলিশভবনের ডাকবাক্সে কোননা পোস্টমার্ক ছাড়াই একটা চিঠি পাওয়া গেলো। কর্তৃপক্ষ গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা খুঁটিয়ে দেখে, ওয়াশিংটনের খবরকাগজগুলোর কাছে চিঠিটা তুলে দিলেন–আর অমনি, বিশেষ সংখ্যা বেরিয়ে গেলো কাগজগুলোর–চিঠির বয়ান একছত্রও এদিক-ওদিক না করে বেরিয়ে গেলো জোর খবর! জোর খবর! হিশেবে :

.

৯. চিঠি নম্বর দুই

দুর্বারগতি বিভীষিকা থেকে
জুলাই ১৫

পুরোনো ও নতুন জগৎ–দুজনকেই :

ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার যে-সব প্রস্তাব করেছে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অবশেষে যে-দর হেঁকেছে, তাতে এই কথা কটি ছাড়া আর-কিছু জানাবার নেই :

আমার আবিষ্কারের জন্যে যে-খোলামকুচি দর হাঁকা হয়েছে, তাকে আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।

আমার যান ফরাশিও হবে না, আলেমানও হবে না, অস্ট্রিয়া তাকে হাতাতে পারবে না, রুশদেশের জারও নন-এই যান না-হবে ব্রিটিশ, না-বা মার্কিন।

এই আবিষ্কার শুধু আমার নিজেরই থাকবে, এবং আমি তাকে আমার যেমন-খুশি তেমনিভাবেই ব্যবহার করবো।

এটা দিয়ে, আমি সারা জগতের ওপর প্রভুত্ব করবোগোটা মানবজাতির এক্তিয়ারে এমন-কোনো উপায় বা ক্ষমতা নেই যা দিয়ে আমাকে ঠেকাতে পারবে, বা প্রতিরোধ করতে পারবে। কোনো অবস্থাতেই কারু পক্ষেই আমাকে ঠেকানো সম্ভব হবে না।

এটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি : কেউ যেন কখনও আমাকে পাকড়াবার বা থামাবার চেষ্টা না-করে। সেটা হবে অসম্ভব চেষ্টা-সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেউ যদি আমাকে কোনো আঘাত হানতে চায়, তবে সে আঘাত আমি প্রত্যাঘাত হেনে একশোগুণ ফিরিয়ে দেবো।

আমাকে যে-নগণ্য টাকা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, তা আমি ঘৃণা করি। আমার সে-টাকায় কোনো দরকার নেই। তাছাড়া, যেদিন আমার কোটি-কোটি ডলার কামাবার ইচ্ছে হবে, সেদিন আমি শুধু আমার হাত বাড়িয়ে তা টুপ করে তুলে নেবো।

পুরোনো এবং নতুন জগৎ, দুইই জেনে রাখুক : তারা আমার বিরুদ্ধে কিছুই করবে পারবে না, কিন্তু আমি-আমার যা-ইচ্ছে হবে তা-ই ইওরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে করতে পারবো।

সেইজন্যেই আমি এই চিঠিতে এই বলে স্বাক্ষর করছি

দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড
নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু

.

১০. আইনকানুনের পরপারে

মার্কিন সরকারের উদ্দেশে লেখা এইরকম একটা চিঠি! কে-যে খোদ পুলিশের দফতরে এসে এই চিঠিটা ডাকবাক্সে রেখে গিয়েছে, কেউ তাকে দ্যাখেনি।

আমাদের দফতরের বাইরেকার সাইডওয়াক সম্ভবত সারা রাত্তিরে একবারও ফাঁকা থাকেনি। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, সবসময়েই সেখানে লোকজন ছিলো, শশব্যস্ত, উদ্বিগ্ন অথবা নিছকই কৌতূহলী। সত্যি-যে, তখনও পত্রবাহক হয়তো অনায়াসেই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারতো, ডাকবাক্সে সরাসরি এসে ফেলে দিতে পারতো এই চিঠি। রাত্তিরটা অবশ্য ছিলো ঘুটঘুঁটে অন্ধকার, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে হয়তো কিছুতেই নজর পৌঁছুতো না।

এই চিঠিটার হুবহু প্রতিলিপিই বেরিয়েছিলো সব কাগজে-সরকার সরাসরি সেসব কাগজে এর বয়ানটা পাঠিয়ে দিয়েছিলো। চিঠিটা পড়ে জনসাধারণের প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বভাবত এটাই হতো যে এ নিশ্চয়ই কোনো ভাড়ের কীর্তি-বিদূষকের বদ-রসিকতা। পাঁচ হপ্তা আগে গ্রেট আইরি থেকে আমার কাছে যে-চিঠিটা এসেছিলো, তাকে আমি এইভাবেই গ্রহণ করেছিলুম।

কিন্তু এই চিঠিটা সম্বন্ধে সাধারণের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সে-রকম হয়নি, ওয়াশিংটনে তো নয়ই, দেশের অন্যত্রও নয়। যদি জনাকয়েক মাতব্বর মুচকি হেসে বলবার চেষ্টা করতো যে এ-চিঠিটাকে পাত্তা দেবার কোনো মানেই হয় না, বেশির ভাগ লোকই কিন্তু তার উত্তরে বলতো, এ-চিঠিটার বয়ান বা ভঙ্গি কোনোটাই কোনো ফাজিল ফিচেল ফুর্তিবাজ লোকের নয়। শুধু-একজনই এ-চিঠি লিখতে পারতো, এবং সে-হলো ঐ আশ্চর্য যন্ত্রটির আবিষ্কতা।

লোকের কাছে কেন-যে এ-কথা তর্কাতীত বলে মনে হতো, কী-রকম মানসিক অবস্থায় পড়লে লোকে এ-সব মেনে নিতো, তা কিন্তু সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এতদিন ধরে যতসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, যার চাবিটা অ্যাদ্দিন পাওয়া যায়নি, এই চিঠিটা অবশেষে সে-সব ধাঁধারই সমাধান করে দিয়েছে। লোকে যা ভাবছিলো তা এই : আবিষ্কর্তা এতদিন যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলো, তা শুধু একদিন অভিনব উপায়ে নিজেকে জাহির করে সকলকে বোমকে দেবার জন্যেই। কোনো দুর্ঘটনায় অপঘাতে মৃত্যু হওয়ার বদলে এতদিন সে এমন-একটি গোপন আড্ডায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলো, পুলিশ যার নামগন্ধও জানতে পারেনি। তারপর জগতের সব সরকার সম্বন্ধেই তার মনোভাব কী, সেটা জোরগলায় জানাবার জন্যেই অবশেষে সে এই চিঠি লিখেছে। কিন্তু কোনো

বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ-কোনো ডাকঘরে গিয়ে চিঠিটা ডাকে দেবার বদলে–কেননা তাহলে হয়তো সেই সূত্র ধরে কখনও তার নাগাল পাওয়া যেতে–সে সরাসরি ওয়াশিংটনে এসে সকলের নাকের ডগা দিয়ে পুলিশের সদর দফতরে এসে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে গিয়েছে।

যদি এই আশ্চর্য মানুষটি ভেবে থাকে যে তার অস্তিত্ব জানান দেবার এই নতুন পদ্ধতি সারা জগতে হুলুস্থুল ফেলে দেবে, তবে সে মোটেই ভুল ভাবেনি। সেদিন, সারা জগতে অগুনতি লোক চোখ রগড়ে বারেবারে চিঠিটা পড়ে মুখস্থ করে ফেলেও যেন। নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

আমি নিজে বারেবারে খুঁটিয়ে পড়েছি এই দম্ভ, এই স্পর্ধার ঘোষণা, তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি প্রকাশভঙ্গি। হাতের লেখা বড়ো-বড়ো, মিশমিশে কালো কালিতে কলমের। বড়ো-বড়ো টান দিয়ে লেখা শব্দগুলো। কোনো হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ হয়তো এই বড়ো বড়ো রেখার টান দেখেই চিনে নিতে পারতো তার মেজাজি ও দেমাকি হাবভাব-জেনে নিতে পারতো এর মধ্যে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার দম্ভ আর অসামাজিক মনোভাব। যেহেতু চিঠিটার ফ্যাকসিমিলি বেরিয়েছিলো কাগজে তাই আমার অন্তত এই চিহ্নগুলো খুঁজে পেতে খুব দেরি হয়নি। হঠাৎ আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ ফুটে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এলো–ভাগ্যিশ আমার বুড়ি দাসী আমার সে-চীৎকার শুনতে পায়নি। কেন আমি এতক্ষণ মরগ্যানটন থেকে ডাকে-ফেলা আমার ঐ আগের চিঠিটার সঙ্গে এই চিঠির আশ্চর্য মিলটাকে লক্ষ করিনি? তাছাড়া, আরো-একটা জিনিশও তো খেয়াল করার ছিলো। আমার চিঠিটায় কারু নাম ছিলো না–শুধু লেখা ছিলো মা, অ, ও,, যার সঙ্গে দ্য

মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর আদ্যক্ষরগুলো খাপে খাপে মিলে যায়। এ নিশ্চয়ই নেহাৎই কাকতাল নয়!

আর এই দ্বিতীয় চিঠিটা কোত্থেকে এসেছে?দুর্বারগতি বিভীষিকা থেকে। নিশ্চয়ই এই একে-তিন-তিনে-এক যানটারই নাম বিভীষিকা। বিভীষিকার রহস্যময় কাপ্তেনের স্বনির্বাচিত খেতাবই তাহলে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড, নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু! আমার চিঠিতে যে-আদ্যক্ষরগুলো ছিলো তা তাহলে তারই নামের মোহর-আর খোদ এই দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ডই আমাকে শাসিয়েছে যে ফের যদি আমি গ্রেট আইরিতে অভিযান চালাই তবে সে আমাকে দেখে নেবে।

আমি উঠে গিয়ে আমার ডেস্কের দেরাজ থেকে তেরোই জুনের চিঠিটা বার করে নিয়ে এলুম। তার সঙ্গে পাশাপাশি রেখে আমি মিলিয়ে দেখলুম খবরকাগজের এই ফ্যাকসিমিলি। না, কোনো সন্দেহই আর নেই। দুটো চিঠিই একই হাতে লেখা।

আমার মনের মধ্যে তখন তুলকালাম আলোড়ন চলেছে। এই চমকপ্রদ তথ্যটা থেকে অবরোহী প্রক্রিয়ায় আমি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুতে চেষ্টা করছি : আগের চিঠিটার কথা শুধু আমিই জানি। যে-লোকটা আমার অমন হুমকি দিয়েছে সে-ই দুর্বারগতি বিভীষিকার কাপ্তেন–আর যানের নামটাই বা কী, বিভীষিকা, যথার্থ নামই বটে! এবার তো আর আমরা আবছায়ার মধ্যে নেই, এবার তো আর আমরা বুনো হাঁসের পেছনে ছুটছি না! এবার আমরা আবার তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালাতে পারি। বিভীষিকার সঙ্গে গ্রেট আইরিরসম্বন্ধ কী–সেটা বার করতে পারলেই আমরা এই রহস্যটা ভেদ করতে পারবো।

ব্লু রিজ শৈলশ্রেণীর সেই অদ্ভুত শিখা ও ধ্বনির সঙ্গে কোন অকাট্য সম্বন্ধে জড়ানো এই আশ্চর্য যান–বিভীষিকা?

আমার প্রথম পদক্ষেপ কী হবে, ততক্ষণে তা আমি জেনে গিয়েছি। আমার আগের চিঠিটা পকেটে নিয়ে আমি তক্ষুনি পুলিশের সদর দফতরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম। মিস্টার ওয়ার্ড ভেতরে আছেন কি না জেনে নিয়ে আমি তক্ষুনি তার খাশ কামরার সামনে গিয়ে বেশ জোরেই বোধহয় টোকা দিয়েছিলুম, তারপর তিনি ঢুকতে বলবামাত্র আমি হন্তদন্তভাবেই বুঝি ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

তুমি এমনভাবে আসছে যে মনে হয় তুমি কোনো জরুরি খবর নিয়ে এসেছে, স্ট্রক?

সেটা আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন, এই বলে আমি পকেট থেকে চিঠিটা বার করে তার দিকে এগিয়ে দিয়েছি।

মিস্টার ওয়ার্ড হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়েছেন, তারপর একবার সেটায় চোখ বুলিয়ে,–পড়েই জিগেস করেছেন : এ আবার কী, স্ট্রক?

শুধু নামের আদ্যক্ষর মোহর করে লেখা একটা চিঠি–দেখতেই তো পাচ্ছেন।

আর কোথায় কোন ডাকঘরে এটা পোস্ট করা হয়েছিলো?

মরগ্যানটনে, নর্থ-ক্যারোলাইনায়।

চিঠিটা তুমি কবে পেয়েছো, স্ট্রক?

এক মাস আগে, জুন মাসের তোরো তারিখে।

তখন চিঠিটা পড়ে তুমি কী ভেবেছিলে?

যে এটা কারু নিদারুণ ঠাট্টা।

আর-এখন-স্ট্রক?

আমি যা ভাবছি, আপনিও তা-ই ভাববেন, মিস্টার ওয়ার্ড, যদি চিঠিটা একটু খুঁটিয়ে দ্যাখেন।

মিস্টার ওয়ার্ড তারপরেই আবার চিঠিটার ওপর সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়েছেন। এখানে নামের বদলে তিনটি হরফ দেখছি।

হ্যাঁ, মিস্টার ওয়ার্ড, আর সেই তিনটে হরফ এই ফ্যাকসিমিলির দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ডই বোঝায়।

টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন :ফ্যাকসিমিলি নয়, এই সেই আসল চিঠি।

আমি তাকে উসকে দেবার জন্যেই বলেছি :বোঝা যাচ্ছে দুটো চিঠি একই হাতের লেখা।

তা-ই তো মনে হচ্ছে।

দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, গ্রেট আইরির গুপ্ত কথা যাতে ফাঁস হয়ে না-যায় সেইজন্যে কেমনভাবে আমাকে শাসানো হয়েছে?

হ্যাঁ, তোমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু স্ট্রক, এ-চিঠি তুমি পেয়েছে একমাস আগে। এতদিন তুমি চিঠিটা কেন আমাকে দেখাওনি?

কারণ আগে আমি চিঠিটাকে কোনো গুরুত্বই দিইনি। এখন, দুর্বারগতি বিভীষিকা থেকে চিঠিটা আসার পর একে আর কোনোভাবেই তাচ্ছিল্য করা যায় না।

এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার দ্বিমত নেই। আমার কাছে চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে। এরই সাহায্যে আমি হয়তো এই অদ্ভুত মানুষটার নাগাল পেয়ে যাবো।

আমিও ঠিক সেই আশাই করি, মিস্টার ওয়ার্ড।

শুধু একটাই প্রশ্ন–এই বিভীষিকার সঙ্গে গ্রেট আইরির সম্পর্ক কী থাকতে পারে?

তা আমি জানিনে। আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না–

এর কেবল একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে, আমার কথায় কান না-দিয়েই বুঝি মিস্টার ওয়ার্ড বলেছেন, যদিও সেটা বিশ্বাস করতে আদপেই মন চায় না–মনে হয় অসম্ভব।

আর, সেটা?

যে গ্রেট আইরি ছিলো ঐ আবিষ্কর্তার গোপন কারখানা–সেখানে সে তার সব জিনিশপত্র এনে জড়ো করেছিলো।

সে-যে অসম্ভব? আমি বুঝি চেঁচিয়েই উঠেছি, কী করে সে তার জিনিশপত্র সেখানে নিয়ে যাবে? আর তার ঐ যানটাকেই বা সে ওখান থেকে বার করবে কী করে? আমি ওখানে গিয়ে সরেজমিন যা নিজের চোখে দেখে এসেছি, তাতে আপনার এই অনুমানটাকে আমার অবিশ্বাস্যই শুধু নয়–অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।

যদি-না–

যদি-না, কী? আমি ব্যগ্রস্বরে জানতে চেয়েছি।

যদি-না এই দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর যানটার পাখাও থাকে। শুধু পাখা থাকলেই সে গ্রেট আইরিতে গিয়ে ডেরা বাঁধতে পারে।

যানের নাম বিভীষিকা, সে সমুদ্রের গভীরে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে কি সেই সঙ্গে ঈগল আর করের সঙ্গেও পাল্লা দিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়াবে? আমি বোধহয় অবিশ্বাসভরে আমার কাধ না-ঝাঁকিয়ে পারিনি। অবশ্য মিস্টার ওয়ার্ডও এরপর আর তার অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব অনুমানটি নিয়ে আর-কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। বরং তিনি আবার চিঠি দুটো পাশাপাশি রেখে তাদের তুলনা করেছেন–সবকিছু মিলিয়ে দেখেছেন। শুধু মিলিয়েই দ্যাখেননি, অনুবীক্ষণের তলায় রেখে দুটি চিঠিকেই তিনি তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখেছেন–বিশেষত যেভাবে নাম লিখেছে লেখক, আর শনাক্ত করেছেন যে দুটি চিঠিই একই হাতের কাজ, হুবহু। শুধু-যে এক হাতেরই কাজ তা নয়–যে-কলম দিয়ে চিঠি। দুটো লেখা হয়েছে,

সেটাও একই কলম। তারপর গভীরভাবে কী যেন ভেবে তিনি বলেছেন : তোমার চিঠিটা আমি এখানে রেখে দেবো, স্ট্রক। মনে হয় এই আশ্চর্য নাটকটায় তোমার একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে-হয়তো একটা নয়, দু-দুটো নাটক কোন সূত্র দিয়ে যে নাটকদুটি গাঁথা তা আমার জানা নেই–কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, সূত্র একটা আছেই। প্রথম নাটকটার সঙ্গে তুমি আগেই জড়িয়ে পড়েছিলে–আর দ্বিতীয়টাতেও তুমি যদি মস্ত একটা ভূমিকা নাও, তাহলে আমি মোটেই অবাক হবো না।

আপনি তো জানেনই, মিস্টার ওয়ার্ড, আমার কৌতূহল কেমন–কিছুতেই বাগ মামে না।

জানি, স্ট্রক, জানি। সে-কথা তোমায় আবার মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন, আমি কেবল আমার প্রথম নির্দেশটারই পুনরাবৃত্তি করতে পারি : তৈরি হয়ে থেকো, মুহূর্তের নোটিসে তোমায় ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে।

সেদিন সারাদিন ধরে, এই স্পর্ধিত চিঠি নিয়ে লোকের উত্তেজনা কেবলই তুঙ্গে উঠেছে। হোয়াইট হাউস এবং ক্যাপিটল হিল–দুজায়গাতেই লোকেরা উত্তেজিতভাবে গিয়ে দরবার করেছে : কিছু-একটা করা হোক, এক্ষুনি। কিন্তু কিছু করা কি কোনো সহজ কাজ? কোথায় কেউ দেখা পাবে এই দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর? আর তার গোপন আড্ডাটা যদি খুঁজে বার করা যায়, কেমন করে কেউ তাকে গিয়ে পাকড়াবে? তার ক্ষমতা যে কতটা, তার পরিচয় সে আগেই দিয়েছে-কিন্তু সেটা হয়তো তার সত্যিকার ক্ষমতার তুলনায় কিছুই-না, তার ক্ষমতার সে হয়তো নিছকই আংশিক প্রকাশ। পাথরের ওপর দিয়ে কেমন করে সে নিয়ে গিয়েছিলো তার ডুবোজাহাজ, ঐ লেক কিভালে? আর কীভাবেই বা পরে সে সেখানে থেকে চম্পট দিয়েছে? আর যদি সে সত্যিই লেক

সুপিরিয়রে দেখা দিয়ে থাকে, তবে কীভাবে সে সকলের অগোচরে মাঝখানের জমি পেরিয়ে এসেছিলো?

কী-যে মাথা-খারাপ-করা, সব-ঘুলিয়ে-দেয়া, কাণ্ড! আর সেইজন্যেই চট করে এই রহস্যের একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। দুশো কোটি ডলারে যখন তার মন ওঠেনি, তখন এবার তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে দেখা উচিত। আবিষ্কর্তা বা তার আবিষ্কার –কিছুই নাকি কেনা যাবে না! আর কী দম্ভ, কী স্পর্ধার সঙ্গেই সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে! তাহলে তা-ই হোক! এই উপেক্ষার ফলে তাকে গণশত্রু বলে গণ্য করা হোক, ঘোষণা করা হোক যে সে সমস্ত সমাজেরই শত্রু–আর এমন দুশমনের বিরুদ্ধে সমস্ত কিছুই প্রয়োগ করা যায়, সেখানে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছুই আর থাকে না, অন্যদের কোনো সমূহ ক্ষতি করবার আগেই তার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে! মাঝখানে যে লোকে ভেবেছিলো সে তার যান-টান নিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে, এখন সেই সিদ্ধান্ত সবাই আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে বেঁচে আছে, বহাল তবিয়তেই বিরাজমান; আর তার এই বেঁচে-থাকাই জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক! সে সাংঘাতিক লোক, মারাত্মক! কিছুতেই তাকে আর বাড়তে দেয়া চলে না।

এমন ভাবনা থেকেই সরকার থেকে নিচের বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করা হলো :

দুর্বারগতি বিভীষিকার অধিনায়ক যেহেতু তাহার আবিষ্কারকে সর্ব সাধারণের গোচরে আনিতে অস্বীকার করিয়াছে, যেহেতু এই যান সে এরূপভাবে চালায় যে তাহার যন্ত্র জনসাধারণের পক্ষে প্রচণ্ড বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, যাহার হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা করিবার যেহেতু কোনো উপায়ই নাই, অতএব এতদ্বারা বিভীষিকার কাপ্তেনকে আইন

কানুনের পরপারে বহিষ্কৃত করা হইল। তাহাকে অথবা তাহার যন্ত্রকে দখল বা ধ্বংস করিবার জন্য যে-কোনো উপায়ই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যে-কেহ তাহাকে বন্দী বা হত্যা করিতে পারিবে, তাহাকে যথোপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।

এতো একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর বিরুদ্ধে এক মরণপণ যুদ্ধের আহ্বান–যে-লোকটা কি না ভেবেছে একটা গোটা জাতিকে হেনস্থা করে বা ভয় দেখিয়ে পার পেয়ে যাবে, আর সে-জাতি কি না মার্কিন জাতি।

দিন ফুরোবার আগেই, মোটা-মোটা অঙ্কের সব পুরস্কার ঘোষণা করা হলো : যে কেউ এই সাংঘাতিক আবিষ্কারকের গোপন আচ্ছা বার করে দিতে পারবে, যে-কেউ তাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারবে, যে-কেউ তাকে হত্যা করে আমেরিকাকে মুক্ত করবে পারবে–সকলকেই বিরাট-বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।

জুলাইয়ের শেষের দিকে এইরকমই ছিলো পরিস্থিতি। সবই প্রায় যেন ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। যে-মুহূর্তে এই সমাজবিরোধী আবার দেখা দেবে, অমনি সংকেতে সে-খবর সবখানে ফাঁস করে দেয়া হবে, আর সুযোগ পাবামাত্র তাকে গ্রেফতার করা হবে। সেটা অবশ্য সম্ভব হবে না যদি সে থাকে তার সেই আশ্চর্য স্বতশ্চল শকটে অথবা অলৌকিক জলযানে। না, তাকে যদি পাকড়াও করতে হয় তো তাকে পাকড়াতে হবে আচমকা, অপ্রস্তুত অবস্থায়, যাতে সে তার ঐ অভূতপূর্বগতির যানে করে পালিয়ে যেতে না-পারে।

আমি সেইজন্যেই সজাগ ও উন্মুখ হয়ে ছিলুম, অপেক্ষা করছিলুম কখন মিস্টার ওয়ার্ডের কাছ থেকে রণক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ আসে। আমার সহকর্মীরাও সারাক্ষণ প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু কোনো নির্দেশই এলো না মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে থেকে, কেননা যার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান তার হাল-হকীকৎ তখনও কারু জানা নেই। জুলাই মাস শেষ হয়ে এলো। খবরকাগজগুলো উত্তেজনায় তেমনি টগবগ করে ফুটছে। তারা এমনকী একের পর এক গুজব ছেপে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন-নতুন সূত্রের কথা বেরুচ্ছিলো, কিন্তু সবই ছিলো অলীক কল্পনাবিলাস। আমেরিকার প্রতি কোণ থেকে অনবরত টেলিগ্রাম আসছে ফেডারেল পুলিশের সদর দফতরে, একেকটা টেলিগ্রাম মুহূর্তের মধ্যে নাকচ করে দিচ্ছে অন্য টেলিগ্রামগুলোর বয়ান। এত-যে বিশাল বিশাল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিলো, তার একটা ফল তো হবেই : এর ওর নামে নালিশ, লোকের পরিচয় নিয়ে ভ্রান্তিবিলাস, পর্বতপ্রমাণ ভুলবিভ্রম, সবই ছিলো, কোনো কোনোটা অবশ্য ইচ্ছাকৃত বিভ্রম নয়, কখনও কোনো ধুলোর ঝড় দেখে লোকে ভেবেছে তার আড়ালে বুঝি কোনো স্বতশ্চল শকট লুকিয়ে আছে। আমেরিকার অজস্র হ্রদে কোনো ঢেউ উঠলেই লোকে ভেবেছে বুঝি-বা জলের তলায় লুকিয়ে আছে কোনো ডুবোজাহাজ। সত্যি-বলতে, লোকের উত্তেজিত মগজ অনবরতই রজ্জুতে সর্পভ্রম করে চলেছে।

শেষটায়, উনতিরিশে জুলাই, টেলিফোন এসে হাজির : এক্ষুনি মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে এসে দেখা করতে হবে।

তোমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে, স্ট্রক, তিনি বলেছেন।

কোথায়?

টলেডো যেতে হবে।

তাকে তবে দেখা গেছে?

হ্যাঁ। টলেডোয় পৌঁছে তুমি পরবর্তী নির্দেশ পাবে।

একঘণ্টার মধ্যেই আমার সহকারীদের নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়বে।

চমৎকার! আর, ও, হ্যাঁ, স্ট্রক, আমি তোমাকে এখন সরকারিভাবে একটা নির্দেশ দিচ্ছি।

কী?

যাতে তুমি সফল হও–এবার যাতে কৃতকার্য হও!

অভিযান

১১. অভিযান

তাহলে, অবশেষে, যাকে চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, সেই আবিষ্কারক আবার এসে মার্কিন মুলুকের ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়েছে! ইওরোপে সে কখনও আত্মপ্রকাশ করেনি, জলেও না, ডাঙাতেও না। সে তাহলে অ্যাটলান্টিক পেরোয়নি, যা সে হয়তো তিনদিনেই অতিক্রম করে যেতে পারতো। তাহলে কি সে মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছে যে আমেরিকাকেই সে তার রগরগে রোমাঞ্চকর অভিযানের রঙ্গভূমি হিশেবে ব্যবহার করবে? তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা কি ঠিক হবে যে সে আসলে একজন মার্কিন নাগরিক?

আরো-একবার এ-ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখা যাক। এটা তো স্পষ্ট যে তার ডুবোজাহাজের সাহায্যে সে অনায়াসেই এই বিশাল মহাসমুদ্র পেরিয়ে ইওরোপে পৌঁছে যেতে পারতো। তার ডুবোজাহাজের দুরন্ত গতি যে দ্রুততম বাষ্পচালিত জাহাজের চেয়েও তার সমুদ্রযাত্রাকে অনায়াস ও ক্ষণস্থায়ী করে তুলতে পারতো তা-ই নয়, পথে সমুদ্রে যত ঝড়তুফান ওঠে তার হাত থেকেও অনায়াসেই সে তার ডুবোজাহাজে করে রেহাই পেতে পারতো। সমুদ্রঝড় বলে কিছুই তার অভিধানে থাকতো না। ঝড় উঠলেই সে চলে যেতে পারতো জলের তলায়, আর সমুদ্রের গভীরে সে পেতো শান্ত নিস্তরঙ্গ জল। কিন্তু তবু এই আবিষ্কারক অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে ওপারে চলে যায়নি, আর এখন যদি সে ধরা পড়ে যায় তবে সে সম্ভবত ধরা পড়বে ওহায়ো রাজ্যে, কারণ টলেডো তো ওহায়োরই একটা শহর।

এবারে অবশ্য এই আশ্চর্য যানটাকে দেখা গিয়েছে, সে-তথ্যটা সযত্নে চেপে রাখা হয়েছে। যে-গোয়েন্দাটি খবরটি পুলিশদফতরে জানিয়েছিলো, সে ছাড়া দফতরের আর কয়েকজন লোক মাত্রই খবরটা জানে। এখন আমি শশব্যস্তভাবে সেই নজরদারের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি। কোনো খবরকাগজই–আর তাদের মধ্যে অনেকেই খবরটা ছাপবার জন্যে বিস্তর টাকা খরচ করতে-এ-খবরটা ছাপতে পারবে না। আমরা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ব্যাপারটার একটা সুষ্ঠু উপসংহার না-হওয়া অব্দি একটি কথাও বাইরে প্রকাশ করা হবে না। আমি কিংবা আমার সহকারীরা–সেই-যে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছি, সেই কুলুপ আর সহজে খুলছি না।

মিস্টার ওয়ার্ডের নির্দেশমতো যার কাছে আমি দেখা করতে চলেছি, তার নাম আর্থার ওয়েলস। সে আমাদের জন্যে টলেডোতেই অপেক্ষা করে আছে। লেক ইরির পশ্চিম প্রান্তে এই টলেডো নগরী। আমাদের ট্রেন পূর্ণবেগে সারা রাত ধরে ছুটে চলেছে পশ্চিম ভার্জিনিয়া আর ওহায়োর মধ্য দিয়ে। রাস্তায় কোনোকারণেই দেরি হয়নি; পরদিন বেলা দুপুর হবার আগেই টলেডোের স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন থেমেছে ।

জন হার্ট, ন্যাব ওয়াকার আর আমি তৎক্ষণাৎ আমাদের স্যুটকেস নিয়ে নেমে পড়েছি, সকলেরই পকেটে রিভলবার। তাকে আক্রমণ করতে হলে অস্ত্র লাগবে, যদি আত্মরক্ষা করার দরকার হয় তখনও হাতে অস্ত্র থাকলে ভালো। ট্রেন থেকে নামতে না-নামতেই আমি আর্থার ওয়েলসের দেখা পেয়ে গেছি–সে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অধীরভাবে সে যাত্রীদের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলো, বোঝাই যাচ্ছিলো যে সে আমার মতোই অধীর হয়ে আছে–কোনো-এক বিষম তাড়ায়।

আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিগেস করেছি, মিস্টার ওয়েলস?

মিস্টার স্ট্রক? সেও উলটে আমায় জিগেস করেছে।

হ্যাঁ।

আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি, ওয়েলস বলেছে।

আমাদের কি কখনও টলেডোতে থেমে অপেক্ষা করতে হবে? আমি তার কাছে। জানতে চেয়েছি।

না, আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি, মিস্টার স্ট্রক। দুটি টগবগে ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। যত-শিগগির-সম্ভব যাতে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারি সেইজন্যে আমাদের এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়তে হবে।

আমরা এখনিই যাবো, এই বলে আমি দুই সহকারীর দিকে ফিরে ইশারা করেছি। কতদূর যেতে হবে? অনেকটা পথ?

সব শুদু কুড়ি মাইল।

আর, যেখানে যাচ্ছি, সে-জায়গাটার নাম?

ব্ল্যাক রক ক্রীক।

একটা হোটেলে আমাদের মালপত্র জিম্মা করে রেখে তক্ষুনি আমরা ঘোড়ার গাড়িটায় করে বেরিয়ে পড়েছি। একটু বুঝি বিস্মিতভাবেই লক্ষ করেছি, গাড়িতে, আমাদের সীটের তলায়, বেশ কয়েকদিনের উপযোগী রসদ। মিস্টার ওয়ে আমাকে এর মধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ব্ল্যাক রক ক্রীক-এর আশপাশের অঞ্চলটা সারা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বন্য, পরিত্যক্ত। চাষী কিংবা জেলে-কাউকেই আকৃষ্ট করার মতো কিছুই সেখানে নেই। খাবার-দাবার মিলবে না সেখানে, কেননা সেখানে কোনো সরাই নেই, এমনকী রাতের বেলা আশ্রয় নেবার মতো কোনো কুঠিও মিলবে না।

ভাগ্যিশ এখন জুলাই মাস, বেশ গরম পড়েছে, তাই আকাশের তারার তলায় দু একটি রাত কাটাতে হলে তেমন-একটা কষ্ট হবে না।

আর যেটা সবচাইতে সম্ভব, আমরা যদি আদৌ কৃতকার্য হই, তবে ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। হয় বিভীষিকার সর্বাধিনায়ককে পালাবার কোনো সুযোগ না-দিয়েই আচম্বিতে আমরা আক্রমণ করবো, আর নয়তো দেখতে পাবো যে সে তার যান চালিয়ে দিয়েছে–এবং তখন তাকে গ্রেফতার করার সব আশাই বিসর্জন দিতে হবে।

আর্থার ওয়েসের বয়েস সম্ভবত চল্লিশ, তাগড়া হট্টাকট্টা মানুষ, গায়ে অসীম শক্তি ধরে। আমি আগেই তার নাম শুনেছিলুম, এখানকার স্থানীয় পুলিশবাহিনীতে দক্ষতার জন্যে তার ভারি সুনাম। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, সহজে বিচলিত হয় না, সবসময় একটা-না-একটা ফন্দি বা রণকৌশল বার করছে-নিজের জীবন বিপন্ন করেও

এর আগে বেশ কয়েকবার সে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। সম্পূর্ণ আলাদা একটা কাজ হাতে নিয়ে সে টলেডো এসেছিলো–কিন্তু দৈব তাকে বিভীষিকার পেছনে এনে হাজির করে দিয়েছে।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ি দ্রুতবেগে লেক ইরির তীর ধরে ছুটে চলেছে, দক্ষিণ পশ্চিমে। এই মস্ত হ্রদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমায় প্রায় সমুদ্রের মতোই যেন বিশাল –তার একদিকে ক্যানাডা, অন্যদিকে ওহায়ো, পেনসিলভ্যানিয়া আর নিউইয়র্ক রাজ্য। আমি যদি এখানে একটু থেমে পড়ে এই লেক ইরির ভৌগোলিক অবস্থান, তার গভীরতা, তার বিশাল প্রসার এবং তার আশপাশে আর কী-কী জলধারা আছে, সে-কথা একটু একটু ফেনিয়ে বলি, তবে তা এই জন্যেই যে একটু পরেই যে-ঘটনাগুলো ঘটবে, তা বোঝাবার জন্যে এ-সব তথ্য জানা জরুরি।

লেক ইরি প্রায় দশহাজার বর্গমাইল ধরে ছড়িয়ে আছে। সমুদ্রতল থেকে তার অবস্থান প্রায় ছশো ফিট ওপরে। উত্তরপশ্চিমে, ডেট্রয়েট নদী মারফৎ, সে পশ্চিমের বিশালতর হ্রদগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত–তাদের কাছ থেকে অনবরত সে জল পায়। তার নিজেরও কতগুলো নদী আছে, তবে সেগুলো বেশ ছোটোই আর তাদের তেমন গুরুত্বও নেই– যেমন, রকি, কুইয়াহোগা, আর ব্ল্যাক রিভার। উত্তরপুবদিকে এই হ্রদ তার সব জল নায়াগ্রা নদী আর তার বিখ্যাত জলপ্রপাত মারফৎ সরাসরি ঢেলে দেয় লেক অন্টারিওতে।

এ-পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, লেক ইরি কোথাও-কোথাও একশো তিরিশ ফিট গভীর। তা থেকে নিশ্চয়ই এটাও বোঝা যাবে এখানে কী-পরিমাণ জল থইথই করছে। এই

অঞ্চলটাই বিশাল সব হ্রদে ভর্তি। জমি যদিও উত্তর মুখে অবস্থিত নয়, তবু সে সুমেরুবৃত্তের ঠাণ্ডার কবলে পড়ে হি-হি করে কাঁপে। উত্তরদিকে যে-অঞ্চল, সেটা ঢালু হয়ে নিচে গড়িয়ে গেছে, আর শীতের হাওয়া দুরন্ত বেগে তার ওপর দিয়ে ঝেটিয়ে বয়ে যায়, সেইজন্যে মাঝে-মাঝে লেক ইরি এ-তীর থেকে ও-তীর জমাট বেঁধে যায়।

এই বিশাল হ্রদটার ধারে-ধারে যে-সব প্রধান শহর গজিয়ে উঠেছে তার একটা হলো, পুবদিকে, বাফেলো–সেটা নিউইয়র্ক রাজ্যের অন্তর্ভূত; টলেডো, ওহায়োর শহর–পশ্চিমে; তাছাড়া আছে ক্লীভল্যাণ্ড ও সানস্কি-এ-দুটোও ওহায়োরই শহর, তবে দক্ষিণে; আর তীর ধরে কত-যে ছোটো-ছোটো গ্রামশহর গড়ে উঠেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। যানবাহন স্বভাবতই অবিশ্রাম আনাগোনা করছে এখানে, বার্ষিক প্রায় কুড়ি কোটি ডলার আয় হয়–শুধু এই বাবদেই।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ি চলেছে, লেকের তীর ধরে, রুক্ষ উবড়োখাবড়ো একটা রাস্তা দিয়ে–এ-রাস্তায় যানবাহন কমই চলে। যেতে-যেতেই আর্থার ওয়েলস আমায় খুলে বলেছে সে এখানে এসে কী জেনেছে।

দু-দিনও কাটেনি তারপর, সাতাশে জুলাই অপরাহ্,ে ওয়েলস ঘোড়ায় চড়ে হার্লি শহরের দিকে যাচ্ছিলো। শহরটা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, সে একটা ছোট্ট বনের। মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় দেখতে পেয়েছে, লেকের অনেকটা ভেতরে, মাঝখানেই প্রায়, একটা ডুবোজাহাজ জল থেকে হঠাৎ উঠে আসছে। দেখেই সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে ঘোড়াটাকে একটা গাছের গায়ে বেঁধে রেখে সন্তর্পণে পায়ে-পায়ে লেকটার দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে একটা মস্ত গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে

দেখতে পায়–নিজের চোখে দেখতে পায়–এই ডুবোজাহাজ তার দিকেই এগিয়ে আসছে, আর শেষে ব্ল্যাক রক ক্রীকের মুখে এসে নোঙর ফেলছে। এই কি তবে সেই অভূতপূর্ব যন্ত্রযান-সারা জগৎ যাকে ছুঁড়ে বেড়াচ্ছে–আর এখন কি না সেটা এসে থেমেছে প্রায় যেন তারই পদপ্রান্তে?

আমি তো একলা ছিলাম, ওয়েলস আমাদের বলেছে, ক্রীকের কিনার ঘেঁসে, একেবারে একা। যদি আপনি এবং আপনার দুজন সহকারী তখন আমার সঙ্গে থাকতেন, তাহলে ওদের দুজনের বিরুদ্ধে আমরা চারজন, আমরা অনায়াসেই ওদের ওপর চড়াও হয়ে ওরা ওদের ডুবোজাহাজে উঠে পালাবার আগেই ওদের ধরে ফেলতে পারতাম।

কেননা সে তার ঐ গাছের আড়াল থেকে দেখেছিলো, ডুবোজাহাজটা যখন তীরের পাথরগুলোর কাছে এসে হাজির হয়েছে, দুজন লোক জাহাজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ডেকের ওপর, তারপর ডাঙায় এসে নেমেছে। এদের একজনই কি সেই কুখ্যাত দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড, সেই-যে বেশকিছুদিন আগে লেক সুপিরিয়রে যাকে দেখা গিয়েছিলো, এবং তারপর থেকে যার আর-কোনো হদিশ নেই? এ-ই কি তবে সেই রহস্যময় বিভীষিকা, যেটা এইমাত্র লেক ইরির গভীর থেকে উঠে এলো জলের ওপর?

হ্যাঁ, আমরা থাকলে হয়তো ওদের ওপর চড়াও হতে পারতুম, ওয়েলসের কথার জের টেনে আমি বলেছি, কিন্তু জাহাজে কি ওদের আর-কোনো সঙ্গীসাথী ছিলো না? তবু, যদি এই দুজনকেও পাকড়ানো যেতো, তবে অন্তত ঘোড়ার মুখ থেকেই জানা যেত। ওরা আসলে কারা।

আর ভেবে দেখুন, ওয়েলস জুড়ে দিয়েছে, যদি দুজনের একজন সত্যি-সত্যি বিভীষিকার কাপ্তেন হতোর।

আমার শুধু একটাই ভয়, ওয়েলস। এই ডুবোজাহাজ-আমরা তো এখনও জানি আমরা একেই হন্যে হয়ে ছুঁড়ে বেড়াচ্ছি কি না–তুমি ক্রীক ছেড়ে চলে আসার পর এখানে থেকে কেটে পড়েনি তো?

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেটা হাতে-নাতে জেনে ফেলবো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন–ওরা যেন ওখানেই থাকে! তারপর যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে

আচ্ছা, আমি তাকে জিগেস করেছি, তুমি কি রাত হওয়া অব্দি গাছের আড়াল থেকে ওদের ওপর নজর রেখেছিলে?

না। আমি ঘণ্টাখানেক ওদের হালচাল লক্ষ করেই, সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে টলেডোর টেলিগ্রাফ আপিশে চলে আসি। সেখানে আমি গভীর রাতে পৌঁছেছিলাম–তক্ষুনি আমি ওয়াশিংটনে জরুরি বার্তাটা পাঠিয়ে দিই।

সে হলো পরশু রাতে। তারপর কি কাল তুমি আবার ব্ল্যাক রক ক্রীকে ফিরে এসেছিলে?

হ্যাঁ।

ডুবোজাহাজটা তখনও সেখানে ছিলো?

ঠিক একই জায়গায়।

আর লোক দুটো?

সেই একই লোক–দুজনকেই আমি পরশু ভালো করে দেখে এসেছি। দেখে শুনে মনে হচ্ছিলো ডুবোজাহাজটা বোধহয় কোনো দুর্ঘটনার পাল্লায় পড়েছিলো, তাই বেছে-বেছে এই নিরিবিলি জায়গায় এসে তারা মেরামত করছে তাকে–

হয়তো তা-ই হবে, আমি বলেছি, হয়তো এমন-কোনো ভাঙচুর হয়েছে জাহাজটার যেজন্যে তারা তাদের আসল আড্ডায় ফিরে যেতে পারেনি। ঈশ! এখনও যদি তারা ওখানে থেকে থাকে–

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখনও ওরা ওখানেই আছে–কারণ জাহাজের মধ্য থেকে অনেক মালপত্র বার করে এনে ওরা তীরে ঝুপ করে রেখেছিলো। দূর থেকে দেখে যতটা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা জাহাজের ভেতরটা ফাঁকা করে নিয়ে ভেতরে কাজ করছে।

মাত্র দুজন লোক?

শুধু দুজন লোক।

কিন্তু, আমি আপত্তি তুলেছি, মাত্র দুজন লোকের পক্ষে কি এমন-একটা দুরন্তগতির ডুবোজাহাজ মেরামত করা সম্ভব–আর তার ওপর যন্ত্রটা জটিলও বটে, কেননা সে একে-তিন-তিনে-এক, একই সঙ্গে মোটর গাড়ি, স্টীমবোট এবং ডুবোজাহাজ!

তা হয়তো সম্ভব নয়, মিস্টার স্ট্রক, কিন্তু আমি শুধু সেই দুজন লোককেই বারে বারে দেখতে পেয়েছি। আমি যে-বনটার মধ্যে লুকিয়েছিলাম, কয়েকবার তারা তার কাছেও এসেছিলো-কাঠকুটো জড়ো করতে, তাই দিয়ে তীরে আগুন জ্বেলেছিলো। এ-জায়গাটা একেবারেই জনমানবহীন, তাছাড়া ক্রীকটাও এমনভাবে চারপাশের বনজঙ্গল দিয়ে ঢাকা যে কেউ-যে তাদের আচমকা দেখে ফেলবে এমন সম্ভাবনা আদপেই ছিলো না। মনে হচ্ছিলো, তারাও বুঝি এ-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

আবার দেখতে পেলে এই দুজনকে তুমি ঠিক-ঠিক চিনতে পারবে?

নিশ্চয়ই। একজন ছিলো মাঝারি চেহারার, ক্ষিপ্র, চটপটে, মুখে ঝোঁপের মতো ঘন দাড়ি। অন্যজন তুলনায় একটু বেঁটেখাটো। কিন্তু বহরে বড়ড়া, আর হট্টাকট্টা। আগের দিনের মতোই, কালও আমি পাঁচটা নাগাদ বন থেকে বেরিয়ে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে টলেড়োয় ফিরে আসি। গিয়ে দেখি মিস্টার ওয়ার্ডের কাছ থেকে একটা তার এসেছে–তাতে জানিয়েছেন যে আপনারা আসছেন। তারপর আমি স্টেশনে গিয়ে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করি।

সারসংক্ষেপ করলে ব্যাপারটা, তাহলে, এইরকম দাঁড়ায় : গত চল্লিশ ঘণ্টা ধরে, একটি ডুবোজাহাজ-সম্ভবত সেটাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি–ব্ল্যাক রক ক্রীকে সংগোপনে মেরামতির কাজে ব্যস্ত আছে। হয়তো এতই জরুরি ছিলো যে এক্ষুনি। মেরামত করে না-নিলে চলতো না–আর তা যদি হয়, যদি গুরুতর জখমই হয়ে থাকে এই ডুবোজাহাজ, তাহলে এখন গিয়েও আমরা তাকে ওখানেই দেখতে পাবো। বিভীষিকা কী করে শেষটায় লেক ইরিতে এসে আস্তানা গেড়েছে, আর্থার ওয়েসের সঙ্গে আমি সে নিয়েও আলোচনা

করেছি, শেষটায় একমত হয়েছি যে এটাই তার সম্ভাব্য আস্তানা হয়ে থাকতে পারে। শেষবার তাকে দেখা গিয়েছিলো লেক সুপিরিয়রে। সেখান থেকে লেক ইরি আসতে গিয়ে এই আশ্চর্য যানটি হয়তো মিশিগানের রাস্তা দিয়েই এসেছিলো, কিন্তু পুলিশ বা সাধারণ লোক-কারু চোখেই সে যখন পড়েনি, তাতে মনে হয় বিভীষিকা হয়তো জলপথেই এসেছে। গ্রেট লেকগুলো শেকলের মতো একটা আরেকটার সঙ্গে জড়ানো, নিশ্চয়ই সেই জলপথেই সে এসেছে–আর যেহেতু সে কাপ্তেন নেমোর নটিলাস-এর মতো জলের তলা দিয়েও আসতে পারে, তাই কেউই তাকে দেখতে পায়নি। এবং এখন, বিভীষিকা যদি এর মধ্যেই ক্রীক ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, কিংবা আমরা যখন সেটা দখল করে নেবার চেষ্টা করবো, তখন সে যদি পালিয়ে যায়–তাহলে সে কোনদিকে ফিরবে? তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা তো অর্থহীন হবে। বাফেলোর বন্দরে দুটো টরপেডো-ডেস্ট্রয়ার আছে, লেক ইরির একেবারে অন্য প্রান্তে। ওয়াশিংটন ছেড়ে আসবার আগেই মিস্টার ওয়ার্ড আমাকে তাদের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন; যদি দরকার হয়, তাদের কম্যাণ্ডারের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালে, তারা বিভীষিকার পেছনে ধাওয়া করতে পারে। কিন্তু যত উন্নত জাতের দ্রুতগামী জাহাজই তারা হোক না কেন, বিভীষিকার সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন? আর সে যদি একবার জলের তলায় ডুবে যায়, তবে তো এরা একেবারে অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়বে। তাছাড়া, আর্থার ওয়েস তার দৃঢ় বিশ্বাস খুলে বলেছে, জলযুদ্ধের সময় যতই কামানবন্দুক থাকুক, আর যতই নৌবাহিনীর লোক থাকুক, ডেস্ট্রয়ারগুলো কিন্তু কোনো সুবিধেই পাবে না। কাজেই, আজ রাতে যদি আমরা সফল হতে না-পারি, গোটা অভিযানটারই তবে ভরাডুবি হবে।

ব্ল্যাক রক ক্রীক জায়গাটা আর্থার ওয়েসের ভালোভাবে চেনা, কয়েকবার সে এখানে এসে শিকার করেছে। বেশির ভাগ জায়গাতেই উবড়োখবড়ো মস্ত সব পাথর দাঁড়িয়ে

আছে, যার গায়ে এসে প্রচণ্ডভাবে আছড়ে পড়ে হ্রদের জল। প্রণালীটা তিরিশ ফিটেরও বেশি গভীর, বিভীষিকা তাই জলের ওপরে যেমন, জলের তলাতেও তেমনি আশ্রয় নিতে পারে। দু-তিন জায়গায় খাড়াই পাড়গুলো শেষ হয়েছে বালি ভরা বেলাভূমিতে, তার মধ্য দিয়ে গেছে নয়ানজুলি, খাড়া, দু-তিনশো ফিট ওপরে বনে গিয়ে তা শেষ হয়েছে।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ি যখন এই বনে এসে পৌঁছুলো, তখন সন্ধে সাতটা বাজে। আমার এইনে এসেই তখনও বেশ দিনের আলো ছিলো, তাতে এমনকী গাছের ছায়াতেও সবকিছু সহজেই দেখা যাচ্ছিলো। খোলাখুলি বেলাভূমি দিয়ে ক্রীকের দিকে এগুলে, বিভীষিকার মাল্লারা আমাদের দেখে ফেলবে আর অমনি পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবে।

এখানেই আপাতত থেমে গেলে ভালো হয় না কি? বনের কাছে ঘোড়ার গাড়ি পৌঁছুতেই আমি ওয়েলসকে জিগেস করেছি।

না, মিস্টার স্ট্রক, ওয়েলস বলেছে, আমরা বরং গাড়িটা বনের ভেতরে গভীরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখি, তাহলে সহজে কারু চোখে পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে না।

গাছের তলা দিয়ে কি এই ঘোড়ার গাড়ি যেতে পারবে?

পারবে, আমাদর আশ্বস্ত করেছে ওয়েস। এই বনটা আমি আগেই ভালোভাবে দেখে গেছি। এখান থেকে পাঁচ-ছশো ফিট দূরে, ছোট্ট-একটা ফাঁকা জায়গা আছে, যেখানে আমরা গাছপালার সারির আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাবো, আর ঘোড়াগুলোও ইচ্ছেমতো চরে বেড়াতে পারবে। তারপর যেই অন্ধকার হবে, আমরা সন্তর্পণে বেলাভূমিতে চলে যাবো, ক্রীকের ঠিক মুখটার কাছে যেখানে উঁচু পাথরগুলো উঠেছে,

সেখানে। তাহলে বিভীষিকা যদি এখনও সেখানে থেকে থাকে, আমরা তার আর তার পালাবার পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লড়তে পারবো।

যদিও একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবার জন্যে আমরা অধীর হয়ে উঠেছিলুম, তবু মনে হলো ওয়েলস যা বলছে সেইমতো কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে–রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো। মাঝখানের সময়টা না-হয় সে যেভাবে বলছে, সেভাবেই কাটিয়ে দেয়া যাবে। ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে হেঁটেই এগিয়েছি আমরা, তারা শুধু ফাঁকা গাড়িটাকে টেনে এসেছে, আমরা ক্রমেই নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ঢ্যাঙা সব পাইনগাছ, বিশালবপু ওক বৃক্ষ, বিষাদবিধুর সাইপ্রেস ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে, মাথার পর সন্ধ্যাটাকে যেন আরো ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে। আমাদের পায়ের নিচে ছড়িয়ে আছে কত-কত উদ্ভিদ ও লতা, পাইনঝুরি আর মরা পাতা। ওপরের পাতা এমন ঘন নিবিড় যে অস্ত সূর্যের শেষ রশ্মিগুলো ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের যেন হাড়ে-হাড়ে এগুতে হচ্ছে। আর গাছপালার গায়ে কয়েকবার ধাক্কা খাবার পর অবশেষে আমাদের গাড়ি, প্রায় দশ মিনিট পরে, সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পৌঁছেছে।

মাঝখানে একটা ফাঁকা মতো জায়গা, চারপাশে সব মহাবৃক্ষ, পুরু ঘাসের জাজিম বেছানো যেন ছোটো একটা খেলার মাঠ; এখানে এখনও দিনের আলো আছে–অন্তত আর একঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার হবার সম্ভাবনা নেই। তাই এখানে একটা শিবির ফেলে একটু বিশ্রাম করে নেবার সুযোগ পাওয়া গেলোখানিক বাদেই তো রুক্ষ পাথুরে পথ ধরে আমাদের এগুতে হবে।

আমরা–বলাই বাহুল্য–ক্রীকটার মুখে যাবার জন্যে যেন মুখিয়ে ছিলুম, বিভীষিকা এখনও সেখানে নোঙর ফেলে রয়েছে কি না দেখবার জন্যে আর যেন তর সইছে না। একটু ধৈর্য চাই এখন, তাহলেই রাতের আঁধারে সকলের অগোচরেই আমরা রণক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছে যাবো। ওয়েলস বারেবারে এই কথাই আমাদের মাথায় ঢোকাতে চেয়েছে : আর সব অধীরতা সত্ত্বেও আমি তার কথার সারবত্তা বুঝতে পেরেছি।

ঘোড়াগুলোর জিনলাগাম খুলে দেয়া হয়েছে, যে-কোচোয়ান গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে তারই তত্ত্বাবধানে তারা চরে বেড়াচ্ছে। রসদ সব নামানো হয়েছে–চমৎকার একটা সাইপ্রেস গাছের তলায় জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার খাবারদাবার সাজিয়ে রেখেছে, বনের গন্ধে আমার কেন যেন বারেবারে মরগ্যানটন আর প্লেজেন্ট গার্ডেনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। খিদের সঙ্গে তৃষ্ণাও ছিলো আমাদের : আর খাদ্য বা পানীয়, কোনোটারই কোনো অভাব নেই। তারপর পাইপ জ্বেলে দু-একটা টান দিয়ে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আমরা আমাদের উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা করেছি।

বনের মধ্যে বিরাজ করছে গভীর স্তব্ধতা। পাখিদের শেষ গানগুলো থেমে গিয়েছে এখন, রাত যত কাছে আসছে, হাওয়ার গতিও ততই ঝিমিয়ে আসছে–এমনকী উঁচু উঁচু গাছগুলোর মগডালেও কোনো পাতা নড়ছে না। সূর্য ডুবে যেতেই আকাশ চট করে অন্ধকার হয়ে এলো, প্রদোষ নিয়ে এলো আবছায়া, অস্পষ্টতা। আমি আমার ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখলুম, সাড়ে-আটটা বাজে। সময় হলো, ওয়েস।

আপনি যখনই বলবেন–

তাহলে, এসো, রওনা দিই।

কোচোয়ানকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দিলুম : ঘোড়াগুলো যেন কিছুতেই এই ফাঁকা জায়গাটার বাইরে না-যায়, তারপর আমরা রওনা হলুম। ওয়েলস গেলো সকলের আগে আগে, তার পেছনে আমি, জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার সকলের পেছনে। এই ঘন। অন্ধকারে ওয়েলস না-থাকলে আমাদের বিষম মুশকিল হতো। শিগগিরই আমরা গিয়ে পৌঁছোলুম বনের অন্যধারে-আমাদের সামনে এখন ছড়িয়ে আছে ব্ল্যাক ক্রীক রকের তীরভূমি।

কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, সব চুপচাপ। সব, মনে হয়, পরিত্যক্তও। কোনো অহেতুক ঝুঁকি না-নিয়েই আমরা এগুতে পারবো। বিভীষিকা যদি সেখানে থেকে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই ঐ বড়ো পাথরগুলোর পেছনেই নোঙর ফেলেছে। কিন্তু সে কি আছে। সেখানে? এখনও? সেইটেই লাখো ডলার দামের প্রশ্ন! আমরা যতই এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধানের দিকে এগুচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন আমরা গলায় এসে আটকে গিয়েছে।

ওয়েলস ইঙ্গিতে আমাদের এগিয়ে যেতে বললে। আমাদের পায়ের তলায় তীরের বালি ডেবে যাচ্ছে। ক্রীকের মুখ থেকে আমরা এখন দুশো ফিট দূরে, পা টিপেটিপে জায়গাটা পেরিয়ে আমরা সোজা লেকের পাশে পাথরের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

কিছুই নেই লেকের জলে! কিছুই নেই!

যে-জায়গাটায় ওয়েক্স চব্বিশ ঘন্টা আগেও বিভীষিকাকে রেখে গিয়েছিলো সেই জায়গাটায় ফাঁকা পড়ে আছে–আমাদের দেখে যেন হা-হা করে হাসছে সে, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড এখন আর এই ব্ল্যাক রক ক্রীকে নেই। আবারও সে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে!

.

১২. ব্ল্যাক রক ক্রীক

মানুষের স্বভাবটাই এমন যে সে প্রায়ই বিভ্রমের ঘোরে পড়ে যায় । এ-সম্ভাবনা তো সবসময়েই ছিলো যে বিভীষিকা এই তল্লাট ছেড়ে কেটে পড়েছে–এমনকী ওয়েলস তাকে গতকাল স্বচক্ষে দেখে থাকলেও এ-সম্ভাবনাটা তো কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যেতো না। যদি তার তিনফেরতা মোটরটায় সত্যি কোনো চোটজখম হয়ে থাকে, যেজন্যে সে ডাঙায় বা জলে কিছুতেই তার গোপন আড্ডায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেনি এবং সেইজন্যেই যদি ব্ল্যাক রক ক্রীকে এসে তাকে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে হয়ে থাকে, তাহলে, এখন তাকে এখানে না-দেখতে পেয়ে কোন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুবো আমরা? স্পষ্টই ধরে নেবো যে তার মেরামতি শেষ হয়ে যেতেই সে তার নিজের পথে ফের রওনা হয়ে পড়েছে, এরই মধ্যে নিশ্চয়ই পেরিয়ে গিয়েছে লেক ইরির জল।

এই সমাপ্তিটা তো সবসময়েই সম্ভাব্য ছিলো, অথচ যতই আমরা অভিযানে বেরিয়ে এই ব্ল্যাক রক ক্রীকের কাছে এসে পড়েছি, ততই আমরা মন থেকে এই সম্ভাবনাটাকে হঠিয়ে দিয়েছি। আমরা প্রায় ধরেই নিয়েছি যে রাতের আঁধারে এখানে এসে হাজির

হলেই বিভীষিকার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাবে, যে আমরা দেখতে পাবো সে এখানকার জলে নোঙর ফেলে রাত্তিরের মোলায়েম হাওয়ায় দিব্বি দোল খাচ্ছে, যে ওয়ে তাকে যেখানে দেখে গিয়েছে সেখানেই সে শেকড় পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে।

আর তাই, এখন কী-যে হতাশা! আমার মনে হচ্ছিলো, এই যেন শেষ হয়ে গেলো, আর-কখনও তাকে হাতে পাবার কোনো আশা নেই। আমাদের সব চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে! এমনকী বিভীষিকা যদি কখনও এই লেকের জলে থেকে থাকে, তবে তাকে। খুঁজে পেয়ে, তার কাছে গিয়ে, তাকে দখল করে বসা অন্তত আমাদের সাধ্যে কুলোবে না–আর এও না-হয় কবুল করাই ভালো হয়তো তা সব মানুষেরই সাধ্যের বাইরে।

আমরা সেখানেই থম মেরে দাঁড়িয়েছিলুম, আমি আর ওয়েস যেন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, সম্পূর্ণ হতোদ্যম। জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকারও কম নিরাশ হয়নি, কিন্তু তবু তারা তীর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো–যদি বিভীষিকা কোনো চিহ্ন বা সূত্র ফেলে গিয়ে থাকে! ক্রীকের ঠিক মুখটায় হতভম্ব দাঁড়িয়ে, ওয়েলস আর আমি যেন মুখ ফুটে একটা কথাও আর বলতে পারছিলুম না। দুজনের যা মনের দশা এখন, তাতে কোনো কথা বলারই বা দরকার কী। আগ্রহ উত্তেজনার পর এখন এমন দপ করে নিভে-যাওয়া–এতেই যেন আমরা একেবারে অবসাদে ভরে গিয়েছিলুম। আমাদের এত সাধ্যের অভিযানের এমন শোচনীয় ভরাডুবি সত্ত্বেও আমরা একদিক থেকে যেমন হাল ছেড়ে দিতে রাজি ছিলুম না, তেমনি অন্যদিক থেকে কোনোভাবে অভিযানটা চালিয়ে-যাওয়াও সম্ভব ছিলো না।

প্রায় একটা ঘণ্টাই কেটে গেছে, অথচ তবু আমরা কিছুতেই যেন জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে পারছি না। আমাদের চোখগুলো যেন রাতের আঁধার ফুঁড়ে দূরে-দূরান্তরে দেখতে

চাচ্ছিলো। মাঝে-মাঝে লেকের জলে তারার আলো ঝিকিমিকি করে ওঠে, তারপরেই ঢেউ ওঠে, কাঁপা-কাঁপা ক্ষীণ ঝিকিমিকির রেশ মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, আর তার সঙ্গে ধুক করে বুকের মধ্যে হঠাৎ-জাগা ক্ষীণ আশাও নিভে যায়। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে আমরা যেন ছায়ার মতো কোনো জাহাজকে আসতে দেখছি, ছায়ার মতো আকাশের পটে যেন আঁকা আছে সেটা। ক্রীকের জল পাক খেয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ে, আর সেই ঘূর্ণিজলের আওয়াজে আমাদের বিভ্রমও কেটে যায়। আমাদের জখম মগজই আলেয়ার মতো এত-সব বিভ্রম তৈরি করে যাচ্ছে একের পর এক।

অবশেষে জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার তাদের খোঁজাখুঁজি শেষ করে ফিরে এলো –আর তাদের দেখেই আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, নতুন-কিছু খবর আছে?

উঁহু, কিছু না, জন হার্টের উত্তর।

তোমরা এই খালটার দুই তীরই ভালো করে দেখে এসেছো?

হ্যাঁ, ন্যাব ওয়াকার উত্তর দিলে, ঐ ওপরে যেখানে অল্প ঘোলাজল পাক খাচ্ছে, সেই অব্দি গিয়েছিলাম। মিস্টার ওয়েলস যে বলেছিলেন জাহাজ মেরামতির জন্যে বিস্তর মালপত্র ডাঙায় নামানো হয়েছিলো, তার কোনো চিহ্নমাত্রও আমরা দেখতে পাইনি।

বনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিলো না আমার। আরেকটু না-হয় অপেক্ষা করেই দেখা যাক, এখানে।

ঠিক তক্ষুনি জলের মধ্যে আচমকা এমন আলোড়ন সৃষ্টি হলো, স্তম্ভের আকারে এমনভাবে জল ফুলে-ফেঁপে তীরে এসে আছড়ে পড়লো যে আমাদের সকলেরই মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হলো।

ওয়েলস বললে, মনে হচ্ছে কোনো জাহাজের চাকার ঘায়ে জলে ঢেউ উঠেছে।

হ্যাঁ, নিজের অজান্তেই বুঝি আমি আমার স্বর নামিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ এমন ঢেউয়ের কারণ কী? বাতাস তো প্রায় মরেই গিয়েছে। জলের ওপরে কিছু ভাসছে কি?

না কি কোনোকিছু জলের তলা দিয়ে বেগে ছুটেছে? ওয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করলে, হঠাৎ কেন জলের মধ্যে এমন তোলপাড় হচ্ছে।

ঢেউয়ের আছড়ানি দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে কোনো জাহাজের চাকারই কাজ–তবে সেটা জলের তলা দিয়ে চলেছে, না ভেসেই এসে এই খালে ঢুকছে তা বোঝবার কোনো জো নেই।

চুপচাপ, নিশ্চল, আমরা চোখকান টান করে এই গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলুম। খালের ওপাশে যে তীরে এসে ঢেউ আছড়ে পড়ছে, তার শব্দ স্পষ্ট কানে। আসছে। জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার উঁচু একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালে, যাতে ভালো করে দেখতে পারে। আমি ঝুঁকে পড়ে জলের সেই আলোড়ন লক্ষ করছি। না, এখনও সমানে তেমনি আলোড়ন চলেছে; না, তাও নয়, বরং এখন আরো বেড়ে উঠেছে জলের শব্দ। আর সেই সঙ্গে আমি যেন শুনতে পেলুম কী যেন একটা দপদপ করে আওয়াজ করছে-যেন কোনো চাকার শব্দ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আর-কোনো সন্দেহই নেই, আমার দিকে হেলে পড়ে নিচু গলায় ওয়েলস বললে, আমাদের দিকে একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে কোনো স্টীমবোট।

তা-ই হবে হয়তো, আমি তাকে ফিশফিশ করেই বলেছি, যদি-না লেক ইরির জলে বড়ো-বড়ো হাঙর বা তিমি থাকে।

না-না, এটা নির্ঘাৎ কোনো স্টীমবোট, ওয়েলস আবারও বলেছে, প্রশ্ন হচ্ছে।–সে কি খালটার মুখের দিকে যাচ্ছে, না সেদিক থেকে এদিকটায় আসছে।

আগে তুমি দু-দু-বার এখানেই জাহাজটাকে দেখেছিলে, তা-ই না?

হ্যাঁ, এখানেই।

তাহলে এটা সেই একই জাহাজ-সেটা ছাড়া আর-কোনো স্টীমবোটই হতে পারে – সম্ভবত সেই একই জায়গায় এসে সে থামবে।

ঐ-যে! ফিশফিশ করে বলেছে ওয়েলস, ক্রীকের মুখটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে।

হার্ট আর ওয়াকারও ততক্ষণে ফিরে এসেছে, আর আমরা চারজনে বেলাভূমির ওপর গুঁড়ি মেরে বসে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি ব্ল্যাক রক ক্রীকের মুখটাকে।

আবছায়ার মধ্যে দেখতে পেলুম, একটা বিশাল-কালো কিছু অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। খুবই আস্তে এগুচ্ছে সেটা, এখনও খালের মধ্যে এসে ঢোকেনি, এখনও লেকের

জলেই ভেসে আছে, উত্তরপুবে, সামান্য-একটু দূরে। তার এনজিনের ক্ষীণ দপদপ শব্দ আর কানে আসছে না, সম্ভবত এনজিনটা থামিয়ে দেয়া হয়েছে, জাহাজটা শুধু আগেকার গতির তাড়নাতেই ভেসে আসছে।

তখনই মনে হলো, এটা নিশ্চয়ই সেই ডুবোজাহাজ, ওয়েলস যাক আগে দু-বার দেখেছে; সে নিশ্চয়ই আবারও এখানে রাত কাটাতে ফিরে আসছে, খালের মধ্যেই বোধহয় সে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

তা-ই যদি হবে, যদি ফিরেই আসে, তবে হঠাৎ নোঙর তুলে সে চলে গিয়েছিলো কেন? আবারও কি তার কলকজা নতুন করে বিগড়ে গেছে–ঠিকমতো সে-সব সারানো হয়নি? না কি কোনো কারণে মেরামতির কাজ অসমাপ্ত রেখেই তাকে আচমকা চলে যেতে হয়েছিলো? হঠাৎ তাকে বাধ্য হয়ে আবার এখানে ফিরে আসতে হলো কেন? এমন কি কিছু হয়েছে যার ফলে সে এখন আর স্বতশ্চল শকটের মতো ডাঙার ওপর দিয়ে যেতে পারছে না–তার ফলে ওহায়োর রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে যেতে পারছে না আর তীরবেগে?

পর-পর এত-যে প্রশ্ন আমার মনে ভিড় করে এলো, তার কোনো উত্তরই আমার জানা ছিলো না। তাছাড়া ওয়ে আর আমি দুজনেই ধরে নিয়েছি যে এটাই হলো বিভীষিকা, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড যার অধিনায়ক, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে অসীম স্পর্ধাভরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। অথচ এটা তো এখনও নিছকই অনুমান যতই এর সত্য হবার সম্ভাবনা থাকুক না কেন, এটা এখনও তো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়নি।

যে-জাহাজই এটা হোক না কেন, সেটা রাতের আঁধারে প্রায় চুপিসাড়েই এখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই তার কাপ্তেন এখানকার জল আর ডাঙার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, ব্ল্যাক রক ক্রীক নিশ্চয়ই নিজের হাতের চেটোর মতোই তার চেনা, না-হলে সে এমন ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে এভাবে আসবার সাহস পেতো না। ক্যাবিনগুলো থেকে একফোঁটাও আলো পড়ছে না বাইরে–যেমন রাত্রি ঘুটঘুঁটে আঁধার, তার চেয়েও গভীর-কালো এই জাহাজটা।

মুহূর্ত পরেই আমরা কী-সব যন্ত্রপাতির ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলুম। ঢেউয়ের তোড় বেড়েছে আরো; আর কয়েক মুহূর্ত পরেই জাহাজটা তার ঘাটায় এসে ঠেকলো।

ঘাটা কথাটা দিয়েই হয়তো, যেখানটায় জাহাজটা ভিড়েছে, তাকে চেনানো যায়। আমাদের পায়ের নিচে পাথরগুলো একটা স্তর তৈরি করেছে, জল থেকে পাঁচ-ছ ফিট ওপরে, আর এমনভাবে ঢালু হয়ে জলে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে যে সেখানে অনায়াসেই কোনো নৌকো বাঁধা যায়।

আমার হাত ধরে টেনে ওয়েলস ফিশফিশ করে বললে, আর আমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না।

না, আমিও তার কথায় সায় দিয়েছি, ওরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে। আমাদের হয় গুঁড়ি মেরে থাকতে হবে, নয়তো কোনো পাথরের ফাটলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

আমরা আপনার পেছনেই থাকবো।

একটা মুহূর্তও নষ্ট করার নেই। সেই ঘনকালো প্রাচীর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আমার ওপর, আর তার ডেকের ওপর, জলের একটু ওপরে ডেকটা, আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজনের ছায়ামূর্তি।

তাহলে কি মাত্র দুজন লোকই আছে এই জাহাজে?

আমরা চুপিসাড়ে তারপর চলে গেছি নয়ানজুলিটার দিকে, যার একদিকের ঢাল উঠে গেছে ওপরের বনটায়, পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে ছোটো-ছোটো কতগুলো কুলুঙ্গির মতন। ওয়ে আর আমি একটায় গুঁড়ি মেরে বসলুম, পাশেই কুঁজো হয়ে জবুথবু বসে রইলো আমরা দুই সহকারী । বিভীষিকা থেকে লোক দুটি যদি তীরে এসে নামে, তাহলে আমাদের সহজে দেখতে পাবে না–অথচ আমরা তাদের ওপর নজর রাখতে পারবো, আর সুযোগসুবিধেমতো কোনো ব্যবস্থা করতে পারবো।

জাহাজটা থেকে ক্ষীণভাবে ভেসে আসছে নানারকম আওয়াজ, ইংরেজিতেই কারা যেন কী-সব বলাবলি করছে। বোঝা যাচ্ছে যে জাহাজটা এখানেই নোঙর ফেলবার প্রস্তুতি করছে। তারপর একটা দড়ি ছুঁড়ে ফেলা হলো জাহাজ থেকে, ঠিক সেই ঘাটায়, একটু আগেই যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ওয়েস দেখতে পেলে জাহাজিদের একজন দড়িটা লুফে নিয়েছে–সে আগেই লাফিয়ে তীরে নেমে পড়েছিলো। তারপর আমরা শুনতে পেলুম মাটির ওপর লোহা ঘষটে নেবার শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত পরেই, বালির ওপর পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। দুজন লোক হাঁটতে-হাঁটতে সোজা নয়ানজুলিটার কাছেই এসে পড়েছে, কিন্তু না-থেমে সরাসরি বনটার দিকেই এগিয়ে গেলো, একজনের হাতে জাহাজি লণ্ঠন, তার আলোয় পথ দেখে চলেছে তারা।

কোথায় তাদের গন্তব্য? তবে কি ব্ল্যাক রক ক্রীক এই বিভীষিকার একটা নিয়মিত আশ্রয়স্থল, তাদের অন্যতম গোপন আড্ডা? তার কাপ্তেন কি এখানে রসদপত্তরের একটা ভাড়ার কিংবা গুদোম বানিয়ে রেখেছে? তাহলে কি তারা এখানে এসেছে জাহাজটায় আবার সব রসদ মজুদ করে নেবার জন্যে–যখন কোনো খামখেয়ালির টানে এদিকে তারা এসেই পড়েছে, তখন নতুন করে জাহাজে মালপত্তর তুলে নেবে বলেই কি তারা ঠিক করেছে? তারা কি জনমনুষ্যবর্জিত এই পরিত্যক্ত-জায়গাটাকে এতই ভালোভাবে জানে যে ধরা পড়ে যাবার কোনো ভয়ই তাদের নেই?

কী করবো এখন? ফিশফিশ করে জিগেস করলে ওয়েলস।

তাদের ফিরে-আসা অব্দি সবুর করা যাক–তারপর–বিস্ময়ে আমার আর কোনো বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি। লোক দুটি আমাদের কাছ থেকে তখন বোধহয় তিরিশ ফিটও দূরে ছিলো না, যখন তাদের একজন হঠাৎ কেন যেন পেছন ফিরতেই তাদের লণ্ঠনের আলোটা তার মুখের ওপর এসে পড়লো।

লং স্ট্রিটে আমার বাড়ির ওপর যে-দুজন লোক কড়া নজর রেখেছিলো, এ তাদেরই একজন। উঁহু, মোটেই কোনো ভুল হয়নি আমার। আমার বুড়ি দাসী যেমন ভালো করে

তাদের চিনে রেখেছিলো, আমিও তাদের তেমনি ভালো করে খেয়াল করেছিলুম। সে-ই বটে; সে-ই ঐ দুজন চরের একজন, পরে আমি আর যাদের কোনো হদিশ পাইনি। আর-কোনো সন্দেহই নেই : আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছিলো এরাই। চিঠি তবেই সত্যি-সত্যি এই দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড এর কাছ থেকেই এসেছিলো–এই বিভীষিকাতে বসেই ঐ চিঠির মুসাবিদা করা হয়েছিলো! আবারও আমি নিজেকে খুঁচিয়ে জিগেস করলুম : গ্রেট আইরির সঙ্গে এই বিভীষিকার কী সম্বন্ধে রয়েছে!

ফিশফিশ করে ওয়েসকে আমি আবার আবিষ্কারটার কথা খুলে বললুম। সব শুনে সে শুধু বললে : এ-যে এক বিষম প্রহেলিকা!

এদিকে তোক দুটি ততক্ষণে বনের দিকে আরো এগিয়ে গেছে, গাছতলায় গিয়ে কাঠকুটো জড়ো করছে। ওরা যদি শেষটায় আমার শিবিরটাকে দেখে ফ্যালে? ওয়েলস একটু উৎকণ্ঠায় ভরে গিয়েই জিগেস করলে।

তারা যদি কাছের গাছপালাগুলো পেরিয়ে বনের ভেতরে ঢুকে না-পড়ে তাহলে অবশ্যি কোনো ভয় নেই।

কিন্তু যদি সেটা তাদের চোখে পড়ে যায়?

তাহলে তারা নিশ্চয়ই হুড়মুড় করে গিয়ে তাদের জাহাজে উঠে পড়তে চাইবে–আর তখন আমরা তাদের পালাবার পথ আটকে দাঁড়াবো।

ক্রীকের মুখটায়, যেখানে তাদের জলপোত নোঙর ফেলেছে–সেখান থেকে আর কোনো আওয়াজ আসছে না। আমি আমার লুকোবার জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এলুম; নয়ানজুলির ঢাল বেয়ে আমি নেমে এলুম ঐ ঘাটার দিকে; ঠিক যে-জায়গাটায় আঁকশির মতো লোহার বেড়ি পাথরগুলোয় আটকানো, ঠিক সেখানটাতেই আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

ঐ-তো, ঐ-যে, বিভীষিকা, জলের ওপর ভাসছে। কোথাও কোনো আলো নেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না-না ডেকের ওপর, না এই বালিয়াড়িতে। এই কি তবে আমার চমৎকার সুযোগ নয়? আমি কি লাফিয়ে উঠবো বিভীষিকায়, তারপর ঘাপটি মেরে বসে থাকবো কখন ঐ লোক দুটি জাহাজে ফিরে আসে?

মিস্টার স্ট্রক! কাছে থেকেই নিচু গলায় ডাক দিয়েছে ওয়েস।

আমি হুড়মুড় করে পেছিয়ে এসে তার পাশে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লুম। জাহাজটার দখল নেবার পক্ষে কি বড্ড-বেশি দেরি হয়ে গেছে? না কি চেষ্টাটা এমনিতেই ভণ্ডুল হয়ে যেতো, জাহাজ থেকে যারা তীরের দিকে নজর রেখেছে তাদের হুঁশিয়ারিতে? লণ্ঠন হাতে লোক দুটি এদিকে তখন নয়ানজুলিটা দিয়ে ফিরে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে তারা ঘুণাক্ষরেও কোনোকিছু সন্দেহ করেনি। দুজনেই হাতে এক-এক বাণ্ডিল কাঠ নিয়েছে, এগিয়ে এসে তারা ঘাটায় এসে থামলে।

তারপর তাদের একজন গলা চড়িয়ে–যদিও খুব জোরে নয়–হাঁক দিলে :হ্যাল্লো! কাপ্তেন!

সব ঠিক আছে। জাহাজটা থেকে একটা গলার স্বর ভেসে এলো।

ওয়েস আমার কানে-কানে গুনগুন করলে : সবশুদ্ধ তাহলে তিনজন!

হয়তো চারজন আছে, আমি গুনগুন করেই বললুম, কিংবা পাঁচ-ছজনও থাকতে পারে।

পরিস্থিতিটা ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠছে। অতজন জাহাজির বিরুদ্ধে, আমরা এই ক-জনা কী করবো এখন? বেশি বেপরোয়া হতে গেলে হয়তো সমস্তই বিশ্রীভাবে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এই দুজনা যখন এখন ফিরে এসেছে, তারা কি তাদের কাঠকুটো নিয়ে এখন জাহাজে গিয়ে উঠে পড়বে? তারপরই কি ছেড়ে দেবে তাদের জাহাজ, কি দিন ফোঁটা পর্যন্ত এখানেই নোঙর ফেলে থেকে যাবে? যদি এই ঘাঁটি ছেড়ে এখন সে রওনা হয়, তাহলে কি বিভীষিকা আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে না? লেক ইরির জল ছেড়ে, পাশের যে-কোনো রাজ্যে গিয়ে সে হাজির হতে পারে, স্থলপথেইকিংবা হয়তো ডেট্রয়েট নদী দিয়ে ভেসে চলে যাবে লেক হুরন-এ, তারপর গ্রেট লেকস-এ, আরো ওপরে । ব্ল্যাক রক ক্রীকের সংকীর্ণ খালের জলে যে-মওকা এসেছে, তা কি আর পাওয়া যাবে কখনও।

অন্তত, আমি ওয়েসকে গলা নামিয়েই বললুম, অন্তত আমরা আছি চারজন। তারা যেহেতু কোনো অতর্কিত হামলার প্রত্যাশা করছে না, তারা গোড়ায় ভড়কেই যাবে – ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবে। তারপর ফলাফল তো দৈবের হাতে।

আমি আমার সহকারী দুজনকে ডাকতে যাবো, যখন ওয়ে আবার আমার হাত চেপে ধরলে। ঐ শুনুন!

তীর থেকে একজন জাহাজটাকে কাছে আসতে বললে, আর অমনি জাহাজটা আরো এগিয়ে এলো পাথুরে তীরের কাছে। তীরের দুজনকে ডেকে সম্ভবত কাপ্তেনই জিগেস করলে : ওখানে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?

বিলকুল।

আরো দু-বাণ্ডিল কাঠ পড়ে আছে ওখানে?

হ্যাঁ, দুই।

তাহলে আরেকবার গেলেই তাদের বিভীষিকায় এনে তোলা যাবে।

বিভীষিকা! আর সন্দেহ নেই : সে-ই!

হ্যাঁ, আরেকবার গেলেই হবে।

বেশ, তাহলে ভোর হলেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারবো।

তাহলে কি জাহাজটায় কুললে তিনজন লোকই আছে? কাপ্তেন, অর্থাৎ দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড, আর তার এই দুই স্যাঙাৎ?

তারা তাদের সব কাঠকুটো জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুলতে চাচ্ছে। তারপর জাহাজে উঠে তারা যে-যার বার্থে পড়ে-পড়ে ঘুমুবে। তাহলে তখনই অতর্কিতে তাদের ওপর চড়াও

হলে হয় না–কাঁচা ঘুম থেকে উঠে তারা আত্মরক্ষা করার কোনো সুযোগই তখন পাবে না!

জাহাজের কাপ্তেন হুঁশিয়ার হয়ে সজাগ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে যখন, তখন জাহাজে গিয়ে লাফিয়ে নেমে সেটা দখল করে নেবার বদলে, ওয়েলস আর আমি ঠিক করলুম, তীরে লোকদুটোকে মাঝপথে না-আটকে তাদের বরং নিরাপদেই জাহাজে ফিরে যেতে দেয়া ভালো তারপর সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পর না-হয় আমাদের পালা আসবে।

এখন রাত সাড়ে-দশটা বাজে। আবারও বালিয়াড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। লণ্ঠন-হাতে লোকটা আর তার সঙ্গী আবারও নয়ানজুলির ঢাল বেয়ে বনের দিকে উঠে গেলো। তারা যখন দূরে চলে গেছে, আমরা কিছু বললে আর শুনতে পাবে না, তখন ওয়েস গিয়ে হার্ট আর ওয়াকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে এলো, আর আমি চুপি-চুপি পা টিপে টিপে গিয়ে একেবারে জলের ধার ঘেঁসে দাঁড়ালুম।

একটা ছোট্ট মোটা তার দিয়ে বিভীষিকা বাঁধা। অন্ধকারে যতটা আন্দাজ করা গেলো, মনে হলো সে লম্বা, ছিপছিপে, একটা টকুর মতো দেখতে; তার কোনো চিমনি নেই, কোনো মাস্তুল নেই, দড়িদড়া খাটাবার জন্যে কোনো সটান-দাঁড়ানো খুঁটিও নেই : নিউ-ইংল্যাণ্ডের জলে যখন সে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলো, তখন এই আকৃতির কথাই বারে বারে বলা হয়েছে।

আবার আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলুম, আমার সহকারীরা নয়ানজুলিতে তাদের কুলুঙ্গির ভেতর লুকিয়ে আছে। একবার হাত দিয়ে আমি আমার রিভলবারটা ছুঁয়ে নিলুম, এটা হয়তো একটু পরেই কাজে লাগবে।

লোক দুটি বনের মধ্যে চলে যাবার পর পাঁচ মিনিট কেটে গিয়েছে। এখন তারা যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসবে। তারপর অন্তত একঘণ্টা সবুর করতে হবে আমাদের, এদের ঘুমিয়ে পড়বার সময় দিতে হবে–তারপর আমরা অতর্কিতে হামলা করবো। তারা যাতে কিছুতেই তাদের জাহাজ পুরোদমে চালিয়ে তীরবেগে লেক ইরি থেকে বেরিয়ে যেতে না-পারে, কিংবা যেন ভুউশ করে জলের তলায় ডুবে না-যায়-এ-দুটি জিনিশ আমাদের ঠেকাতেই হবে।

এতদিন ধরে পুলিশে কাজ করছি, অথচ এর আগে আমি কখনও এমন অস্থির বোধ করিনি। মনে হলো, লোক দুটো হঠাৎ যেন বনের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে–কিছু-একটা যেন তাদের ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ একটা জোর আওয়াজে রাতের স্তব্ধতা ছিঁড়ে গেলো। শোনা গেলো ঘোড়ার খুরের দাপাদাপি, টগবগ করে খ্যাপার মতো যেন কতগুলো ঘোড়া ছুটেছে তীর ধরে।

আমাদেরই ঘোড়া, ভয় পেয়ে, হঠাৎ আঁৎকে উঠে, ধারে হয়তো কোচোয়ান ছিলো না, বনের ওপাশটার ফাঁকা জায়গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে–আর এখন তীর ধরে তুলকালাম ছুট লাগিয়েছে।

আর ঠিক তখনই, লোক দুটো ফিরে এলো, এবার তারা প্রাণপণে ছুটছে। অর্থাৎ, সন্দেহ নেই আর, তারা আমাদের শিবিরটা আবিষ্কার করে ফেলেছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছে যে আশপাশে কোনো পুলিশবাহিনী ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তারা টের পেয়ে গেছে যে তাদের ওপর সজাগ নজর আছে পুলিশের, তাদের এক্ষুনি পাকড়ে ফেলা হবে। কজেই তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে নয়ানজুলি দিয়ে ছুটে আসছে, তারপর ঐ লোহার শেকলটা খুলে দিয়ে তারা লাফিয়ে গিয়ে উঠে পড়বে বিভীষিকায়। আর উল্কার মতো বিভীষিকা অদৃশ্য হয়ে যাবে মুহূর্তে, আমাদের সব চেষ্টারই এমনি বিদঘুঁটেভাবে সলিল সমাধি হবে!

এগিয়ে এসো! ফরওয়ার্ড! বলে চেঁচিয়েই আমি নয়ানজুলির অন্যধারটা দিয়ে এগিয়ে গেলুম : এই লোক দুটোর পথ আটকাতেই হবে!

যেই তারা আমাদের দেখতে পেলে, হাতের বাণ্ডিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভার তাগ করে পর-পর গুলি ছুঁড়লে। একটা গুলি এসে জন হার্টের পায়ে লাগলো।

আমরাও উলটে আমাদের রিভলভারের ঘোড়া টিপলুম, কিন্তু ছুটন্ত লোকদুটোর গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগলো না। তারা তেমনি সমানে ছুটে চলেছে–একটুও থমকে যায়নি ভয়ে। খালের মুখটার কাছে এসে, লোহার শেকল বা দড়িটা খোলবার কোনো চেষ্টা না করেই তারা লাফিয়ে গিয়ে বিভীষিকায় উঠে পড়লো।

তাদের কাপ্তেন, লাফিয়ে এগিয়ে এসে, আমাদের তাগ করে পর-পর গুলি ছুঁড়লো। একটা গুলি ওয়েলসের গা ছড়ে চলে গেলো।

ন্যাব ওয়াকার আর আমি লোহার শেকলটা চেপে ধরে বিভীষিকাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তীরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলুম। তারা কি দড়িদড়া খুলে আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যাবে?

আচমকা লোহার শেকলটা যেন প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টানে পাথর ভেঙে ছত্রখান করে ছিটকে চলে গেলো। আর তার একটা আংটা আটকে গেলো আমার কোমরের বেলটে, আর অন্য-একটা আংটার দুরন্ত ঘা খেয়ে ওয়াকার ছিটকে পড়লো কয়েক হাত তফাতে। আংটাটা আমাকে আটকে রেখেছে, আর একটা দুরন্ত টানে আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে–

বিভীষিকা, তার এনজিন তখন পুরোদমে জেগে উঠেছে, যেন এক লাফেই ব্ল্যাক রক ক্রীকের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো লেক ইরির জলে।

.

১৩. দুর্বারগতি বিভীষিকা

যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দিনের আলো ফুটেছে। পুরু কাঁচের ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ একটা আলোর ছটা এসে ঢুকেছে সংকীর্ণ ক্যাবিনটায়; কেউ-একজন নিশ্চয়ই এই কুঠুরিটায় আমাকে রেখেছে, সে-যে ঠিক কত ঘন্টা আগে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু যে-রকম বাঁকাভাবে রোদ্দুর এসে ঢুকেছে ঘুলঘুলিটা দিয়ে, তাতে মনে হলো সূর্য নিশ্চয়ই দিগন্ত থেকে বেশি ওপরে ওঠেনি।

একটা সরু বাঙ্কের ওপর আমি শুয়ে আছি, গায়ে কম্বল ঢাকা। আমার জামাকাপড় কোণায় একটা আংটায় ঝুলছে, এখন শুকিয়ে গেছে। আমার বেল্টটা সেই আংটার বিকট টানে ছিঁড়েই গিয়েছে, পড়ে আছে মেঝেয়।

গায়ে কোথাও কোনো ক্ষত নেই, কোনো চোটজখমও লাগেনি, শুধু একটু দুর্বল বোধ করছি। আমি যদি চেতনা হারিয়ে থাকি, তবে সেটা কোনো আঘাত খেয়ে নয়। ঐ শেকল আর দড়িদড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি করে আমি নিশ্চয়ই জলে পড়ে গিয়েছিলুম, হয়তো মাথাটা শুষ্টু জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিলুম। কেউ যদি আমাকে টেনে না তুলতো তবে আমি দমবন্ধ হয়ে মরেই যেতুম।

কোথায় আছি আমি এখন? বিভীষিকায়? কাপ্তেন আর দুই স্যাঙাতের সঙ্গে আমি একাই কি আছি এই জাহাজে–আমার সঙ্গীরা কেউ এখানে আমার সঙ্গে নেই? তা-ই সম্ভবত ঘটেছে, সম্ভবত কেন, নিশ্চিতই ঘটেছে। জ্ঞান হারাবার আগে কী দেখেছিলুম, আবার তা আমার মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠলো : হার্ট পড়ে আছে বালিয়াড়িতে, রক্তাক্ত, জখম; ওয়েলস পাগলের মতো তার রিভলভার থেকে পর-পর গুলি ছুঁড়ে চলেছে; যে-মুহূর্তে আংটাটা আমার বেটে জড়িয়ে গেছে, সেই মুহূর্তেই শেকলের প্রচণ্ড ধাক্কায় ওয়াকার ছিটকে পড়েছে মটিতে! আমার সম্বন্ধে কী ভাবছে এখন আমার সঙ্গীরা? যে, আমি লেক ইরির জলে তলিয়ে গেছি।

বিভীষিকা এখন কোথায়–কীভাবেই বা কাজ করছে তার এনজিন? সে কি এখন রূপান্তরিত হয়েছে স্বতশ্চল শকটে, পাশের কোনো রাজ্যের রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে? তা যদি হয়, আর আমি যদি অনেক ঘণ্টা অজ্ঞান পড়ে থাকি, তাহলে এই দুর্দান্ত গতিওলা

যান এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে এসেছে। না কি, ডুবোজাহাজ হিশেবে, আমরা অন্যকোনো হ্রদের তলা দিয়ে চলেছি?

না, বিভীষিকা এখন বিশাল-চঞ্চল কোনো জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। আমার এই ছোট্ট ক্যাবিনের গবাক্ষ দিয়ে যখন ঘরের মধ্যে রোদ্দুর এসে পড়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে আমরা জলের তলা দিয়ে চলছি না। এদিকে সবচেয়ে ভালো শানবাঁধানো রাস্তাতেও গাড়িতে করে গেলে যে-রকম ঝাঁকুনি লাগে, সে-রকম কোনো ঝাঁকুনিও লাগছে না। তার মানে বিভীষিকা এখন ডাঙার ওপর দিয়ে যাচ্ছে না।

তবে সে এখন লেক ইরির ওপর দিয়ে চলছে কিনা, সেটা আমার এই চিৎপাত অবস্থায় বোঝা দুষ্কর। কাপ্তেন কি এতক্ষণে ডেট্রয়েট নদীতে এসে পড়েনি, কিংবা সেটা পেরিয়ে লেক হুরনে–কিংবা হয়তো তাকেও পেরিয়ে চলে এসেছে লেক সুপিরিয়রে! বোঝা মুশকিল।

কিন্তু যেখান দিয়েই যাক, আমি ঠিক করলাম সটান ডেকে চলে যাবো। সেখান থেকে আশপাশে তাকিয়ে দেখে হয়তো আন্দাজ করতে পারবো কোথা দিয়ে চলেছি। বাঙ্কটা থেকে কোনোমতে হিঁচড়ে নামালুম নিজেকে, তারপর হাত বাড়িয়ে আমার জামাকাপড় তুলে নিয়ে পোশাক পরে নিলুম। এইটুকু কাজ করতেই কী-রকম হাঁফ ধরে যাচ্ছিলো, বড় ক্লান্ত লাগছে–অথচ এতক্ষণ ঘুমিয়ে বেশ ঝরঝরে লাগারই কথা। তারপর বেরুতে গিয়েই খটকা লাগলো : এই ক্যাবিনে আমায় বন্দী করে রাখা হয়নি তো? বেরুবার রাস্তা তো দেখছি একটা সিঁড়ি, সোজা ছাতে চলে গেছে, ঢাকনা আটকানো হ্যাঁচওয়েতে। আমি

একটু ঠেলা দিতেই ঢাকনাটা উঠে গেলো, আমি ডেকের ওপর আদ্ধেকটা শরীর গলিয়ে দিলুম।

আমার প্রথম চেষ্টা হলো সামনে, পেছনে এবং দু-পাশে তাকিয়ে দেখা। সবখানেই বিশাল-সব ঢেউয়ের পরে ঢেউ! কোত্থাও ডাঙার কোনো নামগন্ধও দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকাশ আর জল–দুয়ে মিলে দূরে দিগন্তের বঙ্কিম রেখা তৈরি করে দিয়েছে।

কোনো বিশাল হ্রদ, না সমুদ্র-তা হয়তো চট করেই বুঝে নিতে পারবো। তীরের মতো ছুটে চলেছে ধাতুর তৈরি এই লম্বা চুরুটটা, গলুই জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে, দু-পাশে ঢেউ উঠছে ক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, আর পিচকিরির ছিটের মতো জল এসে লাগছে আমার গায়ে।

একটু চেখেই দেখলুম ঐ জল। না, লোনা নয়, মিষ্টি জল, সম্ভবত লেক ইরিরই জল। সূর্য মধ্যগগনের পথে আধরাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে, তার মানে সবশুদ্ধু হয়তো সাত আট ঘণ্টা কেটেছে আমার ঐ অজ্ঞান অবস্থায়, সেইসময়েই ব্ল্যাক রক ক্রীক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলো বিভীষিকা।

আজ তাহলে নতুন দিন, একত্রিশে জুলাই।

লেক ইরি প্রায় আড়াইশো মাইল লম্বা আর পঞ্চাশ মাইল চওড়া। আমি যে আশপাশে কোথাও ডাঙা দেখছি না, তাতে তাই অবাক হবার কিছু নেই–দক্ষিণপূবে না দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমি, না-দেখা যাচ্ছে উত্তরপশ্চিমে ক্যানাডার জমি।

ডেকের ওপর এখন দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, একজন গলুইয়ের কাছে, তাকিয়ে দেখছে দূরে; অন্যজন হালের কাছে, দিক ঠিক রাখছে জলযানের; সূর্যের অবস্থা দেখে। আমার মনে হলো বিভীষিকা এখন উত্তরপুবদিকে চলেছে। গলুইয়ের কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে আমি চিনি, তাকেই আমি দেখেছিলুম ব্ল্যাক রকের নয়ানজুলিতে, সেই ওয়াশিংটনে আমার বাড়ির ওপর নজর রেখেছিলো। দ্বিতীয়জন তার সেই সঙ্গী, যার হাতে লণ্ঠন ছিলো। এরা যাকে কাপ্তেন বলে ডাকছিলো তাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে মিথ্যেই আমি আশপাশে তাকালুম–তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

এই দুর্ধর্ষ যানটার বাহাদুর নির্মাতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে আমি যে কী-রকম অধীর হয়ে পড়েছিলুম, তা নিশ্চয়ই না-বললেও চলে। কী-যে আশ্চর্য প্রতিভা সে, সারা পৃথিবীটাকেই সে চমকে দিয়েছে;-দুঃসাহসী, বেপরোয়া, স্পর্ধায় গরীয়ান–সারা জগতের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে সে পেছ-পা হয়নি, যে কিনা নিজেকে বলে নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু–দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড!

গলুইয়ের কাছে যে-লোকটা দাঁড়িয়েছিলো, আমি তার দিকে এগিয়ে গেলুম। কাপ্তেন কোথায়?

সে যেন অর্ধনিমীলিত স্তিমিত নয়নে আমার দিকে তাকালে, যেন আমার কথা সে আদপেই বুঝতে পারেনি। অথচ কাল রাতে আমি নিজের কানে শুনেছি, সে ইংরেজি বলতে পারে। তাছাড়া, আমি যে আমার ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসেছি তা দেখে সে মোটেই অবাক হয়নি। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার অনিমেষ লোচনে দিগন্তের দিকে তকিয়ে রইলো।

আমি হালের দিকে এগিয়ে গেলুম। এই লোকটাকেই না-হয় কাপ্তেনের কথা জিগেস করবো। কিন্তু তার দিকে দু-পা এগুতেই সে তার হাত নেড়ে আমাকে সরে যেতে বললে। তার কাছ থেকেও আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

তাহলে এখন আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই দুর্ধর্ষ যানটাকেই শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারি, যার ওপর থেকে আমাদের তাগ করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো, যখন আমরা তার দড়িদড়া ধরে প্রবল বেগে টান দিয়েছিলুম।

আমি তাই এই যন্ত্রটাকে কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, তা-ই সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কোথায় চলেছে এই বিভীষিকা, আমাকে নিয়ে? ডেক আর তার ওপরের সবকিছু এমন-এক ধাতু দিয়ে তৈরি, যেটা আমি চিনতে পারলুম না কিছুতেই। ডেকের ঠিক মাঝখানটায় আদ্ধেক-ওঠানো রয়েছে একটা মস্ত ঢাকনা, তার তলায় ছোটো একটা ঘর, তাতে কতরকম কলকজা বসানো, সেখানে এনজিন অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে, প্রায় নিঃশব্দেই। আগেই যেমন বলেছি, কোনো মাস্তুল নেই, দড়িদড়া বাঁধবার কোনো খুঁটি বা চাকা নেই! এমনকী গলুইয়ের কাছেই ঝাণ্ডা পোঁতবার কোনো খুঁটি নেই। গলুই থেকে বরং দেখা যাচ্ছে একটা পেরিস্কোপের চোখের ওপরটা–তার মধ্য দিয়ে তাকিয়েই নিশ্চয়ই জলের তলা দিয়ে চালানো হয় বিভীষিকাকে। দু-পাশে রয়েছে, ভাঁজ করা, দুটো গ্যাঙওয়েের মতো দেখতে, হালকা ধাতুর পাত, যেমন দেখা যায় কোনো কোনো ওলন্দাজ জাহাজে। এ-দুটো যে কী কাজে লাগে, তা আমার মাথায় ঢুকলো না। গলুইয়ের কাছে তৃতীয় একটা হ্যাচওয়েের ঢাকনা ওঠানো-বিভীষিকা যখন বিশ্রাম করে, তখন এই লোক দুটো নিশ্চয়ই ঐ ঘরে নেমে গিয়ে ঘুমোয়।

হালের কাছে আরেকটা ঢাকনা–এখন নামানো রয়েছে। সেটা সম্ভবত কাপ্তেনের ক্যাবিনে যাবার দরজা-তাকে অবিশ্যি এখনও চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য–বা দুর্ভাগ্য–আমার হলো না। এই বিভিন্ন ঢাকনাগুলো যখন নামানো থাকে, তাদের ওপর পরানো হয় রবারের খোলশ, তাতে সবটাই জলহাওয়ানিরোধ করে শক্ত হয়ে এঁটে যায়, যাতে সমুদ্রের তলা দিয়ে যাবার সময় ভেতরে জল ঢুকে যেতে না-পারে।

আর মোটরটা? যেটা এই যন্ত্রটাকে এমন দুরন্ত গতি দেয়, আমি তার কিছুই দেখতে পেলুম না, এমনকী প্রপেলারও না। এই ক্ষিপ্রবেগে ছুটে-জলা জলযান এখন পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে দীর্ঘমসৃণ ফেনিল জলের স্রোত। যানটার পাশগুলো এমন মসৃণ। যে প্রায় কোনো ঢেউই তৈরি করে না, শুধু হালকাভাবে তরতর করে এমনকী খ্যাপা ঢেউয়ের পিঠে চড়েও এগিয়ে যেতে সাহস করে।

আগেই আমরা জেনেছি, যে-শক্তি এ-যন্ত্রটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় সেটা বাষ্পও নয় গ্যাসোলিনও নয়, কিংবা এমন-কোনো তরল পদার্থ নয় যার গন্ধ থেকে সেটাকে শনাক্ত করতে পারা যায়–সাধারণত যে-ধরনের তরল পদার্থের সাহায্যে কোনো স্বতশ্চল শকট বা ডুবোজাহাজ চলে। সন্দেহ নেই, যে, এখানে যে-শক্তি ব্যবহার করা হয় তা বিদ্যুৎ-রাশি-রাশি জ্বালানি থেকে, না কি সঞ্চয়কোষ থেকে, ব্যাটারি থেকে? কিছু এ সব জ্বালানি কোন অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে? এ-সব ব্যাটারি চার্জ করে কীভাবে? যদিনা বিদ্যুৎ সরাসরি টেনে-আনা হয় আশপাশের হাওয়া বা জল থেকে–এমন-কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে যার কথা কারুরই জানা নেই। আর আমি মনে-মনে ভেবে নিলুম একবার : একবার যখন এই

জাহাজে এসে উঠেছি তখন কি এ-সব রহস্য জেনে নেবার কোন সুযোগই আমি পাবো না?

তারপরেই মনে পড়ে গেলো আমার সঙ্গীসাথীদের কথা, যাদের ব্ল্যাক রক ক্রীকের তীরে ফেলে রেখে এসেছি। আমি তো জানি, একজন জখম হয়ে পড়ে ছিলো; হয়তো অন্যরাও শেষে আহত হয়েছে। আমাকে জাহাজের কাছি টেনে নিয়ে জলে নিয়ে ফেলেছিলো–তা-ই দেখে এটা কি তারা ভেবে নিতে পারবে যে অবশেষে বিভীষিকাই আমাকে সলিলসমাধি থেকে উদ্ধার করেছে? না নিশ্চয়ই। সন্দেহ নেই, আমার অপঘাত মৃত্যুর কথা টলেডো থেকে টেলিগ্রাম করে মিস্টার ওয়ার্ডকে এতক্ষণে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তাহলে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর বিরুদ্ধে কে আর নতুন অভিযানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে? ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে যখন কাপ্তেনের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছি তখন এইসব ভাবনাই আমাকে কুরে-কুরে খাচ্ছিলো। কিন্তু কাপ্তেনের কোনো পাত্তাই নেই।

এদিকে আবার প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে : সম্ভবত গত চব্বিশ ঘণ্টায় পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি। বনের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে সেই-যে একটু নাস্তা খেয়েছিলাম, তারপর আর-কিছুই খাইনি।আর যদি তা কাল সন্ধের সময় হয়ে থাকে, তাহলেও অনেকটা সময় গেছে উপোশ করে। আর এখন আমার জঠরটা যেভাবে মোচড় দিচ্ছে, তাতে এমনটা হওয়াও বিচিত্র নয় যে আমাকে দু-দিন আগে টেনে তোলা হয়েছিলো বিভীষিকায় কিংবা হয়তো তারও আগে।

তারা কি আমাকে ক্ষুন্নিবৃত্তির সুযোগ দেবে, কেমন করেই বা খাওয়াবে আমায়–এই প্রশ্নের সদুত্তরটা কিন্তু তক্ষুনি মিলে গেলো। গলুইয়ের লোকটা তার পাহারার জায়গা

ছেড়ে চলে গেলো, ঢাকনা তুলে নিচে নেমে গেলো কোথাও, এবং পরক্ষণেই ফিরে এলো আবার। তারপর, মুখে একটি কথাও না-বলে, সে আমার সামনে এসে কিছু খাবার রেখে দিয়ে ফের গলুইতে তার পাহারায় চলে গেলো। একটা পাত্রে কিছু মাংস, জারানো শুঁটকি মাছ, বিস্কুট আর এক পাত্র বিয়ার–যেটা এতই কড়া যে আমাকে তার সঙ্গে খানিকটা জল মিশিয়ে নিয়ে হালকা করে নিতে হলো। এই সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের প্রতি যথেষ্ট সুবিচারই করেছিলুম আমি। আমি ক্যাবিন থেকে বেরুবার আগে আমার সহযাত্রীরা নিশ্চয়ই খেয়ে নিয়েছিলো, তাই তারা আমার সঙ্গে ভোজে বসেনি।

ডেকের ওপর আর-কিছুই তেমনভাবে কৌতূহলযোগ্য বলে মনে হলো না। আমি বরং আবার আমার উত্তেজিত ভাবনাগুলোর মধ্যে তলিয়ে গেলুম। এই অ্যাডভেনচারের শেষ পরিণাম কী হবে? এই অদৃশ্য কাপ্তেনকে কি আমি চাক্ষুষ দেখতে পাবো কখনও? সে কি আমাকে ছেড়ে দেবে, মুক্তি দেবে? সে না-দিলেও, আমি কি নিজের চেষ্টাতেই। মুক্তি পেতে পারবো? সেটা অবশ্য নির্ভর করবে, পরিস্থিতি কতটা ঘোরালো হয়ে ওঠে, তার ওপর। কিন্তু বিভীষিকা যদি তীর থেকে এতখানি দূর দিয়েই চলতে থাকে, কিংবা কখনও ঠিক করে নেয় যে জলের তলা দিয়েই যাবে বাকি পথ, তাহলে এখান থেকে আমি পালাবো কী করে? যতক্ষণ-না ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুই, আর এই যান রূপান্তরিত হয়ে যায় স্বতশ্চল শকটে, ততক্ষণ কি পালিয়ে যাবার সব আশা আমাকে ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে হতাশ বসে থাকতে হবে?

তাছাড়া, এটাই বা কবুল করবো না কেন? বিভীষিকার গোপন কথা কিছুই না। জেনে শুধু প্রাণটা বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে যাওয়া–তাতে সবসময়েই আমার মনটা খচখচ করবে। যদিও আমার এই অভিযানের এই দশার জন্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করার

কোনোই কারণ নেই, যদিও প্রায় এক চুলের জন্যে প্রাণে-মরা থেকে আমি বেঁচে গিয়েছি, আর যদিও ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে আরো-সমস্ত ভয়াবহ অলুক্ষুনে বিপদে ভরপুর–তবু, মানতেই হয় যে, কোনোরকমে তো এক-পা এগুনো গেছে। সত্যি-যে এখানে এ-অবস্থায় থাকলে, জগতের সঙ্গে আর-কোনোদিনই আমি কোনো যোগাযোগ করতে পারবো না, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড যেমন স্বেচ্ছায় নিজেকে আইনকানুনের পরপারে স্থাপন করেছে, আমি স্বেচ্ছায় না-হোক দৈববশেই পড়ে আছি মনুষ্যজাতির নাগালের বাইরে–তা যদি না-হতো, আমি যে অন্তত বিভীষিকায় এসে উঠেছি, এই তথ্যটাকেও লোকে মূল্যবান বলে গণ্য করতো।

এই জলযান তেমনি সমানে একটানা উত্তর পুবদিকে চলেছে, লেক ইরির সবচেয়ে দীর্ঘ অক্ষটাকেই বেছে নিয়ে অর্ধগতিতে ছুটেছে । তার যে তেমন তাড়া দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো এইজন্যেই সে সবকিছু ঠিকঠাক সারাই করিয়ে নিতে পারেনি, না-হলে এতক্ষণে তো তার হ্রদটার উত্তরপুর সীমান্তেই পৌঁছে যাবার কথা।

এদিকটায় নায়াগ্রা নদী ছাড়া লেক ইরি থেকে বাইরে বেরুবার আর-কোনো রাস্ত নেই। নায়াগ্রা মারফৎই তার জল গিয়ে পড়ে লেক অন্টারিওতে। বাফেলো থেকে মাইল পনেরো দূরে এই নদী একটা প্রচণ্ড প্রপাতের আকারে নদীতে গিয়ে পড়েছে। বিভীষিকা যেহেতু ডেট্রয়েট নদীতে পেছিয়ে আসেনি, যা দিয়ে সে ওপরের হ্রদগুলো থেকে এখানে এসে নেমেছিলো, কেমন করে তবে সে এই জলপ্রপাত থেকে রেহাই পাবে–যদি না অবশ্য শেষ মুহূর্তে সে ঠিক করে নেয় যে সে ডাঙা দিয়েই বাকি পথটা পেরুবে?

সূর্য এতক্ষণে মধ্যগগন পেরিয়ে গেছে। চমৎকার টলটলে একটা দিন, উষ্ণ–তবে গরম নয়, কারণ একটা মৃদু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হ্রদের ওপর। হ্রদের দু-তীর এখনও অগোচর : না দেখা যাচ্ছে মার্কিন তীর, না-বা ক্যানাডার সীমান্তরেখা।

কাপ্তেন কি মনে-মনে ঠিক করেই ফেলেছে আমার কাছে সে দেখা দেবে না? নিজেকে এ-রকম গোপন করে রাখবার বিশেষ-কোনো কারণ আছে কি তার? তার এই সতর্কতা দেখে মনে হয় সে হয়তো আমাকে সন্ধের সময় ছেড়ে দেবে–তখন। বিভীষিকা সকলের অগোচরে তীরের কাছে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে।

দুটো নাগাদ–অবশ্য–ছোট্ট একটা আওয়াজ শুনতে পেলুম, দেখলুম মাঝখানের হ্যাঁচওয়ের ঢাকনাটা উঠে আসছে। যে-লোকটাকে চাক্ষুষ একবার দেখবার জন্যে আমি এমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম, এতক্ষণে সে ডেকে এসে দাঁড়ালে।

কবুল করতেই হবে তার স্যাঙাত্র যেমন আমাকে কোনো পাত্তাই দেয়নি, সেও আমাকে তেমনিভাবেই কোনো পাত্তা দিলে না। হালের কাছে গিয়ে সে নিজেই এখন হালের চাকা ধরে বসলো। যে-লোকটাকে সে ছুটি দিলে তার সঙ্গে নিচু গলায় কী একটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করলে সে;লোকটা তারপর সামনের হ্যাঁচওয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেলো। কাপ্তেন, দিগন্তের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, কম্পাসটা লক্ষ করলে, তারপর জাহাজের মুখটা একটু বদলে দিলে। বিভীষিকার গতি ক্রমশ বেড়ে উঠলো।

কাপ্তেনের বয়েস সম্ভবত পঞ্চাশের ওপর। মাঝারি উচ্চতা, বৃষস্কন্ধ, মেরুদণ্ড সোজা; প্রকাণ্ড মাথা, কঁকড়া-ঝাকড়া চুল, শাদা নয়–ছাইরঙা, মসৃণ কামানো গাল, আর ছোট্ট

একটুকু মুচমুচে দাড়ি। বিশাল চওড়া বুক, চোয়াল চোখা বেরিয়ে আছে, আর সারা শরীরটাতেই যেন টগবগ করে ফুটছে সুস্বাস্থ্য, ঝোঁপের মতো জোড়া ভুরু। যেন ইস্পাতে-গড়া তার কাঠামোটা, চমৎকার স্বাস্থ্যের দীপ্তি, আর তার রোদে-পোড়া চামড়ার নিচে উষ্ণ লাল রক্ত যেন ফুটছে। সঙ্গীদের মতো, কাপ্তেনও পরে আছে নাবিকের পোশাক, তার ওপরে চাপানো অয়েলক্লথের কামিজ, মাথায় একটা পশমি টুপি-ইচ্ছে করলে সে-টুপি হয়তো নাকের ডগা অব্দি নামিয়ে-আনা যায়।

এটা কি এখন বলে দেয়া উচিত, যে, লং স্ট্রিটে আমরা বাড়ির ওপর কিছুদিন আগে যে-দুজন তোক নজর রাখছিলো, এই কাপ্তেন ছিলো দুজনেরই একজন। তাছাড়া, আমি যদি তাকে চিনতে পেরে থাকি, তবে সেও নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে যে আমিই হলুম চীফ-ইন্সপেক্টর স্ট্রক, যার ওপর ভার পড়েছিলো গ্রেট আইরির রহস্যভেদ করার!

প্রগাঢ় কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকালুম আমি। সে যদিও চোখ সরিয়ে নেয়নি, তবু তার জাহাজে যে একজন বাইরের লোক আছে সে-সম্বন্ধে তার চোখেমুখে একটা পরম ঔদাসীন্যের–না কি তাচ্ছিল্যের–ভাব। তাকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হলো–না, ওয়াশিংটনে তাকে যে আগে বাড়ির সামনে দেখেছি, তা নয়–এর আগে কোথাও যেন এই চেহারা আমি আগেই দেখেছি। পুলিশের দফতরে যেসব ফোটোগ্রাফ আছে, তাদের মধ্যে কি? না কি তার ছবি দেখেছি আমি কোনো দোকানের জানলায়? আবছা যেন মনে পড়তে চাচ্ছে কোথায় এই মুখ আগে দেখেছি, অথচ ঠিক ধরতে পারছি না। হয়তো সবই আমার মনের ভুল।

তার স্যাঙারা অবশ্য আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কোনো ভদ্রতা দেখায়নি, কিন্তু এর ব্যবহার হয়তো তাদের চেয়ে সভ্য ও শালীন হতে পারে। আমারই ভাষায় সে কথা বলে, যদিও সে কোনো মার্কিন কিনা সেটা ঠিক করে বলা মুশকিল। সে হয়তো আমার কথা বুঝতে না-পারার ভান করবে যাতে আমি যতক্ষণ তার বিভীষিকায় কয়েদ হয়ে আছি ততক্ষণ আমার সঙ্গে তার কোনো কথাবার্তা না-হয়।

তা যদি হয়, তবে সে আমাকে নিয়ে কী করতে চাচ্ছে? সে কি কোনো ভদ্রতার বালাই না-রেখেই আমার একটা সগতি করে ফেলতে চাচ্ছে? না কি সে অপেক্ষা করছে কখন রাত নামে–তারপর আমাকে নামিয়ে দেবে জাহাজ থেকে? না কি তার সম্বন্ধে অল্প যা-কিছু আমি জেনেছি–সামান্যই–তা-ই আমাকে তার কাছে এতটা বিপজ্জনক করে তুলেছে যে আমাকে খতম করে না-ফেলে তার কোনো স্বস্তি হবে না? কিন্তু তা-ই যদি তার ইচ্ছে ছিলো, তবে জল থেকে তুলে আমাকে না-বাঁচালেও তো পারতো। আবার ফিরে-একবার আমাকে জলে ডুবিয়ে মারার হাত থেকে নিজেকে তাহলে বাঁচাতে পারতো সে।

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে, সোজা হালের দিকে এগিয়ে গিয়ে, ঠিক তার মুখোমুখি দাঁড়ালুম। তখন, অবশেষে, আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে না-তাকিয়ে সে পারলে না–কিন্তু তার চোখ দুটো যেন দপদপ করে জ্বলছিলো।

আপনিই এ-জাহাজের কাপ্তেন? আমি তাকে শুধোলুম।

তার মুখে টু শব্দটি নেই।

এই জাহাজ! এ কি সত্যি বিভীষিকা জাহাজ?

এই প্রশ্নের উত্তরে তার কাছ থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না। তারপর আমি তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়লুম, হয়তো তার হাতটা ধরতুম, কিন্তু গায়ের জোর–দেখিয়েই সে আমার হাতটা সরিয়ে দিলে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিলো তার ঐ ভঙ্গিটার আড়ালে কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি।

আবার তার সামনে নিজেকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে, আমি অপেক্ষাকৃত জোর গলায় জানতে চাইলাম : আমাকে নিয়ে আপনি কী করবেন বলে ভাবছেন?

তার মুখ থেকে যেন একরাশ কথা ফুটে বেরুতে গিয়েও থমকে গেলো, অনেক কষ্টে নিজেকে সে দমন করলে–কথা বলবে না। মুখটা সে একপাশে ফিরিয়ে নিলে। তার হাত সামনের যন্ত্রটার কী-একটা বোতামে চাপ দিলে, অমনি দুম করে বিভীষিকার গতি বিষম বেড়ে গেলো।

রাগে আমার পা থেকে মাথা অব্দি জ্বলে যাচ্ছিলো। চেঁচিয়ে বলতে চাচ্ছিলুম : ঠিক আছে! তা-ই হোক তবে! পুষে রাখো তোমার ঐ স্তব্ধতা! আমি জানি তুমি কে –যেমন জানি তোমার এই যন্ত্রটাকেও-লোকে যাকে দেখেছে ম্যাডিসনে, বস্টনে, লেক কিরডালে। হ্যাঁ, তুমি, তুমিই–যে-তুমি অমন খ্যাপার মতো ঝড়ের বেগে ছুটে গেছো আমাদের জলে-ডাঙায়! তোমার এই জাহাজের নাম বিভীষিকা, তুমিই তার মালিক, তুমিই সরকারকে অমন স্পর্ধিত চিঠি লিখেছিলে! তুমি ভেবেছো তোমার এই দুর্বারগতি বিভীষিকা নিয়ে আস্ত জগৎটার সঙ্গে লড়বে! নিজেকে তুমি কি না বলে নিখিলের প্রভু, জগতের প্রভু, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড!

আর যদি তা বলতুম, কথাগুলো তবে সে অস্বীকার করতো কী করে! কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়ে গেছে সারেঙের ঢাকার গায়ে লেখা

আদ্যক্ষরগুলো : মা, আ, ও.!

ভাগ্যিশ আমি নিজেকে সংযতই রেখেছিলুম; আর, কোনো কথারই কোনো উত্তর পাবো না বুঝতে পেরে, নিরাশ, ভগ্নোদ্যম, আমি ফিরে এলুম আমার ক্যাবিনে যাবার হ্যাঁচওয়েটার পাশের আসনে।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে, দীর্ঘ সুদীর্ঘ সব ঘণ্টা, বিলম্বিত সব প্রহর, আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম দিগন্তের দিকে–কখন ডাঙা চোখে পড়ে। হ্যাঁ, বসে-বসে অপেক্ষাই করছিলুম ডাঙার জন্যে। কেননা হ্রস্বীভূত হতে-হতে এখন আমি তা-ই হয়ে উঠেছি : মনুষ্যদেহের মধ্যে জলজ্যান্ত এক প্রতীক্ষা! দিন শেষ হবার আগে, বিভীষিকা যে লেক ইরির শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই–কেননা সে সামনে, একটানা, সেই উত্তরপুবদিকেই চলেছে।

.

১৪. প্রপাতের নাম নায়াগ্রা

ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো অথচ পরিস্থিতিতে একফোঁটাও বদল নেই। অন্য স্যাঙাত্রা আবার ফিরে এসেছে ডেকে, আর কাপ্তেন, নেমে গিয়ে, এনজিনের কলকজা নিয়ে কী সব খুটখাট শুরু করেছে। গতি-বেড়ে-যাওয়া সত্ত্বেও যন্ত্র কিন্তু কোনো আওয়াজ না

করেই নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে–আর কী ছিমছাম মসৃণ সবকিছু। কোথাও একবারও কোনো ছেদ পড়ছে না, সাধারণত যেমন হয় সব মোটরেই, এক-আধবারে হয়তো পিস্টন দু-এক সেকেণ্ড থেমে যায়। আমার মনে হলো, বিভীষিকারযখন একেকটা রূপান্তর হয়, তখন সেটা ঘটায় কোনো রোটারি যন্ত্র। অবশ্য এটা আমার অনুমান, ঠিক করে যাচাই করে নেবার কোনো সুযোগই ছিলো না। এতক্ষণ ধরে একবারও দিক বদলায়নি বিভীষিকা। সারাক্ষণই আমরা শুধু হ্রদের উত্তরপুবদিকে চলেছি–তার মানে বাফেলোর দিকে।

কাপ্তেন যে কেন এই পথেই চলেছে, সেটাই আমি সারাক্ষণ অবাক হয়ে ভেবেছি। সে নিশ্চয়ই বাফেলোতে থামতে চাচ্ছে না, সেখানে তো সারাক্ষণই কত ধরনের নৌকোর ভিড় লেগেই আছে। যদি জলপথেই এই হ্রদ ছেড়ে সে চলে যেতে চায় তাহলে বাকি থাকে শুধু নায়াগ্রা নদী–আর তার জলপ্রপাত এমন-একটা আশ্চর্য যানের পক্ষেও অতিক্রম করা অসম্ভব। বেরুবার আরেকটা রাস্তা ছিলো ডেট্রয়েট নদী, অথচ বিভীষিকা তো সারাক্ষণই তাকে পেছনে ফেলে আসছে।

হয়তো কাপ্তেন আসলে রাত্তিরেরই অপেক্ষা করছে-হয়তো তখন অন্ধকারের গা ঢেকে সকলের অগোচরে জলযানকে স্বতশ্চল শকটে রূপান্তরিত করে শেষে চটপট পাশের রাজ্যগুলো পেরিয়ে যাবে। ডাঙার ওপর দিয়ে যখন যাবে, তখন যদি আমি পালাতে না-পারি, আমার মুক্তি পাবার সব আশাই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

www.bengaliebook.com

এখনও-অব্দি কেউ যা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি, তা হয়তো আমি এর মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলবো–অবশ্য সে যদি তার মধ্যেই আমাকে খতম করে না-ফ্যালে–কেননা তার মঙ্গলের পক্ষে বিপজ্জনক বড্ড-বেশি কথা আমি এর মধ্যেই জেনে। ফেলেছি।

লেক ইরির উত্তরপুর প্রান্তটা আমি ভালোই চিনি, কারণ অনেকবারই নিউইয়র্ক : রাজ্যের অ্যালবানি থেকে বাফেলো অব্দি আমাকে যাতায়াত করতে হয়েছে। তিন বছর আগে, কোনো-একটা পুলিশি তদন্তের কাজে আমাকে নায়াগ্রা নদীর দু-তীর ভালো করে পরীক্ষা করতে হয়েছিলো, জলপ্রপাতের দুই পাশেই, এমনকী সাসপেনশন ব্রিজের ওপরেও। বাফেলো আর ছোট্ট শহর নায়াগ্রা ফল্স-এর মধ্যকার বড়ো দুটি দ্বীপেও আমি গিয়েছি; ভালো করে দেখে এসেছি নেভি আইল্যাণ্ড আর গোট আইল্যাণ্ড–এই দুটো দ্বীপই মার্কিন প্রপাতটিকে ক্যানাডার প্রপাত থেকে আলাদা করে রেখেছে।

ফলে, পালিয়ে যাবার কোনো সুযোগ যদি এসেই পড়ে, একেবারে অচেনা কোনো বিজনবিভুঁয়ে গিয়ে পড়বো না আমি। কিন্তু তেমন-কোনো সুযোগ কি সত্যি আসবে? আর আমার অন্তরের অন্তস্তলেও, আমি কি তা সত্যি-সত্যি কামনা করছি–কিংবা সুযোগ এলে সেটা কি আমি সত্যি গ্রহণ করবো? আর-কোন রহস্য ঘোরপ্যাঁচ তৈরি করে আছে ব্যাপারটায়, যা আমার সৌভাগ্য–না কি সে দুর্ভাগ্যই?–আমাকে এমনভাবে পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলেছে?

নায়াগ্রা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছুবার সত্যি কোনো আশা আছে বলে অবশ্য আমার মনে হয় না। যেখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তাই নেই, সেখানে গিয়ে ঢোকবার মতো দুঃসাহস বিভীষিকার হবে কেন? হয়তো সে হ্রদটার শেষ প্রান্ত অব্দি যাবেই না।

আর এইসব উলটোপালটা ভাবনাই আমার মগজের মধ্যে অনবরত পাক খাচ্ছিলো–আর চোখ দুটো সারাক্ষণ চুম্বকের মতো আটকে ছিলো শূন্য দিগন্তের দিকে। আর সবসময়েই ছিলো নাছোড় একটা প্রশ্ন, যার মীমাংসা আমার জানা নেই। কাপ্তেন কেন নিজে আমাকে অমনভাবে হুমকি দিয়ে চিঠিটা লিখেছিলো? ওয়াশিংটনে আমার বাড়ির ওপর সে নজর রেখেছিলো কেন? সে-কোন বন্ধন তাকে গ্রেট আইরির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে? মাটির তলায় অজানা সুড়ঙ্গের মতো খাল হয়তো আছে লেক কিরডালে, যে-সুড়ঙ্গ দিয়ে সে গিয়ে ঢুকতে পেরেছিলো ঐ হ্রদে, কিন্তু কেমন করে সে গ্রেট আইরির অভেদ্য দুর্গপ্রাকার ভেদ করে ভেতরে ঢুকবে? না, না, সে যতই অদ্ভুতকর্মা মায়াবী পুরুষ হোক না কেন, এটা তার পক্ষেও অসাধ্য।

বিকেল চারটে নাগাদ, বিভীষিকার গতিবেগ দেখে আর যেদিকে চলেছে সেদিকে খেয়াল রেখে, আমি বুঝতে পারলুম আমরা নিশ্চয়ই বাফেলোর কাছে এসে পৌঁছেছি–আর, সত্যিই, প্রায় পনেরো মাইল আগে থাকতেই, দূর থেকে তার তীরের রেখা দেখা যেতে লাগলো। এতটা পথ চলবার সময় দূর থেকে জলে কয়েকটা নৌকো বা স্টীমবোট দেখা গেছে বটে, তবে সেগুলো এত দূর দিয়ে গেছে–কিংবা যদি নাও যেতো, এই কাপ্তেনই ইচ্ছে করে দূরত্ব বজায় রেখে দিতো–যে তাকে এ-সব পোতের সঙ্গে দেখা-হওয়া বলে না। তার ওপর, এই চুরুটের মতো লম্ব বিভীষিকা জলের থেকে বেশি ওপরে থাকে না কখনোই, নিচুই থাকে সে, তাতে এক মাইল দূর থেকে দেখলে সে আছে কি নেই তা-ই হয়তো বোঝা সম্ভব হতো না।

এখন অবশ্য, বাফেলো থেকেও দূরে, তার পরপারে, লেক ইরির শেষ প্রান্তটাকে ঘিরে যে-পাহাড়গুলো আছে সেগুলোকে দেখা যেতে লাগলো। একটা চোঙের মতো যেন, আর তারই মধ্য দিয়ে গিয়ে লেক ইরির জল পড়েছে নায়াগ্রা নদীতে। ডানদিকে উঠে গেছে কতগুলো বালিয়াড়ি, এখানে-সেখানে জড়াজড়ি করে আছে গাছপালা। দূরে, কতগুলো মালবওয়া স্টীমার আর জেলে-নৌকো ভেসে চলেছে। আকাশে কোথাও কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলি, এ-সব স্টিমারের চোঙ দিয়ে সে-সব ধোঁয়া আকাশে উঠছে, তারপরেই হালকা ভেসে যাচ্ছে পূরবৈয়া হাওয়ায়।

এখনও বাফেলোর দিকেই এগিয়ে চলেছে বলে আমাদের কাপ্তেন যে কী ভাবছে, তা-ই বুঝতে পারলুম না। বিচক্ষণতা বলে তার যদি কিছু থেকে থাকে, সে কি তবে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে না? প্রতি মুহূর্তেই আশা করছি, চাকা ঘুরিয়ে সে জলযানের দিক পালটে পশ্চিমমুখো চলে যাবে, আর নয়তো, সে প্রস্তুতি নেবে ভুউশ করে জলের মধ্যে ডুবে যাবার। কিন্তু জাহাজের গলুইটা সারাক্ষণ বাফেলোর দিকে জেদির মতো চালিয়ে সে-যে কী করতে চাচ্ছে, তা-ই বোঝা যাচ্ছিলো না।

অবশেষে–এতক্ষণ যাকে সারেঙ বলে মনে হচ্ছিলো–যার চোখদুটি উত্তরপুবের তীরে চুম্বকের মতো আটকে ছিলো, তার সাথীর দিকে তাকিয়ে কী-একটা ইঙ্গিত করলে। সাথীটি গলুই ছেড়ে সোজা চলে গেলো মধ্যেকার হ্যাঁচওয়ের দিকে আর এনজিন-ঘরে নেমে পড়লো। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কাপ্তেন এসে হাজির হলো ডেকে, আর সারেঙের কাছে গিয়ে নিচু গলায় তার সঙ্গে কী-এক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে পড়লো।

www.bengaliebook.com

সারেঙ, বাফেলোর দিকে হাত বাড়িয়ে, ছোটো-ছোটো দুটি কালো-কালো ফুটকির মতো কী যেন দেখালে-জাহাজ থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে রয়েছে সেই কালো বিন্দুগুলি। কাপ্তেন গভীর মনোনিবেশ সহকারে সেগুলো নিরীক্ষণ করলে, তারপর তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, সে চাকার হাতলের কাছে বসে পড়লো। বিলীষিকাকিন্তু সমানে সামনেই এগিয়ে চললো, তার চলার পথ পালটালো না।

মিনিট পনেরো পরে, আমি দেখতে পেলুম ঐ কালো-কালো ফুটকিগুলো আর কিছু নয়, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি। আস্তে আস্তে সেই ধূম্রকুণ্ডলির তলায় কালো জিনিশগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো, দুটো লম্বা নিচু স্টীমার, বাফেলোর বন্দর থেকে বেরিয়ে তারা দ্রুতবেগে বিভীষিকার দিকে ছুটে আসছে।

আচমকা আমার মনে হলো এই দুটো সেই টরপেডো-ডেস্ট্রয়ার নয় তো, একদিন প্রসঙ্গক্রমে মিস্টার ওয়ার্ড যাদের কথা বলেছিলেন! আরো বলেছিলেন, দরকার মনে হলে, আমি যেন তাদের খবর দিই।

এই ডেস্ট্রয়ারগুলো সর্বাধুনিক কারিগরিবিদ্যার নিদর্শন। এ-দেশে বানানো সবচেয়ে দ্রুতগামী স্টীমবোট। সর্বাধুনিক প্রকৌশলবিদ্যায় তৈরি অতীব-শক্তিশালী এনজিন এদের চালায়। এরা এর মধ্যেই ঘণ্টায় প্রায় তিরিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে। সত্যি-যে, বিভীষিকা আরো-দ্রুততর বেগে যেতে পারে, আর চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরলে সে ভুউশ করে ডুবে গিয়ে সকলের হাত এড়িয়ে যেতে পারে। বিভীষিকাকে যদি আক্রমণ করতেই হয়, তাহলে এই ডেস্ট্রয়ারগুলোকে ডুবোজাহাজও হতে হবে, না হলে সাফল্যের

কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। আর তৎসত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা সমানে সমানে হবে কি না, সে-বিষয়ে আমার সবিশেষ সন্দেহ ছিলো।

তবে হাবভাব দেখে মনে হলো এই দুই ডেস্ট্রয়ারের কম্যাণ্ডারদের নিশ্চয়ই হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে : হয়তো ওয়েলস চটপট টলেডো ফিরে গিয়ে টেলিগ্রাম করে আমাদের হারের কথা জানিয়ে দিয়েছে। এও মনে হলো, এই জাহাজগুলো বুঝি বিভীষিকাকে দেখতেও পেয়েছে, কেননা তারা পুরোদমে বিভীষিকাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে। অথচ বিভীষিকার কাপ্তেন তাদের কোনো পাত্তাই না-দিয়ে সোজা নায়াগ্রা নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে। এ-অবস্থায় এই ডেস্ট্রয়ারগুলো কী করবে? হয়তো তারা এমন। কৌশল করে হ্রদের সেই সরুপথটা আটকে দাঁড়াবে যেখান দিয়ে হ্রদের জল গিয়ে নায়াগ্রায় পড়েছে–যাতে বিভীষিকা কিছুতেই ঐ নদীতে গিয়ে পড়তে না-পারে।

বিভীষিকার কাপ্তেন স্বয়ং এবার হালে বসেছে, সারেঙের চাকায় তার হাত। একজন সাগরেদ লইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে, অন্যজন নিচে এনজিনঘরে। আমাকে কি তাহলে এখন হুকুম করা হবে নিচে আমার ক্যাবিনে চলে যেতে?

সে-রকম কোনো নির্দেশ এলো না দেখে আমি বরং খুব খুশিই হলুম। সত্যি-বলতে, আমাকে এরা কেউই গেননা পাত্তা দিচ্ছিলো না। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিলো, বুঝি আমি কখনও বিভীষিকায় এসে উঠিইনি। সেইজন্যেই আমি মিশ্র মনোভাব নিয়ে সেই ডেস্ট্রয়ার দুটির ধেয়ে-আসা লক্ষ করতে লাগলাম। ঠিক যখন এদের সঙ্গে বিভীষিকার দূরত্ব মাত্র দু-মাইলের মতো, তখন এরা দু-পাশে চলে পেলো, যাতে দু-পাশ থেকে বিভীষিকাকে তাগ করে কামান দাগতে পারে।

আর দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড? তার হাবভাবে প্রচণ্ড একটা তাচ্ছিল্য ফুটে বেরুচ্ছিলো। ভঙ্গিটা এমন, জানেই যে ডেস্ট্রয়ার দুটি তার বিরুদ্ধে কিছু করতে অক্ষম। তাদের গতি যা-ই হোক না কেন, একটা বোতাম টিপলেই সে তাদের পাল্লা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। কিংবা হয়তো ডুবই মারবে হ্রদের জলে, আর কোনো নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই তার আর নাগাল পাবে না জলের তলায়।

পাঁচ মিনিট পরে, ডেস্ট্রয়ার দুটির সঙ্গে দূরত্ব হ্রাস পেয়ে প্রায় একমাইল হয়ে এলো। দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড তাদের আরো এগুতে দিলে। তারপর যখন তারা কাছে এসে পড়েছে, অমনি একটা হাতল ধরে টান দিলে সে। বিভীষিকা প্রায় যেন দ্বিগুণ গতিতে আচমকা হ্রদের জলে লাফিয়ে এগিয়ে গেলো। ডেস্ট্রয়ারগুলোর সঙ্গে সে যেন ছেলেখেলা খেলছে, বেড়াল যেমন করে খেলে ইঁদুরদের সঙ্গে! ভয় পেয়ে কোথায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, তা নয়, সে বরং সোজা আপন খেয়ালখুশি মতো নিজের পথেই চলেছে। কখনও কি সে তার বিষম দম্ভ আর ঔদ্ধত্য দেখিয়ে দুই দুশমনের মাঝখান দিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে? টোপ যেন, লোভ দেখাবে তাদের, তার পেছন নিতে তাতিয়ে দেবে তাদের, তারপর ঘুটঘুঁটে আঁধার রাত নেমে এলে বাধ্য হয়ে নিজে থেকেই। ডেস্ট্রয়ারগুলো এই রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবে!

হ্রদের পাশে বাফেলো নগরী তখন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মস্ত-সব দালানকোঠা দেখতে পাচ্ছি আমি, বড়ো-বড়ো সব বিশাল-উঁচু অট্টালিকা, চার্চগুলোর গম্বুজ, শস্য মাড়াইয়ের কলের চাকা ঘুরে যাচ্ছে অবিরাম। মাত্র চার-পাঁচ মাইল সামনে, উত্তর দিকে, খুলে গিয়েছে নায়াগ্রার নদীর জলপথ।

এই অভিনব পরিস্থিতিতে আমার নিজের কী করা উচিত? যখন ডেস্ট্রয়ারগুলোর সামনে দিয়ে যাবো, আমি বিভীষিকা থেকে লাফিয়ে পড়বো জলে? আমি ভালো সাঁতার জানি, এবং এ-রকম সুযোগ হয়তো আর-কখনোই আসবে না। দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড নিশ্চয়ই থেমে পড়ে আমাকে ফের কয়েদ করবার চেষ্টা করবে না। ডুবসাঁতার দিয়ে গিয়ে আমি কি এদের বন্দুকের গুলিকে এড়িয়ে যেতে পারবো না? ডেস্ট্রয়ারগুলোর খালাশিরা নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পাবে জলে সাঁতার কাটছি, নিশ্চয়ই তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে আমি বিভীষিকায় বন্দী হয়ে আছি। আমাকে উদ্ধার করার জন্যে তারা কি কোনো নৌকো ভাসিয়ে দেবে না?

বিভীষিকা যদি নায়াগ্রা নদীর সরু খাতটায় ঢোকে, আমার পালাবার সম্ভাবনা, অনেকগুণ বেড়ে যাবে। নেভি আইল্যাণ্ডে আমি এমন শক্ত জমির ওপর পা রাখতে পিরবো, যার সব হাল-হদিশ আমার জানা। কিন্তু দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড ঢুকবে এই সরু নদীর খাতে, তাহলে যে বিশাল জলপ্রপাতটা থেকে তাকে নিচে আছড়ে পড়তে হবে! তা নিশ্চয়ই সে করবে না। আমার বরং অপেক্ষা করা উচিত ডেস্ট্রয়ার দুটো কখন সবচেয়ে কাছে আসে।

অথচ তবু আমার এই পালাবার ইচ্ছেটা আদৌ উদগ্র ছিলো না–কেমন-একটা অর্ধমনস্ক ভঙ্গিতেই আমি এ-সব কথা ভাবছিলুম। এই রহস্য ভেদ করার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিতে কোথায় যেন বাধোবাধো ঠেকছিলো। পুলিশের গোয়েন্দা হিশেবে আমার সমস্ত অন্তরাত্মাই যেন পালাবার পরিকল্পনার বিপক্ষে রুখে উঠেছে। যে-লোকটাকে সরকার আইনকানুনের পরপারে বলে ঘোষণা করেছে, সমাজবিরোধী বলে চিহ্নিত করেছে, তাকে

পাকড়ে ধরতে হলে শুধু একটা হাত বাড়ালেই হয়! আমি কি তাকে আমার কবল থেকে পালিয়ে যেতে দেবো? না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করবোই না! অথচ এটাও কি জানি, বিভীষিকা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে, আর কী তোলা আছে আমার কপালে?

সোয়া-ছটা বাজে এখন। ডেস্ট্রয়ারগুলো এমনই পুরোদমে কাছে এগিয়ে আসছে। যে তারা থরথর করে কাঁপছে। সরাসরি সামনে এসে পড়েছে তারা এখন–দুটি ডেস্ট্রয়ার পরস্পরের মধ্যে মাত্র সামান্য দূরত্ব রেখেছে, যাতে মাঝখানে চেপে ধরতে পারে বিভীষিকাকে। আর বিভীষিকা, গতি বাড়াবার কোনো চেষ্টা না-করেই দেখতে পেলে, দু-দিক থেকে দুটো ডেস্ট্রয়ার তাকে কোণঠাশা করে ফেলবার চেষ্টা করছে।

আমি আমার জায়গা থেকে একপাও নড়িনি। গলুইয়ের লোকটা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সারেঙের চাকার সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে কুঞ্চিত জোড়াভুরুর তলায় দপদপ জ্বলন্ত চোখে, অপেক্ষা করে আছে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড। সে হয়তো আস্তিনে লুকিয়ে-রাখা কোনো শেষ চাল চেলে এক্ষুনি এই অনুসরণকারীদের ভড়কে দিয়ে পালিয়ে যাবে!

হঠাৎ, আমাদের বাঁ পাশের ডেস্ট্রয়ারটা থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে একঝলক ধোঁয়া উঠলো। একটা টরপেডো, জল প্রায় ছুঁয়েই, বিভীষিকার সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেলো, ডান পাশের ডেস্ট্রয়ারটার কাছ দিয়ে।

উৎকণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে দেখি উঁচু টঙের ওপর লুকআউটের পাখির খোপ থেকে কে-একজন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আছে বিভীষিকার কাপ্তেনের কাছ থেকে কী ইঙ্গিত আসে।

দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড এমনকী মুখ ঘুরিয়ে সেদিকটায় তাকায়নি পর্যন্ত : তখন তার মুখে যে-তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা আমি দেখেছিলুম, তা আমি জীবনেও ভুলবো না।

আর ঠিক তক্ষুনি, আচমকা এক ধাক্কায় আমাকে আমার ক্যাবিনটার হ্যাঁচওয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হলো, তারপর যেই আমি ক্যাবিনে নেমেছি অমনি ওপরের ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে গেলো। শব্দ শুনে বুঝতে পারলুম, অন্য হ্যাঁচওয়েগুলোও তখন এটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ডেক এখন জল-নিরোধ-করা। কোথায় একটা এনজিনে একটা হালকা ধকধক আওয়াজ হলো, আর অমনি বিভীষিকা ডুবে গেলো জলের তলায়।

আমাদের মাথার ওপর তখনও কামান দাগার আওয়াজ উঠছে। তাদের প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি কানে বাজলো কিছুক্ষণ, তারপর সব স্তব্ধ, চুপচাপ। আমার ক্যাবিনের গবাক্ষটা দিয়ে শুধু ক্ষীণ-একটু আলো ঢুকছে ভেতরে। ডুবোজাহাজ মসৃণ গতিতে পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে জলের তলা দিয়ে। কী দ্রুতবেগে, কী অনায়াসে যে এই রূপান্তর ঘটেছিলো, তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। হয়তো যখন সে স্বতশ্চল শকটে রূপান্তরিত হবে, তখনও বদলটা হবে এমনি ক্ষিপ্র ও আয়াসহীন।

কী করবে এখন দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড? হয়তো ডুবোজাহাজের দিকবদল করবে সে, যদি-না সে ডাঙায় উঠে স্থলপথে রাজ্যের পর রাজ্য পেরিয়ে যেতে চায়। পশ্চিমে । জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে, ডেস্ট্রয়ারগুলোর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে, আবারও হয়তো গিয়ে পড়তে পারে ডেট্রয়েট নদীতে। শুধু হয়তো কামানের পাল্লা থেকে বেরিয়ে আসতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণই আমরা থাকবো জলের তলায়, কিংবা হয়তো ততক্ষণই ডুবে থাকবো, যতক্ষণ-না নেমে আসে রাতের আঁধার।

ভবিতব্য, অবশ্য, এই উত্তেজনায়-ভরা পেছন-ধাওয়ার অন্যরকম উপসংহারই স্থির করে রেখেছিলো। দশ মিনিটও কাটেনি, হঠাৎ মনে হলো ডুবোজাহাজের মধ্যে কী একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। এনজিন-ঘরে দ্রুত কী-সব কথা চালাচালি হচ্ছে। যে এনজিন এতক্ষণ নিঃশব্দে চলছিলো, এখন সেটা বিদঘুঁটে সব ছন্দহারা আওয়াজ করতে শুরু করেছে। কোনো দুর্ঘটনার জন্যে এখন বুঝি ডুবোজাহাজ তবে আবার ভেসে উঠবে জলের ওপর!

আমার ধারণা যে নির্ভুল, তার প্রমাণ হিশেবেই পরক্ষণে আমার ক্যাবিনের আবছায়া ভরে গেলো খটখটে দিনের আলোয়। বিভীষিকা আবার জলের ওপর ভেসে উঠেছে। ডেকের ওপর কাদের যেন পায়ের শব্দ। আবার ঢাকনা খুলে দেয়া হলো হ্যাঁচওয়েগুলোর, এমনকী আমারটার শুদ্ধু। আমি লাফ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে।

দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড আবারও সারেঙের চাকায় দাঁড়িয়ে, অন্য দুজন নিচে এনজিনঘরে ব্যস্তভাবে কী-সব খুটখাট করছে। ডেস্ট্রয়ারগুলো এখনও পেছন ছাড়েনি, তারা সম্ভবত মাত্র সিকি মাইল দূরে, এখন! বিভীষিকাকে দেখে তারা পুরোদমে ছুটে আসছে–আর বিভীষিকা আবারও ছুটে চলেছে নদী-নায়াগ্রার দিকে।

কবুল করি, এই রণকৌশলের মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। যেন একটা কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে বিভীষিকা, কোনো অভাবিত যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে জলের তলা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারছে না সে, ডুবোজাহাজ হিশেবে, আর তার ফেরবার রাস্তা ডেস্ট্রয়ারগুলোর জন্যে রুদ্ধ। তাহলে সে কি এখন ডাঙায় উঠে যেতে চাচ্ছে? আর

তা যদি সে করে, পর-পর যে-সব টেলিগ্রাম চালাচালি হবে সারা মার্কিন মুলুকে, সব রাজ্যে পুলিশ যখন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে, তখন সে তাদের হাত এড়িয়ে কোথায় পালাবে, কোথায় যাবে?

এমনকী মাত্র আধমাইলও আর আমরা এগিয়ে নেই। ডেস্ট্রয়াররা আমাদের পেছনে পুরোদমে ধেয়ে আসছে : এখন সরাসরি আমাদের পেছনে থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের কামান দাগবার মতো অবস্থায় নেই মোটেও। দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড শুধু এই ব্যবধানটুকু বজায় রেখেই খুশি, যদিও ইচ্ছে করলে সে বিভীষিকার গতি আরো বাড়িয়ে দিতে পারতো–তারপর রাত নেমে এলে ডেস্ট্রয়ারগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে তাদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে যেতে পারতো।

এরই মধ্যে আমাদের ডানদিকে বাফেলো হারিয়ে গেছে, আর সন্ধে সাতটার একটু পরই নদী নায়াগ্রার মুখটা আমাদের সামনে খুলে গেলো। যদি সে ওখানে ঢোকে, আর যে ফিরে যেতে পারবে না সেটা জেনেই; তাহলে বুঝতে হবে যে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছে। আর, সত্যি-তো, পাগলই তো সে আসলে, নইলে কেউ নিজেকে অমনভাবে নিখিলের প্রভু জগতের প্রভু বলে ঘোষণা করে? আমি তাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলুম শুধু : শান্ত, উদাসীন, ছন্নছাড়া, একবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে না পর্যন্ত ডেস্ট্রয়ারগুলো এখন কতটা এগিয়ে এসেছে। আমি লোকটাকে যত দেখছি, ততই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি।

হ্রদের এ-প্রান্তটা ফাঁকা, পরিত্যক্ত। আপার-নায়াগ্রার তীরের শহরগুলোতে মালবোঝাই যে-সব স্টীমার যায়, চিরকালই তাদের সংখ্যা কম থাকে, যেহেতু এদিকটায় কোনো

পোত চালানো দারুণ বিপজ্জনক। কাউকে কোথাও চোখে পড়ছে না এখন : এমন কোনো ছোট্ট জেলেডিঙিও এতক্ষণে বিভীষিকার পথে পড়েনি। ডেস্ট্রয়ার দুটোকে অব্দি একটু পরেই থমকে থেমে গিয়ে ভাবতে হবে আর তারা ধাওয়া করে আসবে কি না, যদি আমরা এমন খ্যাপার মতো প্রপাতটার দিকেই এগিয়ে যাই!

আগেই বলেছি, নদী-নায়াগ্রা নিউইয়র্ক রাজ্য আর ক্যানাডার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। চওড়ায় সে মোটমাট হয়তো পৌনে-এক মাইল হবে, যত প্রপাতটার দিকে এগিয়ে যায় ততই সংকীর্ণ হয়ে আসে। লেক ইরি থেকে লেক অনটারিও অব্দি ধরলে তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় পনেরো লিগ, যে বয়ে যায় উত্তরমুখো, যতক্ষণ-না সে লেক। সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন আর ইরির জল লেক অন্টারিওতে ঢেলে দেয়, এই বিশাল হ্রদগুলোর সবচেয়ে পশ্চিমে এই লেক। এই নদীটার ঠিক মাঝখানটায় সেই জগৎবিখ্যাত জলপ্রপাত, দেড়শো ফিট ওপর থেকে নিচে আছড়ে পড়ে জল, গ্যালন-গ্যালন, অনর্গল। কেউ-কেউ একে বলে হর্স ফক্স, কেননা ভেতর দিকে সে ঘোড়ার নালেরই মতো বেঁকে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা তার নাম দিয়েছে জলের বজ্র, আর সত্যি-বলতে বাজ ফাটার মতোই জল আছড়ে পড়ে নিচে, তার উচ্ছ্বাস আর প্রতিধ্বনি শোনা যায় কত-যে মাইল দূর থেকে।

লেক ইরি আর ছোট্ট নায়াগ্রা ফল্স শহরটার মাঝামাঝি নদীর তুলকালাম জলপ্রবাহকে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন করে গেছে দুটি ছোটো দ্বীপ, প্রপাতটার এক লিগ ওপরে আছে নেভি আইল্যাণ্ড, আর গোট আইল্যাণ্ড-যে-অজদ্বীপ আমেরিকা আর ক্যানাডার প্রপাত দুটিকে আলাদা করে রেখেছে। এই দ্বীপের শেষমুখটায় একদা দাঁড়িয়েছিলো টেরাপিন টাওয়ার, যে-স্তম্ভটা দুঃসাহসী মিস্ত্রিরা তৈরি করেছিলো প্রপাতের জল আছড়ে পড়ার ঠিক মুখটাতে। অবিশ্রাম জলের ঘায়ে খয়ে যেতে-যেতে সেই স্তম্ভটা এখন ভেঙে পড়েছে।

ফোর্ট ইরি শহরটা দাঁড়িয়ে আছে ক্যানাডায়, ঠিক নদীর মুখটায়। প্রপাতের ওপরে, তীর ঘেঁসে আরো-দুটি শহর গড়ে উঠেছে, ডান তীরে–শ্লসার, বামতীরে–চিপেওয়া, নেভি আইল্যাণ্ডের দুই পাশে দুই ছোটো শহর। এইখানে এসেই খরস্রোত, সরু-একটা খাল দিয়ে বাঁধা, আরো-প্রচণ্ড বেগে ছুটতে শুরু করে। আর দু-মাইল এগিয়ে গিয়ে জলপ্রপাত হিশেবে দেড়শো ফিট উঁচু থেকে আছড়ে পড়ে।

বিভীষিকা এরই মাঝে ফোর্ট ইরিকে পেরিয়ে গেছে। পশ্চিমে, সূর্য গিয়ে ছুঁয়েছে ক্যানাডার দিগন্ত। ক্ষীণ দেখা যাচ্ছে চাঁদ, জলের ছিটেয় তৈরি বাষ্পের আড়ালে সে দক্ষিণে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর একটি ঘণ্টা পরেই অন্ধকার আমাদের ঢেকে ফেলবে।

ডেস্ট্রয়ারগুলো তাদের চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া ওগরাতে-ওগরাতে একমাইল পেছনে ধেয়ে আসছে। স্পষ্ট, বোঝাই যাচ্ছে, যে বিভীষিকা আর ফিরে যেতে পারবে না। ডেস্ট্রয়ারগুলো তার ফেরবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এটা ঠিক যে, আমি যেমন জানি যে কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন বিভীষিকা এতক্ষণ ধরে জলের ওপরেই থাকতে বাধ্য হয়েছে, সে-কথা ডেস্ট্রয়ার দুটির কম্যাণ্ডাররা জানে না–ফলে তারা জানে না হঠাৎ কখনও বিভীষিকা ভুউশ করে ডুবে যাবে কি না জলে। তারা শুধু শেষ মুহূর্ত অব্দি তাকে ধাওয়া করে আসতে চাচ্ছে।

এই বিপজ্জনক জলের মধ্য দিয়ে তার যেভাবে একগুয়ের মতো এগুচ্ছে, তাতে আমি তাদের তারিফ না-করে পারলুম না। কিন্তু তার চাইতেও আমি তাজ্জব মানছি দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর ধরনধারণ দেখে। আর-তো মাত্রই আধঘণ্টা, তারপরই নায়াগ্রা

জলপ্রপাত। যত মজবুতই হোক না কেন তার এই আশ্চর্য যান, এই বিশাল জলপ্রপাতের বিষম আক্রোশ সে এড়াবে কী করে? একবার যদি এই প্রচণ্ড স্রোত টান মারে বিভীষিকাকে, তাকে বাগে পেয়ে কাবু করে ফ্যালে, তবে তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে দুশো ফিট নিচে আছড়ে ফেলে দেবে। হয়তো এখনও বিভীষিকা ডাঙার গাড়ি হয়ে তীরে নেমে পড়ে স্থলপথে ছুট লাগাবার কথাই ভাবছে।

এই তুলকালাম উত্তেজনার মাঝে, আমি, স্ট্রক, পুলিশের গোয়েন্দা–আমি কী করবো? আমি কি লাফিয়ে নামবো নেভি আইল্যাণ্ডে, যদি আমরা তার ধার ঘেঁসে যাই? এ-সুযোগটা হেলায় হাতছাড়া হতে দিলে আর আমার মুক্তি নেই : বিভীষিকার এত সব রহস্য জেনে যাবার পর দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড কিছুতেই আমায় ছেড়ে দেবে না।

অবশ্য এখন বুঝি আর পালাবার চেষ্টা করার কোনোই মানে হয় না। যদি আমাকে ক্যাবিনে কয়েদ করে রাখা না-হয়ে থাকে, তাহলে আড়চোখে হলেও কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আমার ওপর নজর রাখছে। কাপ্তেন সারেঙের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে গলুইয়ের লোকটা এতক্ষণ একবারও আমার ওপর থেকে তার চোখ সরায়নি। একটু উলটোপালটা নড়লেই আমাকে পাকড়ে তারা ক্যাবিনটায় ঢুকিয়ে দিয়ে বন্দী করে রাখবে। অর্থাৎ, আমার নিয়তি আমাকে এখন বিভীষিকার সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

ডেস্ট্রয়ার দুটির সঙ্গে আমাদের ব্যবধান এখন আরো হ্রাস পেয়েছে। একটু পরেই তারা সম্ভবত দড়িদড়ার নাগালেই এসে পড়বে। যান্ত্রিক গোলযোগের পর থেকে বিভীষিকার

এনজিন কি আর পুরোদমে চলতে পারছে না? কাপ্তেনর চোখেমুখে, অথচ, উদ্বেগের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই–ডাঙায় নামবার কোনো চেষ্টাই সে করছে না।

ডেস্ট্রয়ারগুলোর পুরোদমে-চালানো বাষ্পের এনজিনের হিসহিস শব্দটা অব্দি এখন কানে আসছে, আর চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তার চাইতেও জোরালো হয়ে কানে আসছে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলকালাম গর্জন।

নেভি আইল্যাণ্ড পেরিয়ে যাবার সময় বিভীষিকা নদীটার বাম শাখা বেছে নিলে। এখান থেকে অনায়াসেই ডাঙায় গিয়ে নামা যায়–কিন্তু তবু সে ছুটেই চলেছে সামনে। পাঁচ মিনিট পরে আমরা গোট আইল্যাণ্ডের প্রথম গাছপালাগুলো দেখতে পেলুম। স্রোত ক্রমেই তীব্র, অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। বিভীষিকা যদি না-থামে, ডেস্ট্রয়ারগুলি এখন আর তাকে অনুসরণ করতে পারবে না। বিভীষিকার কাপ্তেন যদি প্রপাতের মরণঘূর্ণির মধ্যে গিয়েই ঝপ খেতে চায়, ডেস্ট্রয়ার দুটি অন্তত সেই বাসনা করবে না। করেওনি–পরক্ষণেই তারা পরস্পরকে সংকেত করে পশ্চাদ্ধাবন থামিয়ে দিলে। প্রপাত থেকে তারা বেশি হলে তখন মাত্র ছশো ফিট দূরে। তারপর যেন বাজ ফেটে পড়লো পর পর, বিভীষিকার গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগলো না, তবু তারা আক্রোশ মেটাবার জন্যে পর-পর কয়েকবার তাকে তাগ করে কামান দাগলে।

সূর্য অস্ত গেছে, প্রদোষের ছায়ান্ধকারে দক্ষিণ থেকে ফুটি-ফুটি করছে চাঁদের আলো। প্রপাতের তুলকালাম স্রোতের টানে বিভীষিকা উম্মত্তের মতো ছুটে চলেছে। পরের মুহূর্তেই নিশ্চয়ই আমরা প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়বো জলের-ছিটে-লাগা কালো শূন্যতায়-

পাতালে। আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখে আমি দেখলাম অজ দ্বীপ বিদ্যুদ্বেগে পেছনে চলে গেলো। তারপরেই এলো তিন বোনের দ্বীপ, পাতালের ফোয়ারায় জলাচ্ছন্ন।

আমি লাফিয়ে উঠে শেষ মরীয়া চেষ্টায় যেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছি, কে যেন পেছন থেকে আমাকে সজোরে জাপটে ধরলে।

আমাদের পোতের মধ্যে এতক্ষণ যে-এনজিনটা দপদপ করছিলো, হঠাৎ তার মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ ধারালো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। বিভীষিকার দু-পাশে গ্যাঙওয়ের মতো ধাতুর যে-ফালি দুটো আটকানো ছিলো, তারা ফরফর করে ছড়িয়ে পড়লো বিশাল দুই পাখনার মতো, আর ঠিক যে-মুহূর্তে বিভীষিকা গিয়ে প্রপাতের মুখটা ছুঁয়েছে, তখনই সে সোজা উঠে পড়লো শূন্যে, আকাশে, চান্দ্র রামধনুর মায়ায় জড়ানো বজ্রগর্জনতোলা প্রপাত থেকে সে এখন উদ্ধার পেয়েছে আকাশে–এখন সে তার একে-তিন-তিনে এক নয়, তার চেয়েও বেশি, চার নম্বর যানও সে, অর্থাৎ উড়োজাহাজ, বিমান!!

.

১৫. ঈগল পাখির বাসা

পরদিন, যখন গভীর একটা ঘুম থেকে আমি উঠলুম, সতেজ, ঝরঝরে, আমাদের যান মনে হচ্ছিলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে ডাঙার ওপর দিয়ে যাচ্ছি না, সেটা অন্তত স্পষ্ট। আর জলের ওপর দিয়ে বা তলা দিয়েই যাচ্ছি না, উড়াল দিচ্ছি না এমনকী সপ্ততল বিমানেও। তবে কি এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারটি তার গোপন আড্ডায় ফিরে

এসেছে–যেখানে তার আগে আর-কোনো মানুষই পা দেয়নি? আর এখন কি তবে তার সব গোপন কথাই আমি জেনে ফেলবো?

এখন ভাবলে তাজ্জব লাগে, যখন আকাশ দিয়ে উড়ে আসছি, তখন সারাটা পথই আমি কি না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি! একটু ভড়কে যাবার মতোই ব্যাপার : আমাকে তারা কোনো ঘুমের ওষুধ খাওয়ায়নি তো? যাতে আমি বুঝে ফেলতে না-পারি কোথায় এসে এই আকাশযান নামলো? শুধু এইটুকু মনে আছে, কাল সন্ধেবেলা যখন বিভীষিকা দু দিকে তার দুই ডানা ছড়িয়ে প্রপাতের ওপর থেকে আকাশে উঠে গিয়েছিলো, তখন আমি কী-রকম স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। না, হতভম্ব নয়, স্তম্ভিত!

তাহলে এই যান একের ভেতরে চার : স্বতশ্চল শকট, জলেভাসা জাহাজ, ডুবোজাহাজ আর আকাশযান–একই সঙ্গে চার রকম! মাটিপৃথিবী, বিশাল জল, সীমাহারা আকাশ-সব সে জয় করেছে। আর কেমন বিদ্যুৎগতিতে সে সম্পন্ন করে এক যান থেকে আরেকরকম যান হয়ে-ওঠা! একই এনজিন চলে জলে, ডাঙায়, অন্তরিক্ষে! আর আমি কিনা সাক্ষী ছিলাম এইসব রূপান্তরের! এখনও সেটা জানি না–ভবিষ্যতে কখনও হয়তো জানতে পারবো–তা হলো এই যানের এই বিপুল শক্তির উৎস কী। আর কেই-বা এই দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক, একা-একা পুরো ব্যাপারটা উদ্ভাবন করে যে বিপুল স্পর্ধায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে সারা জগৎকেই! কী তার স্পর্ধা, কী দুঃসহ তার দন্ড!

বিভীষিকা যখন ক্যানাডার প্রপাতের ওপর থেকে উড়াল দিয়েছিলো, আমাকে তখন আমার ক্যাবিনের হ্যাঁচওয়ের সামনে চেপে ধরে রাখা হয়েছিলো। সন্ধ্যায় ফুট ফুটে স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় আমি এটা অন্তত দেখতে পেয়েছিলুম কোন দিক লক্ষ্য করে বিভীষিকা

আকাশে উড়লো। নদীরই খাত ধরে সে উড়াল দিয়েছিলো, পেরিয়ে গিয়েছিলো সাসপেনশন ব্রিজ, যেখানটায় নায়াগ্রা নদী ক্ষিপ্র একটা মোচড় মেরে নেমে গিয়েছে লেক অন্টারিওর দিকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা

পুবদিকে মোড় ঘুরেছি। কাপ্তেন তেমনি সটান দাঁড়িয়েছিলো সারেঙের চাকা আর হাতলগুলোর সামনে। আমি তার সঙ্গে কোনো কথাই বলবার চেষ্টা করিনি তখন। কী লাভ হতো কিছু জিগেস করে-সে-তো কোনো উত্তরই দিতো না। তখন শুধু এটাই সবিস্ময়ে লক্ষ করেছিলাম বিভীষিকা অনায়াসেই আকাশে উড়ে যেতে পারে–যেন জল বা ডাঙার মতো আকাশের পথগুলোও তার অনেকদিনকার চেনা।

এমন আশ্চর্য একটা যানের উদ্ভাবক কেন-যে নিজেকে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড বলে সেটা আন্দাজ-করা এখন আর মোটেই কঠিন নয়। মানুষের হাতে এ-যাবৎ যত যান রচিত হয়েছে, তাদের সবার চাইতে এটা শতগুণে সেরা।-এর কাছে অন্যসব যান নেহাৎই তুচ্ছ, নগণ্য, সাধারণ! সত্যি-বলতে, তার এই পরম বিস্ময়ের রহস্যটা সে খামকা কাউকে বিক্রিই বা করবে কেন? ঐ দুশো কোটি ডলার তো তার কাছে খোলামকুচির মতোই তুচ্ছ। হ্যাঁ, এখন আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি তার সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের কারণ–যা প্রায় দম্ভের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। যদি তার নিজের উচ্চাশা তাকে উন্মত্ততার ওপারে নিয়ে না-যায়, তবে সে কোথায়-কতদূরে-গিয়েই না পৌঁছুতে পারবে!

বিভীষকা আকাশে ওড়বার আধঘণ্টা পরেই আমি এই গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই–বুঝতেও পারিনি যে ঘুমে দু-চোখের পাতা বুজে আসছে। নিশ্চয়ই কোনো ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে

দেয়া হয়েছিলো আমার খাবারে। নিশ্চয়ই তার ইচ্ছে ছিলো না বিভীষিকা কোনদিকে যায়, সেটা আমি লক্ষ করি।

কাজেই এটা আমি জানি না সে কি বৈমানিকই এতটা পথ পেরিয়েছে, না কি পাগল হে-নাবিক আবার ভেসে পড়েছে জলে, না কি শোফেয়ার তার গাড়ি ছুটিয়েছে আমেরিকার রাস্তায়-রাস্তায়। একত্রিশে জুলাই রাত্রিবেলা সত্যি-যে কী ঘটেছিলো তার কোনো স্মৃতিই আমার নেই।

এখন, এই রগরগে, রোমাঞ্চকর, রুদ্ধশ্বাস অভিযান শেষ হবে কোথায়? আর আমার নিজেরই বা কী হবে?

আগেই বলেছি, ঘুম থেকে জাগবামাত্র আমার মনে হয়েছিলো যে বিভীষিকা কোথাও যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনড়। আমার ভুল হয়নি; তার চলার ধরন যা-ই হোক না কেন, আকাশে বা জলে, সবসময় আমি একটা মৃদু থর্থর কম্পন অনুভব করেছি। এখন সেই কম্পন আর নেই। এখন আমার প্রথম কাজ হলো ডেকে উঠে গিয়ে দেখা আমরা কোথায় আছি। বার্থ থেকে নেমে ক্যাবিনের সিঁড়ি বেয়ে হ্যাঁচওয়ের কাছে গিয়ে দেখি ঢাকনাটা বাইরে থেকে আটকানো। আহা! আমি ভেবেছি, বিভীষিকা ফের তার অস্থির চলা শুরু না-করা অব্দি আমাকে তাহলে এখানেই কয়েদ হয়ে থাকতে হবে! আর বন্দী হয়ে থাকবার কথা ভেবেই আমার কেমন যেন অস্থির লাগলো । উদ্বেগও কম ছিলো না। কী আছে ভবিষ্যতের গর্ভে? কী আমার ভবিতব্য?

জানতে অবশ্য পনেরো মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি। ওপর থেকে হ্যাঁচওয়ের ওপরকার ঢাকনা সরাবার আওয়াজ কানে এলো আমার, পরক্ষণেই ক্যাবিনে এসে ঢুকলো প্রখর একঝলক আলো আর টাটকা হাওয়ার দমক! এক লাফেই আমি ডেকে উঠে এলাম। মুহূর্তের মধ্যে দিগন্ত ঝেঁটিয়ে এলো আমরা দৃষ্টি।

যা ভেবেছি, তা-ই। বিভীষিকা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে নিরেট জমির ওপর। পনেরোশো থেকে আঠারোশো ফিট বেড়-এর একটা পাথুরে নয়ানজুলিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে ছড়িয়ে আছে হলদে খোয়া আর কাকর, কোথাও কোনো উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই।

চারপাশের পাহাড়ের মাঝখানে এটা যেন ডিম্বাকার একটা কোটর-উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত লম্বা। চারপাশে যে-সটান-দাঁড়ানো পাথুরে দেয়াল সেটা কত উঁচু, চূড়াটাই বা কী-রকম, সেটা আমি কোনোভাবেই আন্দাজ করতে পারলুম না। মাথার ওপর ঘন হয়ে জমে আছে নিবিড় কুয়াশা, রোদ্দুরের বর্শাফলকগুলো হাজার চেষ্টা করেও যেন সেই কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে বেরুতে পারছে না। হলুদ বালির মেঝের ওপর পেঁজা-পেঁজা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো এখনও বেশি বেলা হয়নি, পরে কখনও হয়তো এই কুয়াশা কেটে যাবে।

রীতিমতো ঠাণ্ডা পড়েছে এখানে, অথচ আজ কি না পয়লা আগস্ট! তাহলে এই জায়গাটা বুঝি গভীর-উত্তরে কোথাও, সমুদ্রতল থেকে অনেকটাই ওপরে। হয়তো এখনও আমরা আমেরিকারই কোথাও আছি, নতুন মহাদেশেই, কিন্তু ঠিক কোনখানে যে আছি সেটাই আন্দাজ করা মুশকিল।

হঠাৎ দেখতে পেলুম, বিভীষিকার কাপ্তেন নিচে একটা পাথরের খোঁড়লের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে সম্ভবত কোনো সুড়ঙ্গের মধ্য থেকেই, কেননা কুয়াশায় জায়গাটা কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছিলো। মাঝে-মাঝে ওপরে, কুয়াশার পর্দার ওপর, বিশাল সব পাখির ছায়া ভাসে। এই গভীর স্তব্ধতা ছিঁড়ে-ছিড়ে মাঝে-মাঝে শুধু তাদেরই রুক্ষ কর্কশ চীৎকার শোনা যাচ্ছে। কে জানে, এই দুর্ধর্ষ অতিকায় পক্ষীদানবকে দেখে এই বিশাল পাখিগুলো হঠাৎ বিষম আঁৎকে উঠেছে কি না।

সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে তার যাত্রার ফাঁকে-ফাঁকে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড এখানে এসেই আশ্রয় নেয়। এটাই সম্ভবত তার মোটরগাড়ির গ্যারাজ; তার জাহাজের বন্দর; তার আকাশযানের হ্যাঁঙার। আর এখন এই বিশাল পাহাড়ি কোটরের মধ্যে বিভীষিকা দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। অবশেষে এখন আমি ধীরে-সুস্থে যানটাকে খুঁটিয়ে দেখতে পারবো। আর সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে এর মালিকরা আমাকে নিরস্ত করার

কথা আদপেই ভাবছে না। সত্যি-বলতে, বিভীষিকার কাপ্তেন যেন আগের মতোই আমাকে মোটেই আমল দিচ্ছে না। নিচে তার দুই স্যাঙাৎ তার সঙ্গে গিয়ে জুটেছে, তারপরে তিনজনেই ফের সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। যন্ত্রটাকে খুঁটিয়ে দেখবার এটাই সুবর্ণ সুযোগ, অন্তত তার বাইরেটা তো দেখা যাবে! ভেতরে কী-সব কলকজা আছে, খুঁটিয়ে দেখেও আমি তার কতটা কী বুঝতে পারবো কে জানে–হয়তো নিছক কতগুলো জল্পনা করাই সার হবে।

দেখতে পেলুম, আমার ক্যাবিনের হ্যাঁচওয়ে ছাড়া আর-সবগুলো হ্যাঁচওয়েই কুলুপ দিয়ে কষে আটকানো, আমার পক্ষে সেগুলো খোলবার চেষ্টা করা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হবে! তার

চেয়ে বরং এটা দেখাই লাভজনক হবে আমার পক্ষে-বিভীষিকাকে তার বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সে-কোন প্রপেলার চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

আমি এক লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়লুম। কেউ কোথাও বাধা দেবার নেই–ফলে ধীরে-সুস্থেই দেখা যাবে সব।

যানটা–আগেই বলেছি–একটা টকুর মতো দেখতে। পুচ্ছের দিকটার চাইতে গলুইটা অনেক-বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে। যানটা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বানানো, কিন্তু পাখনা দুটো যে কোন ধাতুতে তৈরি, সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারলুম না। যানটা চারটে চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে–একেকটা চাকার বেড় হবে প্রায় দু-ফিট। সেগুলোর গায়ে এমন পুরু টায়ার পরানো যে যে-কোনো বেগেই তারা অনায়াসে চলতে পারবে। চাকার একেকটা শিক অক্ষের গায়ে পরানো, সেগুলো দেখতে জেলেডিঙির বৈঠার মতো; জলে কিংবা ডাঙায়–যখনই বিভীষিকা ছোটে সেগুলো চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে নিশ্চয়ই তার গতি বাড়িয়ে দেয়। তবে এই চাকাগুলো কিন্তু যানটার প্রধান প্রপেলার নয়। চালক পাখাগুলো আসলে দুটো বড়ো-বড়ো টারবাইন, যানটার তলির দু-দিকে বসানো। এনজিন চালিয়ে দিলে তীব্রবেগে এরা ঘুরতে থাকে, আর তার দুই পাঁচ-দিয়ে বসানো চাকা তাকে জলের মধ্যে দিয়ে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, সম্ভবত এরাই হাওয়াতেও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, এত জোরে ওরা নিজের অক্ষের ওপর পাক খেতে থাকে। আকাশে চলবার প্রধান সহায় অবশ্য ঐ দুই বিশাল পাখা, এখন যারা আবার গ্যাঙওয়েয়ের মতো দু-পাশে ভাজ করে গুটিয়ে রাখা। কাজেই বাতাসের চাইতেও ভারি উড়নযানের তত্ত্বটাকেই ব্যবহার করেছে আবিষ্কারক, এমন-এক ব্যবস্থা এটা যে দ্রুততম পাখির চাইতেও ক্ষিপ্রবেগে এটা আকাশে ভেসে যেতে পারে। তবে, সে-কোন শক্তি, যা দিয়ে এই ভিন্ন-

ভিন্ন কলকজা চলে, তা, আবারও আমার মনে হলো, তড়িৎপ্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে-কোন উৎস থেকে এই তড়িৎকোষগুলো তাদের শক্তি পায়, ফিরে ফিরে তাদের চার্জ করা যায়, তা আমি বুঝতে পারলাম না। কোথাও কি তবে তার কোনো বিদ্যুৎতৈরির কেন্দ্র আছে–যেখানে তাকে বারেবারে ফিরে আসতে হয়? এই পাহাড়ি কোটরটার কোনো খোঁদলে এখনও কি তার ডায়নামোগুলো গুঞ্জন করে চলেছে?

যন্ত্রটা যে চাকা আর টারবাইনের স্ক্রু আর পাখা ব্যবহার করে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি-কিন্তু তার এনজিনটা কেমন দেখতে অথবা সে-কোন তুমুল শক্তি তাকে চালায়, তার কিছুই আমি এতক্ষণেও জানতে পারিনি। তবে জানলেই বা কী হতো? এই জ্ঞান ধুয়ে আমি কোন জীবনদায়ী জল পান করতুম? কিছু করতে হলে আমাকে তো আগে এখান থেকে–অথবা এদের খপ্পর থেকে পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যতটুকু আমি এতক্ষণে জেনেছি, তা যতই তুচ্ছ বা নগণ্য হোক না কেন, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড তারপরে কিছুতেই আমাকে আর ছেড়ে দেবে না। পালাবার কোনো সুযোগ কি দৈবাৎ, আচমকা, অপ্রস্তুত অবস্থায় এসে হাজির হবে? যতক্ষণ বিভীষিকা অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে, ততক্ষণ তো কোনো সুযোগই পাইনি। এখন, এখানে, তার এই গোপন আড্ডায়, সত্যি কি আমি হঠাৎ পালিয়ে যাবার কোনো সুযোগ পাবো?

এই পার্বত্য কোটরটা ঠিক কোনখানে অবস্থিত, প্রথমে আমাকে সেটাই বার করতে হবে। আশপাশের অঞ্চলের সঙ্গে এখান থেকে যোগাযোগ করারই বা কী উপায়; আছে।–কোন মাধ্যম? এখান থেকে শুধু কি কোনো আকাশযানে করেই বেরুনো যায়? আর মার্কিন মুলুকের সে-কোন অঞ্চলে আমরা আছি–কেউ কি এর কোনো শুলুকসন্ধান জানে? আমি

যখন ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য, তখন বিভীষিকা যে ক-শো লিগ পথ পেরিয়ে এসেছে, তা-ই বা কে জানে?

একটি বিষয় নিয়ে আমার উত্তেজিত মন কিন্তু তখনই জল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছিলো। গ্রেট আইরি ছাড়া আর সে-কোন প্রকৃতিনির্মিত স্বাভাবিক বন্দর আছে বিভীষিকার? আমাদের এই বৈমানিকের পক্ষে কি চূড়া অব্দি উড়ে-আসা খুব কঠিন হবে? ঈগল বা কণ্ডর যেখানে উড়ে বেড়ায়, সেখানে কেন এই বিমান উড়ে যেতে পারবে না? গ্রেট আইরিই কি দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ডকে সেই অনধিগম্য আশ্রয় জোগায়নি, যেটা আমাদের সহস্রচক্ষু পুলিশের সজাগ দৃষ্টিকেও এড়িয়ে গেছে? তাছাড়া, নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে ব্লু রিজ শৈলশ্রেণীর এই অঞ্চলের দূরত্ব বস্তুত সাড়ে-চারশো মাইলের বেশি হবে না–যতটুকু পথ উড়াল দেয়া বিভীষিকার কাছে কিছুই-না।

হ্যাঁ, এই ভাবনাটা ক্রমেই আমাকে দখল করে বসতে লাগলো। অন্যসব অসমর্থিত অনুমানকে এই ভাবনাটা যেন ঝেটিয়ে বার করে দিচ্ছিলো। এতেই কি প্রমাণ হয় না, বিভীষিকার সঙ্গে গ্রেট আইরির কী সম্বন্ধ আর কেন আমি অমন একটা হুমকি দেয়া। চিঠি পেয়েছিলুম? স্পষ্ট শাসানি ছিলো তাতে : আবারও যদি আমি গ্রেট আইরিতে ওঠবার চেষ্টা করি, তবে আমাকে একহাত দেখে নেয়া হবে! সেই জন্যেই কি দিনের পর দিন আমার বাড়ির ওপর নজর রাখা হয়নি? আর গ্রেট আইরির ওপর ঐ অদ্ভুত শিখা, ঐ উৎকট আওয়াজ, ঐ তুলকালাম তুফান-তা কি এই বিভীষিকারই নাটমঞ্চের পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে যায়নি? হ্যাঁ, গ্রেট আইরিই। ঈগল পাখির এই বাসাই বিভীষিকার গোপন আচ্ছা!

কিন্তু একবার যখন বেদম চেষ্টা করেও এখানে ঢুকতে পারিনি, তখন এখান থেকে বেরিয়ে-যাওয়াও কি আমার পক্ষে একেবারে-অসম্ভব হবে না? আহ্, যদি কুয়াশা একবার সরত! হয়তো আমি তাহলে চিনতে পারতুম জায়গাটা। যেটা এখন নিছকই একটা জল্পনা মাত্র, সেটা যথার্থ বলে প্রমাণিত হতো তাহলে!

সে যা-ই হোক, এখানে যখন আমার চলে-ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা আছে, তখন পাহাড়ের মধ্যকার এই কোটরটাকেই না-হয় ভালো করে-তন্ন তন্ন করে–পরীক্ষা করে দেখা যাক। এই ডিম্বাকৃতি বিস্তারের উত্তরদিকের একটা সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকছে তিনজনে। সেইজন্যে আমি আমার অনুসন্ধান শুরু করবো দক্ষিণ দিকে।

পাথুরে দেয়ালটার পাদদেশে গিয়ে, আমি তার গা ঘেঁসে চলতে-চলতে দেখতে পেলুম দেয়ালের গায়ে নানা জায়গায় অনেকগুলো ফাটল গজিয়েছে–কিন্তু তারপরেই আকাশ অব্দি যেন উঠে গেছে নিরেট পাথরের দেয়াল, আলেঘেনিতে যেমনতর পাথর দেখা যায়। কুয়াশা না-সরলে কিছুতেই বোঝা যাবে না এই নিরেট দেয়াল সটান কতটা ওপরে উঠে গিয়েছে। ফাটলগুলো দেখছি মোটেই গভীর নয়–সুড়ঙ্গের মতো দেয়ালের মধ্যে তা ঢুকে পড়েনি। কতগুলো গর্ত মানুষেরই হাতে-ফেলা জঞ্জালে ভর্তি। কাঠকুটো, শুকনো ঘাস। মাটির ওপর কাদের পায়ের ছাপ। সম্ভবত, কাপ্তেন আর তার স্যাঙাৎদের। আমার কারারক্ষকরা এখন নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের মধ্যে মালপত্র জড়ো করে বাণ্ডিল বাঁধতে ব্যস্ত। তারা কি তবে বাণ্ডিলগুলো বিভীষিকায় নিয়ে গিয়ে তুলতে চাচ্ছে? তবে কি তারা চিরস্থায়ীভাবে এই আড্ডা ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে?

আধঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার অনুসন্ধান শেষ করে আবার এই কোটরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালুম। এখানে-সেখানে তূপ হয়ে আছে ছাইভস্ম-জল-হাওয়ার শিকার, বিবর্ণ, রংচটা। পোড়া কাঠ পড়ে আছে, তাদের কারু গায়ে-বা জংধরা লোহার পাত আটকানন, কিংবা মরচে-পড়া আংটা; ধাতুর পাত পড়ে আছে আশপাশে, প্রবল উত্তাপে বেঁকে দুমড়ে-যাওয়া। কোনো জটিল কারখানাকে যেন এখানে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে,অনতিকাল আগে, দাউদাউ করে একদিন আগুন জ্বলেছিলো–ইচ্ছাকৃত, অথবা দৈবাৎ। তারই শিখা নিশ্চয়ই নিচে থেকে দেখেছে ভয়ার্ত মানুষ–প্লেজেন্ট গার্ডেনে, মরগ্যানটনে। কিন্তু সে-কোন যন্ত্রপাতির ধ্বংসাবশেষ এ-সব? কেনই বা এদের ধ্বংস-করা হয়েছে?

সেই মুহূর্তে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেলো–পুবদিক থেকে আসা হাওয়া। আকাশ থেকে হঠে গেলো কুয়াশার আস্তর, দিগন্ত আর মধ্যগগন থেকে ঝলসে নেমেছে সূর্যের আলো, এই কোটরটা আলোয় ফটফটে হয়ে উঠেছে।

আপনা থেকেই আমার মুখ ফুটে একটা অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এলো! পাথুরে দেয়ালের চূড়া উঠে গেছে একশো ফিট ওপরে। পুবদিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শিখরদেশ–উড়াল দিতে উদ্যত একটা ঈগলের মতো দেখতে বিশাল এক পাথরখণ্ড। এই চূড়াটাই মিস্টার এলিয়াস স্মিথ আর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো একদিন, যখন আমরা গ্রেট আইরির বাইরে থেকে তাকিয়েছিলুম চূড়ার দিকে।

আর-কোনো সন্দেহই নেই। রাত্তিরে, তার ঐ উড়ালের সময় আকাশযান লেক ইরি থেকে নর্থ-ক্যারোলাইনার দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছে। এই ঈগল পাখির বাসাতেই আকাশযান তার আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে। এই সেই নীড়, এই আবিষ্কারকের অতিকায় ও বিপুল শক্তিশালী পাখির যোগ্য বাসাই এই ব্লু রিজের শিখর! এমন-এক দুর্গ যার দেয়াল বেয়ে উঠতে পারার সাধ্য এই আবিষ্কারক ছাড়া আর-কারু নেই। হয়তো কোনো সুড়ঙ্গও সে আবিষ্কার করেছে এখানে-যার মধ্য দিয়ে বিভীষিকাকে সে স্থলপথেই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে–হয়তো সবসময় যে আকাশপথেই এখানে আসতে হবে, তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই।

অবশেষে সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! সেইজন্যেই সে গ্রেট আইরি থেকে আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলো। যদি আমরা আগের বারে এই কোটরটায় এসে পৌঁছুতে পারতুম, কে জানে!, তাহলে হয়তো দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড-এর গুপ্তকথা জগতের কাছে মোটেই গুপ্ত থাকতো না!

সেখানে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, নিশ্চল, আবিষ্ট : আমার দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে আছে শিখরের ঐ পাষাণ ঈগলের ওপর, মনের মধ্যে তীব্র-প্রচণ্ড আলোড়ন! আমার নিজের কপালে যা থাকে থাক, আমার কি এখন কর্তব্য নয় এই যন্ত্রটাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়া, এক্ষুনি, এখানে, আবার সে আকাশে তার ঐ মারাত্মক উড়াল শুরু করার আগেই!

আমার পেছন থেকে কাদের পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো। ঝটিতি, আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। বৈজ্ঞানিক স্বয়ং আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, থমকে থেমে তাকিয়েছে আমার মুখের

পানে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আপনা থেকেই মুখ ফুটে নামটা বেরিয়ে এলো : গ্রেট আইরি! গ্রেট আইরি!

ঠিকই চিনেছেন, ইসপেক্টর স্ট্রক। গ্রেট আইরিই!

আর আপনি! আপনিই দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড?

সেই জগতের প্রভু, যার কাছে আমি এর মধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছি যে আমিই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ- অতিমানুষ!

আপনি! স্তম্ভিত, আমি বোকার মতো আবার বললুম কথাটা।

হ্যাঁ, অহমিকায় সটান দাঁড়িয়ে সে বললে, হ্যাঁ, আমি, হ্রবু–দিগ্বিজয়ী হ্রবু!

হ্রবু-হে বিজয়ী বীর!

১৬. হ্রবু–হে বিজয়ী বীর!

দিগ্বিজয়ী হ্রবু! তাহলে চেহারার এই মিলটাই আমার আবছাভাবে মনে পড়ছিলো। কয়েক বছর আগে এই অসাধারণ মানুষটির ছবি বেরিয়েছিলো আমেরিকার সব কাগজেই, তেরোই জুনের তারিখের তলায়, কেননা ঠিক তার আগের দিন হ্রবু (বা রবয়্) ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভায় আবির্ভূত হয়ে প্রচণ্ড শোরগোল তুলেছিলো–প্রায় হুলুস্থুলই-ফরাশি ঔপন্যাসিক মঁসিয় জুল ভেন পরে তাঁর ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্‌স উপন্যাসে তার বিস্তৃত বিবরণ ছাপিয়েছিলেন।

তখন, যখন কাগজে-কাগজে ছবিটা বেরিয়েছিলো, আমি তার চেহারার চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করেছিলুম–একবার দেখে ভুলে-যাবার মতো চেহারা তার ছিলো না : প্রশস্ত বৃষস্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ প্রায় যেন একটা অসমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভুজের মতো, তার দীর্ঘতর দিকটা রচনা করেছে জ্যামিতিক স্কন্ধদেশ; হৃষ্টপুষ্ট দৃঢ় গ্রীবা; বিশাল বর্তুলাকার শিরোদেশ। একটু-কিছু হলেই তার চোখ দুটি ধকধক করে জ্বলে ওঠে, আর ঠিক তার ওপরেই আছে ভারি, চিরকুঞ্চিত ঝোঁপের মতো ভূযুগল, যা থেকে ছুরিত হয়ে পড়ে প্রচণ্ড শক্তির ইঙ্গিত। ছোটো-ছোটো খাড়া-খাড়া চুল, আলো পড়লে ধাতুর মতো ঝকঝক করে ওঠে। বিশাল বক্ষোদেশ যেন কামারের হাপরের মতো সবসময় উঠছে-নামছে; আর উরুদেশ, বাহুযুগল, করতল-সবই সেই সবল বিশাল দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ মাথাটিও তাই, নিখুঁত কামানো গাল পরিস্ফুট করে দিচ্ছে তার চোয়ালের সবল পেশীগুলো।

আর এই হলো হ্রবু, দিগ্বিজয়ী হ্রবু, এখন সে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে, একটিমাত্র কথায় সে তার আত্মপরিচয় দিয়েছে, আমার দিকে নামটা ছুঁড়ে দিয়েছে যেন শাসানোর ভঙ্গিতে, তার এই অভেদ্য দুর্গের ভেতরে স্পর্ধায় গরীয়ান!

এখানে একটু সংক্ষেপে মনে করে নেয়া যাক সেই কাহন, যা কিছুদিন আগে দিগ্বিজয়ী হ্রবুর দিকে সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, মঁসিয় জুল ভের্ন যার চমৎকার বিবরণ লিখেছেন তার ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড়সবইতে। ওয়েলডন ইনস্টিটিউট ছিলো বিমানবিদ্যায় সমর্পিতচিত্ত একটি ক্লাব, তার সভাপতি ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার এক মান্যগণ্য মাতব্বর ব্যক্তি-আঙ্কল পুডেন্ট, আর সচিব ছিলেন মিস্টার ফিলিপ ইভাস। ইনস্টিটিউটের সদস্যরা ভেবেছিলো বায়ুর চাইতেই লঘুকোনো বিমানই আকাশে উড়তে পারবে; আর আঙ্কল পুডেণ্ট আর ফিল ইভানসের তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউট তখন এক গ্যাস-দিয়ে-ফোলানো অতিকায় বেলুন বানাচ্ছিলো, তার নাম দেয়া হয়েছিলো গো অ্যাহেড।

একটি সভায় ক্লাবের সদস্যরা যখন তাদের এই বেলুন নির্মাণ করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছে, তখন হঠাৎ সেখানে এই অজ্ঞাতপরিচয়, উটকো, হবু এসে আবির্ভূত হয়, আর তাদের সব পরিকল্পনাকেই বিধিয়ে-বিধিয়ে টিটকিরি দিয়ে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে দেয় : জোর দিয়ে বলে উড়াল শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন বাতাসের চেয়েও ভারি কোনো বিমান বানানো যাবে–আর সে-যে কোনো মিথ্যে জল্পনা করে আকাশযানের বদলে আকাশকুসুম রচনা করছে না, তার প্রমাণই হলো সে নিজে ঠিক ঐরকম একটি বিমান বানিয়েছে, আর তার নাম সে দিয়েছে অ্যালবাট্রস।

এবার উলটে তার কথাতেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যরা- বিদ্রূপ করে তারা তখন তার নাম দিয়েছিলো দিগ্বিজয়ী হ্রবু। তারপর যে হুলুস্থুল কাণ্ড হয়েছিলো তার মধ্যে গর্জে উঠেছিলো–গুড়ুম! গুড়ুম!–অনেকগুলো রিভলবার, আর এই হৈ-চৈ এর মাঝখানে এই উটকো আগন্তুকটি অন্তর্ধান করেছিলো।

সেই একই রাত্তিরে সে জোর করে গুম করে নিয়েছিলো ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিবকে, রাগে-গরগর আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ধিক্কারে-মুখর ফিল ইভাকে, আর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করেই, তাদের নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিলো মহাশূন্যে, আকাশপথে, বিশ্বভ্রমণে, তার ঐ আশ্চর্য আকাশযান অ্যালবাট্রসে। সে চেয়েছিলো এইভাবেই সে–অর্থহীন কথাকাটাকাটির বদলে–তার তত্ত্বটিকে হাতে-কলমে–বা শূন্যে, হাওয়ায়–প্রমাণ করে দেবে। এই অ্যালবাট্রস আকাশযান ছিলো একশো ফিট লম্বা, হাওয়ায় তাকে ভাসিয়ে রাখতো সারি-সারি কতগুলো দিগন্তশায়ী স্ক্রু, আর তাকে সামনে পেছনে চালিয়ে নিয়ে যেতো গলুইতে আর ল্যাজের দিকে সটান-দাঁড়-করানো কতগুলো উল্লম্ব স্ক্রু। এই অ্যালবাট্রসে কর্মী ছিলো তার অন্তত আধডজন অনুচর–যারা ছিলো তাদের নেতা হ্রবুর একান্ত অনুগত ও বশম্বদ।

বিশ্বভ্রমণেই বেরিয়েছিলো তখন অ্যালবাট্রস, ঘুরে এসেছিলো গোটা বিশ্বই, ছয় মহাদেশই। শেষটায়, মরীয়া হয়ে, অ্যালবাট্রসকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, আঙ্কল পুডেন্ট আর ফিল ইভা পালিয়ে যান : তারা ভেবেছিলেন ঐ মারাত্মক বিস্ফোরণে অ্যালবাট্রস বুঝি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে–আর তার সমস্ত অনুচরকে নিয়ে হ্রবু তখন প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে।

আঙ্কল পুডেণ্ট আর ফিল ইভান্স তারপর ফিলাডেলফিয়ায় নিজেদের মহল্লায় ফিরে আসেন। এটুকু তারা জেনে এসেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো অজ্ঞাত দ্বীপে–তারা তার নাম দিয়েছিলেন আইল্যাণ্ড এক্স-আলবাট্রসকে বানানো হয়েছিলো; কিন্তু এই দ্বীপটির অবস্থান যেহেতু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলো, কেউ-যে একদিন গিয়ে দ্বীপটা আবিষ্কার করবে, সেই সম্ভাবনা ছিলো সুদূরপরাহত। তাছাড়া তার খোঁজে বেরিয়ে-পড়ার কোনো দরকার ছিলো বলেও কারু মনে হয়নি, কেননা এই অনিচ্ছুক কয়েদিরা প্রতিহিংসার বশে হ্রবুকে সদলবলে নিধন করে এসেছেন বলেই ভেবেছিলেন।

তাই এই দুই ক্রোড়পতি, বাড়ি ফিরে এসে, পরম নিশ্চিন্ত মনে অতঃপর তাদের গো-অ্যাহেড বেলুনের নির্মাণেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন; ভেবেছিলেন, এই বেলুনে করেই একদিন তারা সেই আকাশে উড়বেন, যে-আকাশপথে একদিন তাদের জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো হ্রবু, আরো ভেবেছিলেন তাদের গো-অ্যাহেড-বাতাসের চেয়ে হালকা–অন্তত এই বাতাসের চেয়ে ভারি অ্যালবাট্রসের সমান না-হোক, উড়নবিদ্যায় তার চেয়ে মোটেই কম হবে না। তারা যদি একগুয়ের মতো ফের ঐ কাজে আত্মনিয়োগ না-করতেন, তাহলে তারা যথার্থ মার্কিনই বা হতেন কেমন করে?

পরের বছর, বিশে এপ্রিল, অবশেষে, গো-অ্যাহেড-এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হলো, এবং ফিলাডেলফিয়ার ফেয়ারমাউন্ট পার্ক থেকে পুডেন্ট আর ইভাকে নিয়ে গো-অ্যাহেড আকাশে উড়লো। হাজার-হাজার দর্শকের মধ্যে আমিও সেদিন ছিলুম ঐ ফেয়ারমাউন্ট পার্কে। দেখেছিলুম, ঐ বিশাল বেলুন রাজহাঁসের মতো সাবলীল ছন্দে উঠে গেলো আকাশে, আর তার স্ক্রুগুলোর সৌজন্যে এদিক-ওদিক-সবদিকেই বিস্ময়কর স্বাচ্ছন্দ্যের

সঙ্গে ঘুরলো-ফিরলো। আর এমনি সময়েই আচমকা একটা চীৎকার উঠেছিলো দর্শকদের মধ্য থেকে : দূর আকাশের কোণায় ঠিক তখন দেখা দিয়েছিলো আরেকটি আকাশযান, আর বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে সেটা ক্রমশ কাছে এসে পড়ছিলো। আরেকটা অ্যালবাট্রস – ফিনিক্স পাখির মতো সে ধ্বংস থেকে উঠে এসেছে, সম্ভবত আগেরটার চাইতেও উৎকর্ষে সে অনেক এগিয়ে গেছে। হ্র আর তার অনুচরেরা প্রশান্ত মহাসাগরে সলিল সমাধি থেকে বেঁচেছে–আর প্রতিশোধের স্পৃহায় জ্বলতে-জ্বলতে ফের তাদের ঐ আইল্যাণ্ড এক্স-এ এই দ্বিতীয় আকাশযানটি বানিয়ে নিয়েছে।

বিশাল, অতিকায় একটা শিকারি পাখির মতো অ্যালবাট্রস ছোঁ মেরে নেমে এসেছিলো গো-অ্যাহেড-এর ওপর। হুবু, প্রতিশোধ নেবার চাইতেও বেশি করে চেয়েছিলো সকলের চোখের সামনে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেবে বাতাসের চেয়েও ভারি আকাশযানের অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্ব। আঙ্কল পুডেন্ট আর ফিল ইভা আত্মরক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। অ্যালবার্টসের মতো তাঁদের বেলুন গো-অ্যাহেড সোজা, খাড়া, সরাসরি ওপরে উঠে যেতে পারে না–এটা তারা জানতেন; তারা। চেয়েছিলেন তাদের বেলুন অ্যালবাট্রসের চাইতে অনেক হালকা বলে তারা বুঝি সহজেই তার চাইতেও অনেক ওপরে উঠে যেতে পারবেন। সমস্ত ভারি জিনিশ, যাবতীয় ব্যালাস্ট, তার গো-অ্যাহেড থেকে ফেলে দিয়েছিলেন, তরতর করে উঠে গিয়েছিলেন কুড়ি হাজার ফিট ওপরে। কিন্তু সমানে পাল্লা দিয়ে উঠেছিলো অ্যালবাট্রসও, গো-অ্যাহেডকে পেরিয়ে আরো ওপরে উঠে গিয়েছিলো, তারপর গো-অ্যাহেডকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করে দিয়েছিলো, যেন উল্লাসে একটা নাচই সে জুড়ে দিয়েছে আকাশে।

হঠাৎ শোনা গিয়েছিলো এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। বিশাল গ্যাসে-পোরা-থলে অর্থাৎ এই বেলুন গো-অ্যাহেড এত উঁচুতে উঠে যাবার ফলে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে একটা উৎকট আওয়াজ করে ফেটে যায়। দরদর করে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে বেলুনটা দ্রুতবেগে। নিচে নেমে আসতে থাকে–এই বুঝি প্রচণ্ডবেগে আছাড় খেলো!

তারপর, সারা বিশ্বকেই অবাক করে দিয়ে, অ্যালবাট্রস তীরবেগে নেমে এসেছিলো তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে, সর্বনাশটাকেই ত্বরান্বিত করে দিতে নয়, বরং তাদের উদ্ধার করবার জন্যে। হ্যাঁ, হবু, তার প্রতিহিংসার কথা ভুলে গিয়ে, পড়ে-যেতে-থাকা গো অ্যাহেড-এর গায়ে এসে ঠেকে, আর অর অনুচরেরা গো-অ্যাহেড থেকে অ্যালবাট্রস এ তুলে নেয় আঙ্কল পুডেণ্ট, ফিল ইভান্স আর তাদের সহযোগী বৈমানিকটিকে। তারপর বেলুনটি, এখন-একেবারেই-ফাঁকা, চুপসে গিয়ে ধসে পড়ে ফেয়ারমাউন্ট পার্কের গাছপালার ওপর।

দর্শকরা সবাই ভয়ে-বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো! এখন হ্রবু তার কয়েদিদের আবার তার বাগে পেয়েছে, কীভাবে সে এখন এঁদের ওপর শোধ নেবে? এবার কি সে এঁদের চিরকালের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে নীল শূন্যে?

অ্যালবাট্রস তখন সবেগে, অনবরত, নিচেই নেমে আসছিলো, যেন ফেয়ারমাউন্ট পার্কের ফাঁকায় নেমে পড়বে! কিন্তু সে যদি নাগালের মধ্যে এসে পড়ে, ক্ষিপ্ত দর্শকেরা কি তার ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, ক্ষিপ্ত হয়ে ছিঁড়ে ফেলবে না কি হ্রবুকে, আর তার এই চমকপ্রদ আবিষ্কারকে?

অ্যালবাট্রস মাটি থেকে যখন ছ-ফিট ওপরে, তখন হঠাৎ থমকে থেমে দাঁড়িয়েছিলো। আমার এখনও মনে পড়ে, কী-রকম ক্ষিপ্তভাবে লোকে তার ওপর হামলা চালাতে যাচ্ছিলো–আর ঠিক তখনই গমগম করে উঠেছিলো হ্রবুর গলা, সে-যে কী বলেছিলো তখন, আমি যেন এখনও তা হুবহু পুনরাবৃত্তি করে দিতে পারি :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ! মন দিয়ে শুনুন আপনারা। ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং সচিব এখন আবার আমার কবলে এসে পড়েছেন। তারা আমার যে-ক্ষতি করেছিলেন, যেভাবে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাতে আমি যদি তাদের যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখি তবে অন্যায় কিছুই করবে না, বরং সে হবে যথার্থ ন্যায়বিচারেরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু অ্যালবাট্রস-এর সাফল্য দেখে তাদের এবং আপনাদের মধ্যেও যে-পরিমাণ ক্রোধ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মনে হয় সাধারণ মানুষের আত্মা এখনও আকাশ বিজয়ের জন্যে প্রস্তুত নয়, বরং এই অসীম ক্ষমতাকে সে হয়তো মানুষের অকল্যাণেই কাজে লাগাবে। আঙ্কল পুডেন্ট, ফিল ইভানস, যান, আপনারা মুক্ত–আপনারা যেখানে-খুশি চলে যেতে পারেন!

বেলুন থেকে উদ্ধার-পাওয়া তিনজন মানুষই তখন অ্যালবাট্রস থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়েছিলেন। আকাশযান অমনি প্রায় তিরিশ ফিট উঁচুতে নাগালের বাইরে উঠে গিয়েছিলো, আর হবু ফের বলতে শুরু করেছিলো :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ! মানুষ আকাশকে জয় করেছে–কিন্তু এই ক্ষমতা উপযুক্ত সময় না-আসা পর্যন্ত আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হবে না। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমার আকাশযানের রহস্য। মানুষের কাছ থেকে

অন্তরিক্ষবিজয়ের এই চাবিকাঠিটি কখনও হারিয়ে যাবে না, তবে যখন তারা শিখবে কী করে এই ক্ষমতার অপব্যবহার না-করতে হয়, শুধু তখনই এর তত্ত্ব ও তথ্যগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। বিদায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ, আদিউ!

তারপর অ্যালবাট্রসতার বিশাল ক্রুগুলোর প্রচণ্ড ঘূর্ণনের ফলে আকাশে উঠে গিয়েছিলো, আর প্রতিহিংসা নেবার এই অপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ মানুষের উল্লাসধ্বনির মধ্যে তীরবেগে। দূরে, দিগন্তে, মিলিয়ে চলে গিয়েছিলো।

এই শেষ দৃশ্যটা আমি বেশ কিছু খুঁটিনাটি সমেতই এখানে আমার পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি, কেননা তাতেই বোধহয় আমার সামনে এখন যে-দিগ্বিজয়ী বীর বু দাঁড়িয়ে আছে তার মনের অবস্থা কিছুটা উদঘাটিত করা যাবে। মানবজাতির প্রতি তার সে-রকম কোনো বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব নেই। সে এখনও অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষাতেই আছে, যেদিন তার ধারণা মানুষ সত্যি-সত্যি এই বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর যোগ্য হয়ে উঠবে। তবে এও সত্যি যে এর মধ্য দিয়ে নিজের প্রতিভার ওপর তার অগাধ আস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে : যে-অতিমানুষিক শক্তি তার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে তার কথা যে সে শুধু সচেতনভাবে জানে তা-ই নয়, তা নিয়ে তার দুর্দান্ত অহমিকাতেও কোনো ঘাটতি নেই।

এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে তার এই স্পর্ধা আর অহমিকাই নিজেকে সারা জগতের প্রভু বলে একদিন নিজের পরিচয় দিতে তাকে উসকে দিয়েছে-সেটাই সে জানিয়েছে তার খোলা চিঠিতে। নিশ্চয়ই কিছু-একটা হয়েছে এই অন্তর্বর্তী সময়ে, যেটা তাকে মানুষ সম্বন্ধে এতটা বিতৃষ্ণ করে তুলেছে। অ্যালবাট্রসের সেই শেষ প্রস্থানের পর অন্তর্বর্তীকালে

কী হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমি কেবল অনুমানই করতে পারি। এই পরাক্রান্ত উদ্ভাবক শুধু নিছক একটা আকাশযান তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি। সে এমন একটা যন্ত্র বানাতে চেয়েছিলো যেটা জল-মাটি-আকাশ সবকিছুকেই যেন একসঙ্গে জয় করে নিতে পারে। হয়তো আইল্যাণ্ড এক্স-এর সংগোপন কারখানায় তার অনুগত অনুচরদের সাহায্যে সে এক-এক করে এই আশ্চর্য যানের বিভিন্ন অংশ তৈরি করেছে, যে যান একের ভেতরেই চার, যে অনায়াসে ভোজবাজির মতো রূপান্তরিত হতে পারে একধরনের যান থেকে অন্যধরনের যানে। তারপরে তার দ্বিতীয় অ্যালবাট্রস নিশ্চয়ই এইসব বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বহন করে নিয়ে এসেছে গ্রেট আইরিতে, যেখানে সে সব আলাদা আলাদা টুকরোকে জুড়ে দিয়ে বানিয়ে তুলেছে এই বিভীষিকা, কেননা দূর প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো অজ্ঞাত দ্বীপের চাইতে গ্রেট আইরি তার কাছে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে অধিকতর সহজগম্য। অ্যালবাট্রস নিশ্চয়ই কালক্রমে একদিন ধ্বংস হয়ে গেছে–কোনো দুর্ঘটনায়, নয়তো-বা ইচ্ছে করেই হয়তো সেটার সে বিনাশ ঘটিয়েছে–এই আইরিতেই। তারপরেই আচমকা একদিন আবির্ভূত হয়েছে বিভীষিকা, মার্কিন মুলুকের জলে-ডাঙায় এক তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। অ্যালবাট্রস থেকে বিভীষিকা-নামকরণের ভঙ্গির এই রূপান্তরের মধ্যেই হয়তো নিহিত রয়েছে তার মানসিক অস্থিরতা ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তারপর তো আমি আগেই বলেছি, ঠিক নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মুখটায় এসে, এই আশ্চর্য জলযান হঠাৎ কেমন করে বিশাল দুই ডানা মেলে দিয়ে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষের অনধিগম্য এই গ্রেট আইরিতে।

.

১৭. আইন মোতাবেক

এই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচারের মূল প্রসঙ্গটা, তাহলে, কী? আমি কি তার কোনো পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারি–এখনই, কিংবা পরে কোনোদিন? হ্রবুর হাতেই কি সমস্তকিছু নির্ভর করে নেই? আঙ্কল পুডেণ্ট আর ফিল ইভা একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ থেকে যেভাবে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, সে-রকম কোনো সুযোগ আমি নিশ্চয়ই পাবো না–হবু নিশ্চয়ই দু-বার সেই একই ভুল করবে না। আমি শুধু অপেক্ষাই করতে পারি এখন। কে জানে এই প্রতীক্ষা কতটা দীর্ঘ, ও প্রলম্বিত, হবে!

এক-অর্থে, আমার কৌতূহল কিন্তু আংশিক চরিতার্থ হয়েছে। এখন আমি এটা অন্তত বুঝতে পেরেছি গ্রেট আইরিতে কী হয়েছিলো। এই রোমাঞ্চকর বৃত্তান্তের এতদূর অব্দি এসে আমি জানি ব্লু রিজ মাউন্টেনের আশপাশে লোকে কী দেখে এমন ভড়কে গিয়েছিলো। অন্তত এটা জানি যে এই অঞ্চলে কোনাদিনই অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের ভয় ছিলো না–এখনও তার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের পেটের মধ্যে কোনো অপার্থিব ভুতুড়ে শক্তি এসে কোনো নারকীয় নৃত্য জুড়ে দেয়নি। আলেঘেনির এই কোনাটায় কোনো জ্বালামুখ জেগে ওঠেনি অপ্রত্যাশিত ও আচম্বিত। গ্রেট আইরি নিছকই ছিলো দিগ্বিজয়ী হ্রবুর আশ্রয়। এই অনধিগম্য গোপন আশ্রয়েই সে জমিয়ে রাখতো তার রসদ বা যন্ত্রপাতির টুকরো। অ্যালবাট্রস-এ করে একদিন আকাশপথে বেরিয়েই নিশ্চয়ই সে আবিষ্কার করেছিলো এমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল। প্রশান্ত মহাসাগরের সেই আইল্যাণ্ড এক্স-এর চাইতেও এই আশ্রয়কে তার নিশ্চয়ই অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে হয়েছিলো।

www.bengaliebook.com

এইটুকুই শুধু জানি আমি; কিন্তু তার এই আশ্চর্য যান কীভাবে তৈরি, কোন ধাতুতে, কোন চালকশক্তিতে, কী তার নির্মাণতত্ত্ব-তার কতটুকুই বা আমি জানি? না-হয় ধরেই নিচ্ছি যে এই একের ভেতরে চার, এই বহুধার্থসাধক যান বিদ্যুতে চলে। কিন্তু আমরা তো আগেই জেনেছি যে অ্যালবাট্রসও তড়িৎশক্তিতে চলতো–আর এই তড়িৎপ্রবাহ সে কোনো অভিনব আশ্চর্য উপায়েই শুষে নিতে চারপাশের আবহমণ্ডল থেকে। কিন্তু কী সেই যান্ত্রিক সৃষ্টি, তার কোনো অনুপুঙ্খই তো আমার জানা নেই। আমাকে কখনোই ঐ এনজিনটা দেখতে দেয়া হয়নি; সন্দেহ নেই যে সেটা আমি কোনোদিনই দেখতে পাবো না–আমাকে দেখতে দেয়া হবে না।

আর আমার মুক্তি? এটা তো তর্কাতীত যে হ্রবু এখনও সকলের অগোচরেই থাকতে চাচ্ছে–সবার অচেনা। তার এই অভাবিত যানটিকে নিয়ে সে-যে কী করবে, তা আমি জানি না–তবে তার খোলা চিঠিটা যদি কোনো ইঙ্গিত হয়, তাহলে জগৎ তার কাছ থেকে কোনো মঙ্গলের বদলে শুধু অমঙ্গলই আশা করতে পারে। কিন্তু যেভাবে সে এতদিন লোকের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের পরিচয় গোপন করে রেখেছে, তাতে এটাই মনে হয় যে নিকট-ভবিষ্যতে সে কারু কাছেই নিজের পরিচয় ফাস করে দিতে রাজি হবে না। এখন শুধু একজন-মাত্র লোকই পারে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড আর দিগ্বিজয়ী বীর বুর পরিচয় ফাস করে দিতে–আর সে হলুম আমি, যে আমার ওপর ভার পড়েছে। তাকে গ্রেফতার করার। নিয়তির এমনই নির্মম পরিহাস যে আমি তাকে গ্রেফতার করার বদলে সে-ই এখন আমাকে বন্দী করে রেখেছে। অথচ আমার উচিত এক্ষুনি তার কাঁধে হাত রেখে বলা : ন্যায়বিচারের নামে, আইন মোতাবেক–

বাইরে থেকে কেউ কি কোনোদিন এখানে এসে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাবে? উঁহু, তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ব্ল্যাক রক ক্রীকে কী হয়েছিলো, পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার সব কথা জানে। সব কথা শুনে মিস্টার ওয়ার্ড নিশ্চয়ই এভাবে তার যুক্তির পইঠাগুলো সাজাবেন : বিভীষিকা যখন তার দড়িদড়ায় আমাকে জড়িয়ে ফেলে ক্রীক ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছিলো, তখন হয় আমি ডুবে মরেছি (যদিও আমার মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি), আর নয়তো বন্দী হিশেবে আমাকে বিভীষিকায় তুলে নেয়া হয়েছে-এবং আমি, অকর্মণ্য ও অসমর্থ, অসহায় পড়ে আছি বিভীষিকারই কাপ্তেনের হাতে। প্রথম অনুমানটাই যদি সত্যি হয়, তাহলে ওয়াশিংটনের ফেডারেল পুলিশের চীফ ইনসপেক্টর জন স্ট্রকের নামের পাশে ঢ্যাঁড়া কেটে মৃত বলে ঘোষণা না-করে কোনো উপায় নেই। আর দ্বিতীয়টার বেলায়? আমার সহকর্মীরা কি কোনোদিনই আবার আমাকে ফিরে দেখতে পাবার আশা করতে পারবে? যে-দুটি ডেস্ট্রয়ার বিভীষিকার পেছন-পেছন নদী-নায়াগ্রা অব্দি তাড়া করে এসেছিলো, প্রপাতে পড়বার বিপদ দেখে একসময় তারা থেমে পড়েছিলো। তখন রাত নেমে আসছিলো, আঁধার ঘিরে ধরছিলো চারপাশ থেকে-ডেস্ট্রয়ারের ওপর থেকে তারা তখন কী ভেবেছিলো? যে, বিভীষিকা বুঝি প্রপাতের তীব্র স্রোতে আর ঘূর্ণিতে পাক খেতে-খেতে দুশো ফিট ওপর থেকে নিচে আছড়ে পড়েছে? রাতের আঁধারে কেউই নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি যে বিভীষিকা তখন দু-ধারে পাখা মেলে দিয়ে হর্সশু ফলসের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে, শেষটায় উড়ে এসেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে এই গ্রেট আইরিতে!

আমি কি আমার কপালে কী আছে, সে নিয়ে বুকে এখন কোনো প্রশ্ন করবো? সে কি আমরা কথা কানে নেবে? শুধু নিজের নামটাই আমার দিকে মস্ত ঢেলার মতো ছুঁড়ে

দিয়েই সে কি খুশমেজাজ হয়ে ওঠেনি? তার কি এটাই মনে হবে না যে তার নামটাই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে?

বেলা গড়িয়েই চললো, কিন্তু অবস্থার আর-কোনো তারতম্য হলো না। হবু আর তার স্যাঙাত্র অবিশ্রাম এনজিনটা নিয়ে কাজ করে চলেছে, বোঝাই যাচ্ছে তার একটা বড়ো-রকম মেরামতি দরকার। তারা নিশ্চয়ই চট করেই আবার বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে, নইলে এত তাড়া থাকতো না। আর, আমাকেও নিশ্চয়ই তারা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আমাকে যদি গ্রেট আইরির এই কোটরেই তারা বন্দী করে রেখে চলে যায়, তাহলেও আমার অনুযোগ করার কিছু থাকবে না। আর এখানে রেখে গেলে কিছুতেই আমি এখান থেকে পালাতে পারবো না–তবে রসদ যা থাকবে তাতে আমি হয়তো অনেকদিনই কাটিয়ে দিতে পারবো।

আমি শুধু সারাক্ষণ হ্রবুর মনটাকেই পড়বার চেষ্টা করছিলাম। কী আছে তার মনের মধ্যে? সারাক্ষণই সে যেন কোনো দুরন্ত উত্তেজনায় তেতে আছে। তার ঐ চিরজ্বলন্ত মগজের মধ্যে কোন আগুন এখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে? ভবিষ্যতের জন্যে কী পরিকল্পনা সে আঁটছে তার ঐ নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বশে? এবার সে কোন দিকে ফেরাবে উড্ডীন বিভীষিকার মুখ? সে কি একাই দাঁড়াবে সারা জগতের বিরুদ্ধে, যে-হুমকিটা সে দিয়েছে তার ঐ খোলা চিঠিতে, কোনো উন্মাদের যেটা আস্ফালন?

সেই প্রথম দিনের রাত্তিরে, আমি গ্রেট আইরির একটা খোঁদলের মধ্যে সেঁধিয়ে শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়েছিলুম। প্রতিদিনই আমার সামনে খাবার রেখে দিয়ে যাওয়া হতো। দোসরা ও তেসরা আগস্ট তিনজনেই মুখে টু শব্দটি না-করে সারাক্ষণ অবিরাম কাজ

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

করে গেলো। যখন মনে হলো হুবুর সন্তোষ-মতো এনজিনগুলো সারাই হয়ে গেছে, সবাই মিলে তখন মালপত্তর ওঠাতে লাগলো বিভীষিকায়, মনে হচ্ছিলো কোনো দীর্ঘ ভ্রমণেই তারা বেরুবে এবার। হয়তো বিভীষিকা এবার দিকে-দিগন্তে যাবে, পেরিয়ে যাবে দূর-দূরান্তর, হয়তো আবার গিয়ে বু পৌঁছুতে চাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ আইল্যাণ্ড এক্স-এই!

মাঝে-মাঝে তাকে দেখতে পাই বিষম চিন্তামগ্ন, সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। আইরিতে; কিংঝ কখনও-কখনও সে তার দুই হাত তুলে বিষম স্পর্ধায় যেন ঈশ্বরকেই তার বিরুদ্ধে রণে-আহ্বান করে। তার এই দুরন্ত দম্ভ তাকে কি ক্রমশ উন্মত্ততার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে না? এমন-এক উম্মত্ততা যেটা কারু সাধ্য নেই দমায়–এমনকী তার ঐ দুই অনুচরেরও না, কেননা তারাও যেন কোন-এক উত্তেজনায় সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটছে! একসময় তার ছিলো শুধুমাত্র অ্যালবাট্রস, তখন সে শুধু আকাশকেই জয় করেছিলো; এখন সে জয় করেছে জল-মাটি-আকাশ–এই তিনকেই। এখন তার কাছে। যেন কোনো রুদ্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছে, দিগন্ত পেরুনো কোনো সীমাহারা পথ–কোনো কিছু নেই, না ডাঙা, না জল, না আকাশ, সেই পথে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

আর সেইজন্যেই ভবিষ্যতের গর্ভে সে-কোন অভাবিত আতঙ্ক লুকিয়ে আছে, ভেবে-ভেবে আমি ভয়েই কাটা হয়ে যাচ্ছিলুম। এই গ্রেট আইরি থেকে আমার পক্ষে কিছুতেই পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আমাকে তারা তাদের এই উম্মাদ অভিযানে টেনে নিয়ে যাবেই! আর বিভীষিকা যখন সীমাহারা মহাসাগর কিংবা দিগন্তহীন মহাকাশ পাড়ি দেবে, তখন কী করে পালাতে পারবো আমি? আমার একমাত্র সুযোগ শুধু তখনই আসবে,

যখন সে ডাঙার ওপর দিয়ে পাড়ি দেবে–আর তাও যদি সে শ্লথমন্থর গতিতেই পাড়ি জমায়! এই সুদূর, দুর্বল আশাটিকেই শুধু খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে পারি। আমি!

গ্রেট আইরিতে এসেই, আমি হুবুর কাছ থেকে একটা সদুত্তর জানতে চাচ্ছিলুম–আমাকে নিয়ে সে কী করবে বলে ভেবেছে। সে তাতে কোনো সাড়াই দেয়নি, কোনো উচ্চবাচ্য না। এই শেষ দিনে আমি আরেকবার তার কাছে প্রশ্নটা তুললুম। বিকেলবেলায় আমি সেই সুড়ঙ্গটার মুখে গিয়ে দাঁড়ালুম যেখানে তারা একমনে কাজ করে যাচ্ছিলো। সুড়ঙ্গের মুখটায় দাঁড়িয়ে হবু কোনো কথা না-বলে নীরবে শুধু আমার আপাদমস্তক। একবার নিরীক্ষণ করলে। সে কি তাহলে আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে?

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলুম, বললুম, কাপ্তেন হবু! আপনাকে আমি আগেই একটা প্রশ্ন জিগেস করেছিলুম-আপনি তার কোনোই উত্তর দেননি। আমি সেই একই প্রশ্ন আপনাকে আবার জিগেস করছি : আপনি আমাকে নিয়ে কী করতে চান?

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা, দুজনের মধ্যে ব্যবধান দু-পাও হবে কি না সন্দেহ। বুকের ওপর দু-হাত ভঁজ-করা, সে তার জ্বলন্ত চক্ষু মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।–তার বিস্ফরিত চোখে সেই দীপ্ত দৃষ্টি দেখে আমি যেন একেবারে শিউরে উঠলুম। ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত–তাতেও বোধহয় আমার বুকের কাঁপুনির বিবরণ সঠিক হয় না। এ-যে কোনো সুস্থ লোকের চাউনি নয়, এ-যে একেবারে পাগলের চোখ, বদ্ধ উম্মাদের চোখ!

আমি আবারও, একটু চ্যালেজের সুরেই, আবারও আমার প্রশ্নটা জিগেস করলুম। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো হবু এবার বুঝি তার নীরবতা ভাঙবে।

কী করতে চান আপনি আমায় নিয়ে? আমাকে কি আপনি ছেড়ে দেবেন? না কি এখানে আমায় সারাজীবন আটকে রাখতে চান?

আবার দণ্ডমুণ্ডের এই মালিকের মন তখন নিশ্চয়ই অন্যকিছুতে আবিষ্ট হয়ে ছিলো–আমি যেন আচমকা তাকে তার সেই আবেশ থেকে এক হ্যাঁচকা টানে বার করে নিয়ে এসেছি। তারপরেই সে আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে অসীম স্পর্ধার সঙ্গে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরলে। যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য শক্তিই তাকে বারেবারে এভাবে উর্ব আকাশে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে–সে যেন আর এই মাটিপৃথিবীরই মানুষ নয়, যেন তার নিয়তিই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই অন্তরিক্ষে–যেন সে আকাশের মেঘেরই চিরবাসিন্দা। আমাকে সে কোনো উত্তরই দিলে না, মনেই হলো না যে সে আমার কথা কিছু বুঝতে পেরেছে। মোহাবিষ্টের মতো পা ফেলে সে আবার গিয়ে ঢুকলো ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে।

কতক্ষণ যে বিভীষিকা এখানে নিশ্চল পড়ে থাকবে, তা আমি জানি না। তবে তেসরা আগস্ট বিকেলবেলায় দেখতে পেলুম মেরামতির কাজ আর তার ওপর জিনিশপত্তর তোলার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। এই যানের সমস্ত ভাড়ারই বোধহয় সুড়ঙ্গ থেকে রসদপত্র এনে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। তারপর তার দুজন সহকারীর একজন, যাকে মনে হলো হুবুর প্রধান সহকর্মী, যাকে এখন আমি চিনতে পারলুম অ্যালবাট্রসএর ফাস্ট মেট জন টারনার বলে, আরো-একটা কাজে লেগে পড়লো। তার সঙ্গীর সাহায্যে, সে ঐ মস্ত কোটরটার মাঝখানে নিয়ে এলো বাকি সমস্ত জিনিশপত্রই : খালি বাক্স, কাঠের টুকরোটাকরা, ছুতোরের সব সাজসরঞ্জাম, এমন-কতগুলো অদ্ভুত দেখতে কাঠ যা মনে হলো আগে ছিলো অ্যালবাট্রসএরই অংশ, যাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত এই অভিনব এবং

আরো শক্তিশালী যানের কাছেই আহুতি দেয়া হয়েছে। আর এই বিশাল স্কুপের তলায় পড়ে রইলো রাশি-রাশি শুকনো ঘাস। হঠাৎ মনে হলো, হবু বুঝি চিরকালের মতো তার এই আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে!

সত্যি-বলতে, এটা তো ঠিক যে সে মোটেই হাবা নয়। সে তো জানে যে এর মধ্যেই গ্রেট আইরির ওপর পুলিশের নজর পড়েছে–হয়তো শিগগিরই এই পাষাণপ্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢোকবার জন্যে নতুন করে তোড়জোড় শুরু হবে। হয়তো একদিন না-একদিন এ-সব চেষ্টা সফলও হবে–কেউ-একজন এসে হয়তো ঢুকবে ভেতরে, আর তার গোপন আড্ডা আর মোটেই গোপন থাকবে না! সে নিশ্চয়ই চাইবে পুলিশের লোক এসে কিছুতেই যেন তার কোনো চিহ্ন দেখতে না-পায়, কোনো সূত্রই যেন পড়ে না থাকে।

ব্লু রিজের শিখরের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে গেলো। এখন এসে শেষবেলাকার রোদ্দুর পড়েছে উত্তরপশ্চিমে, ব্ল্যাক ডোমের ওপর। হয়তো বিভীষিকা অপেক্ষা করে আছে কখন ঘন হয়ে রাতের আঁধার নেমে আসে, যখন সে তার নতুন অভিযান শুরু। করে দেবে। জগৎ তো এখনও জানে না যে এই স্বতশ্চল শকট এবং আশ্চর্য জলযান আবার একটা উড়োজাহাজও বটে। আজ অব্দি কেউই তাকে আকাশে দ্যাখেনি। দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার চতুর্থ রূপান্তরের কথা গোপন রাখবে সহজে লোককে জানতে দেবে না যে তার এই যান আকাশেও উড়তে পারে!

ন-টা নাগাদ কোটরের মধ্যে নেমে এলো নিবিড় অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই। প্রখর পূর্বী হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে ভারি-ভারি মেঘ, সারা আকাশ তাতে ঢাকা পড়ে গেছে। বিভীষিকা যদি এখন আকাশে ওড়ে, কেউই তাকে দেখতে পাবে না।

হঠাৎ তখন জন টারনার এসে কোটরের মাঝখানে ঐ পাকার জঞ্জালের তলায় শুকনো ঘাসের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। পুরো স্তূপটাই তক্ষুনি দপ করে জ্বলে উঠলো। নিবিড় ধোঁয়ার মাঝখান থেকে লকলক করে বেরিয়ে এলো লেলিহান শিখা, গ্রেট আইরির শিখরের ওপরেও গিয়ে যেন পৌঁছুলো সেই শিখা। আবারও নিশ্চয়ই মরগ্যানটন আর প্লেজেন্ট গার্ডেনের সাধারণ লোক বিশ্বাস করে বসবে যে জ্বালামুখ তার বিকট হা করে লোল জিহ্বা বার করে দিয়ে আকাশ চাটছে। তারা হয়তো ভাববে, এ বুঝি আগুনের পাহাড়েরই আরেকটা উৎকট কীর্তি।

সেই আগুনের কুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলুম আমি। কানে আসছে দাউদাউ আগুনের ফোঁসফোঁস, কাঠ-ফেটে-যাওয়ার আওয়াজ, দুরন্ত পূর্বী হাওয়া যেন আরো অস্থির হয়ে উঠেছে। বিভীষিকার ডেক থেকে, হ্রবুও অনিবেমষ লোচনে তাকিয়ে আছে বহ্নিমান শিখার দিকে।

শিখার খ্যাপা রাগ যে-সব টুকরোটাকরা চারপাশে ছিটিয়ে দিচ্ছিলো, জন টারনার আর তার সঙ্গী আবার সেগুলো ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো আগুনের কুণ্ডের মাঝখানে। আস্তে-আস্তে আগুন সব খেয়ে শেষ করে দিলে, শিখা নুয়ে এলো নিচে, ছাইভস্মের কাছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর দপদপ করলো খানিকক্ষণ। তারপর আবার সব স্তব্ধ আবার নিকষকালো রাত্রি, অবতামসী।

হঠাৎ কে যেন আমার হাত চেপে ধরলো। তাকিয়ে দেখি, টারনার। সে আমাকে টেনে নিয়ে চললো বিভীষিকার দিকে। কোনো প্রতিরোধ নিতান্তই অর্থহীন হতো। তাছাড়া

এখানে একা পরিত্যক্ত, পড়ে-থাকার চাইতে অধম আর ভয়াল কী-ই বা হতে পারতো? এই জেলখানার দেয়াল ডিঙিয়ে আমি তো কোথাও যেতে পারবো না!

টারনারও আমার সঙ্গে-সঙ্গে বিভীষিকার ডেকে পা রাখলে। তার সঙ্গী গিয়ে দাঁড়িয়েছে টঙের ওপর, লুক-আউটে, দ্যাখন-কুঠুরির খোপে; টারনার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো এনজিন-ঘরে, ভেতরে বিজলি বাতি জ্বলছে, কিন্তু বাইরে তার লেশমাত্র স্ফুরণ নেই। হবু নিজে দাঁড়িয়ে আছে সারেঙের চাকায়, হালে, তার হাতের নাগালে আছে। রেগুলেটর, যাতে সে শুধু গতিই নয়, বিভীষিকা কোন দিকে যাবে, তার ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। আমাকে তারপরই ঠেলে থামিয়ে দেয়া হলো আমার ক্যাবিনটায়, মাথার ওপর আটকে দেয়া হলো হ্যাঁচওয়ের ঢাকনা। নায়াগ্রা থেকে বেরুবার সময় যেমন হয়েছিলো, আজও তাই, আমাকে বিভীষিকার উড়াল দেখতে দেয়া হবে না।

আমি যদিও বিভীষিকার ওপর কী হচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছি না, এনজিনের সব আওয়াজ কিন্তু শুনতে পাচ্ছি ধ্বকধ্বক! হঠাৎ যেন বিভীষিকা মাটি থেকে উঠে এলো বেশামাল, একটুক্ষণ, তারপরেই হাওয়ায় নিজেকে শামলে নিয়ে ভেসে চললো। নিচের টারবাইন তখন দুরন্ত গতিতে পাক খাচ্ছে, আর বিরাট ডানা দুটো যেন আকাশ হাড়াতে শুরু করে দিয়েছে!

এইভাবেই বিভীষিকা, হয়তো-বা চিরকালের জন্যেই, ছেড়ে এলো তার ঈগল পাখির বাসা, গ্রেট আইরি, হাওয়ায় ভেসে চললো, জলে যেমন করে ভেসে চলে কোনো জাহাজ। হব্রু উড়াল দিয়েছে আলেঘেনির দু-পাল্লা শৈলশ্রেণীর ওপর—আর হয়তো সে কোনোদিনই এখানে ফিরবে না।

কিন্তু কোনদিক লক্ষ্য করে সে চলেছে? সে কি পেরিয়ে যাবে নর্থ ক্যারোলাইনার সমভূমি, হন্যে হয়ে খুঁজবে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরকে? না কি সে ছুটতে শুরু করেছে। পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশে? হয়তো চলেছে দক্ষিণে, মেহিকোর গাফের দিকে। দিন যখন আসবে, আমি কি তখন চিনতে পারবো কোথায় চলেছি, যদি আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে রচনা করে দেয় দিগন্ত?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো, আর একেকটা ঘণ্টা কী-যে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত প্রহর বলে মনে হলো আমার! খ্যাপা সব অসংলগ্ন ভাবনা ভিড় করে আসছে আমার মনে। যেন আমি ঝেটিয়ে চলে যাচ্ছি আদিগন্ত কল্পনার জগতের ওপর দিয়ে–যে-দুরন্ত গতিতে বিভীষিকা এখন দুর্দাম ছুটেছে, তাতে এই অনিঃশেষ তমসায় কোথায় যে গিয়ে পৌঁছুবো, কে জানে! আমার মনে পড়ে গেলো, অ্যালবাট্রস-এর সেই অবিশ্বাস্য উড়ান–যার একটা বিস্তৃত বিবরণ ছাপিয়েছিলেন মঁসিয় জুল ভের্ন, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সব নথিপত্তর ঘেঁটে। হ্রবু তার সেই প্রথম আকাশযান নিয়ে যা করেছিলো, এখন এই একের ভেতর চারকে নিয়ে তারও কত বেশি করে তাড়া করে যেতে পারবে অসম্ভবকে!

অবশেষে ঐ ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে দিনের প্রথম আলোর রশ্মি এসে ঢুকলো আমার ক্যাবিনে। এখন কি তবে আমায় ওপরে যেতে দেয়া হবে, ডেকের ওপর, যাতে নিজের চোখে সবকিছু দেখতে পারি, যেমন একদিন দেখেছিলাম লেক ইরির ওপর? আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে হ্যাঁচওয়ের ঢাকনাটা ঠেললুম, অমনি সেটা খুলে গেলো, আমি অর্ধেকটা উঠে এলুম ওপরে।

চারদিকেই শুধু আকাশ আর সমুদ্র। আমরা কোনো সমুদ্রের ওপর দিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছি, সম্ভবত হাজার-বারোশো ফিট ওপর দিয়ে–অন্তত সব দেখেশুনে আমার তা-ই মনে হলো। হবুকে কোথাও দেখতে পেলুম না–সম্ভবত সে গিয়ে ঢুকেছে তার এনজিনঘরে। সারেঙের চাকায় দাঁড়িয়ে আছে টারনার, তার সঙ্গী আছে ঐ দ্যাখন-খোপে, লুকআউটে।

এবার আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলুম বিশাল ডানাগুলোর ঝাঁপটানি, আগের বার উড়ালের সময় যা আমি দেখতে পাইনি। সূর্যের অবস্থান দেখে–যখন সে আস্তে-আস্তে দিগন্ত থেকে উঠে এলো–আমি বুঝতে পারলুম আমরা দক্ষিণ দিকে চলেছি। অর্থাৎ রাত্তিরে যদি বিভীষিকা তার নিশানা বদলে না-থাকে, তাহলে এখন আমাদের নিচে যে সীমাহারা জল ঢেউ তুলে যাচ্ছে, সেটা মেহিকোর উপসাগর।

তপ্ত একটা দিন ঘোষণা করে দিলে দিগন্তে ঝুলে-থাকা ভারি রাগি লাল মেঘ। আসন্ন ঝড়তুফানের এই লক্ষণ হ্রবুরও নজর এড়ায়নি, আটটা নাগাদ সে এসে টারনারকে ছুটি দিয়ে নিজেই দাঁড়ালে সারেঙের চাকায়। হয়তো অ্যালবাট্রস যে ভয়ংকর তুফানের পাল্লায় পড়ে ধ্বংস হতে বসেছিলো তার কথা ভেবে সে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে হালের কাছে। তবে অ্যালবাট্রস প্রকৃতির যে-দুর্দম শক্তির সঙ্গে যুঝতে পারেনি, এই দুর্দান্ত বিভীষিকা তাকে অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারবে, কেননা সঙিন সময় এলে সে নেমে যেতে পারবে সমুদ্রে, সেখানেও ঝড় যদি তার ঝুঁটি ধরে নাড়াতে চায় তবে ডুবে যেতে পারবে অতলে, সমুদ্র যেখানে থাকে শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তবে হবু হয়তো সব লক্ষণ পড়ে নিয়ে এটাই বুঝেছে যে কালকের আগে এই তুফান এখানে ফেটে পড়বে না। আর তা-ই হ্রবু আকাশ ছেড়ে জলে নেমে এলো না–উড়েই চললো বিভীষিকা, তারপর বেলা গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হওয়ায় সে বিশ্রাম দিলে ঐ দুরন্ত ডানা দুটিকে, নেমে পড়লো জলের ওপর, আর

সেখানে ফটফট করছে স্বচ্ছ অপরাহ্ণ, ঝড়ের কোনো পূর্বাভাসই সেখানে নেই । বিভীষিকা যেন কোনো সমুদ্রের পাখি, কোনো গাংচিল, কোনো অ্যালবাট্রস, যারা ঢেউয়ের ওপর অনায়াসেই বিশ্রাম করতে পারে, সাবলীল ছন্দে ভেসে যেতে পারে। তবে পাখির চাইতে বিভীষিকার সুবিধে বেশি–আর ধাতুর শরীর ককখনো ক্লান্ত হয়ে পড়বে না, অফুরান শক্তি পাবে তার বিদ্যুতের সঞ্চয়কোষ থেকে ।

আমাদের চারপাশে বিশাল সিন্ধু সম্পূর্ণ শূন্য পড়ে আছে। কোনো পালের চিহ্ন নেই কোথাও, কোথাও কোনো চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠছে না। অর্থাৎ, কেউ আমাদের দেখতে পায়নি, কেউ জানে না যে আমরা এখন গালফ অভ মেহিকো দিয়ে ভেসে যাচ্ছি, কোনো টেলিগ্রাম কাউকে আগে থেকে সে-খবর জানায়নি। বিভীষিকা তার নিজের ছন্দে অবিরাম এগিয়ে চলেছে–কোথাও কোনো বাধার মুখে তাকে পড়তে হয়নি। হ্রবুর মনে যে কী আছে, তা সে-ই জানে। আমরা যদি অবিশ্রাম এভাবে এগিয়ে চলি, দিক যদি না-পালটাই, তবে একসময় গিয়ে পৌঁছুবো ক্যারিবিয়নে, পশ্চিম ইনডিসে, অথবা তাকেও পেরিয়ে গিয়ে ভেনেসুয়েলায় বা কোলোম্বিয়ায়। তবে রাত যখন নামবে, তখন হয়তো আবার আমরা উঠে পড়বো আকাশে, যাতে গুয়াতেমালা আর নিকারাগুয়ার। পাহাড়ের বাধা পেরিয়ে যেতে পারি, সোজা ছুটে চলে যেতে পারি প্রশান্ত মহাসাগরে, সেই অজ্ঞাত আইল্যাণ্ড এক্স-এর দিকে।

সন্ধে এলো। সূর্য ডুবে গেলো দিগন্তে, রক্তের মতো রাঙা। বিভীষিকার আশপাশে সমুদ্রে লোহিত ছোপ চমকাচ্ছে–যেন রঙিন সব ফুলঝুরি, এমনভাবে ফেনিল ঢেউ ভেঙে পড়ছে পোতের পেছনে। সম্ভবত হ্রবু ভেবে থাকবে যে ছোটোখাটো একটা ঝড় উঠছে, আমাকে আবার আমার ক্যাবিনে পাঠিয়ে দিলে, আমরা মাথার ওপর আবার আটকে দেয়া হলো

হ্যাঁচওয়ের ঢাকনা। পরের কয়েক মুহূর্ত এমন-সব আওয়াজ শুনতে পেলুম, যা থেকে বুঝতে পারলুম বিভীষিকা এবার জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট পরেই সে অনায়াসেই সমুদ্রের গভীর দিয়ে শঙ্কাহীন চলে যেতে লাগলো।

আমি অবসাদে যেন ভেঙে পড়ছি তখন। কোনো শারীরিক শ্রমের জন্যে এই অবসাদ নয়, উত্তেজনা আর উদ্বেগই যেন আমাকে নিংড়ে আমার মধ্য থেকে সব শক্তি বার করে নিয়েছে। নিজের অজান্তেই কখন একসময় গভীর ঘুমে ঢলে পড়লুম, এবার কোনো ওষুধ দিয়ে কেউ আমার ঘুম পাড়ায়নি, অবসাদই এই ঘুমের কারণ। কতক্ষণ পরে যে ফের জেগে উঠেছি, জানি না, কিন্তু বিভীষিকা তখনও জলের ওপর ভেসে ওঠেনি–ডুবোজাহাজ সেজেই সে চলেছে তখনও।

বিভীষিকা জলের ওপর ভেসে উঠলো আরো-খানিকক্ষণ পরে, যখন ঘুলঘুলি দিয়ে ক্যাবিনে এসে পড়লো দিনের প্রথম আলোর ছটা। আর ভেসে উঠতেই সমুদ্র ছোট্ট খোলার মতো করে দোলাতে লাগলো বিভীষিকাকে সমুদ্রের ঢেউয়ের এই এক বিশ্রী স্বভাব, সবকিছু সে নাড়িয়ে দেয়।

আবারও ডেকের ওপর উঠে এলুম আমি, এসেই আমার প্রথম চিন্তা হলো আবহাওয়া সম্বন্ধে। উত্তরপশ্চিম থেকে ধেয়ে আসছে খ্যাপা হাওয়া, তুফান। ঘন কালো মেঘের মধ্যে চমকে-চমকে যাচ্ছে বিদ্যুতের যত সরীসৃপ। এরই মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসছে বাজের শব্দ-গড়িয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে-গুম গুম গুম! আমি চমকে গেলুম-চমকে ঠিক নয়, ভয় পেয়ে গেলুম, এমন আচম্বিতে দ্রুত ছুটে এলো তুফান। এই ঝড়ের ঝাঁপটা সামলাতে গিয়ে কোনো পালের জাহাজ হয়তো তার পালগুলো গোটাবারও সময় পেতো

না। যেমন দুর্দাম তার গতি, তেমনি ভয়াল–ভয়াল নয়, করাল! বাতাস এমনভাবে ফেটে পড়েছে যেন হাজার বৎসর সে অবরুদ্ধ ছিলো, এখন তার জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে, এক-আধখানা নয়, যেন উনপঞ্চাশখানা পবনই! তারই সঙ্গে তাল রেখে উত্তাল সমুদ্র থেকে উঠেছে এক ভয়ংকর জলস্তম্ভ। ঢেউয়ের পর ঢেউ গর্জাচ্ছে, আছড়াচ্ছে, আর ফেনিল জল পাক খাচ্ছে বিভীষিকার চারপাশে। আমি যদি প্রাণপণে রেলিঙ আঁকড়ে না-থাকতুম, ঢেউ তবে আমাকে ঝেটিয়ে নিয়ে চলে যেতো।

এখন শুধু একটাই জিনিশ করার আছে–বিভীষিকাকে আবার ডুবোজাহাজে রূপান্তরিত করে জলের তলায় নিয়ে-যাওয়া। জলের একটু তলাতেই সে পেয়ে যাবে প্রশান্ত নিরাপত্তা-জলের ওপর সে কিছুতেই এই রাক্ষুসে প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে পারবে না। হ্রবু স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে ডেকে, আমি অপেক্ষা করছি এই বুঝি সে আমায় বলে নিচে চলে যেতে–কিন্তু কখনো আর সেই নির্দেশ এলো না। জলে ডুবে যাবার কোনো প্রস্তুতিও চোখে পড়লো না। আগের চেয়েও তীব্রভাবে জ্বলে উঠেছে তার চোখ, ভাবলেশহীন সে চেয়ে আছে ঝড়ের দিকে, যেন অসীম স্পর্ধায় সে তাকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে, যেন সে নীরব মহাশব্দে এই কথাই বলে দিতে চাচ্ছে এই প্রকৃতিকে–সে মোটেই ডরায় না, মোটেই না!

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না-করে বিভীষিকার এখন ডুবোজাহাজ হিশেবে জলের তলায় চলে-যাওয়া উচিত। অথচ হ্রবুর যেন সে-বিষয়ে কোনো চেতনাই নেই। না, সে তেমনি অসীম ঔদ্ধত্যে, প্রচণ্ড স্পর্ধায় প্রকৃতির সব তাণ্ডবকেই তাচ্ছিল্য করতে চাচ্ছে। যেন সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, যেন সে কোনো মর্তমানুষ নয়!

তাকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একসময় আমারই কেমন আচ্ছন্ন লাগলো, মনে হলো সত্যি কি সে কোনো অতিমানব, কোনো অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে আচমকা বেরিয়ে এসেছে!

হঠাৎ তুফানের সমস্ত গর্জন ছাপিয়ে তার মুখ ফুটে এক চীৎকার বেরিয়ে এলো, আমি হ্রবু, দিগ্বিজয়ী হবু, দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড, কাউকে আমি মানি না!

সে হাত নেড়ে এমন-একটা ইঙ্গিত করলে, যা টারনার ও তার সহযোগী বিনাবাক্যব্যয়েই বুঝে ফেললে। দ্বিধাহীন তারা পালন করলে হ্রবুর নির্দেশ, যেন তারাও হবুর মতোই বুদ্ধিভ্রংশ। ছিটকে বেরিয়ে এলো ডানা দুটি, আর বিভীষিকা উঠে এলো ঝড়ের আকাশে, ঠিক যেমন সেদিন সে উঠে গিয়েছিলো নায়াগ্রার ওপর। কিন্তু সেদিন সে ঐ ভয়াল প্রপাতকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলো, কিন্তু আজ–এই হারিকেনকে সে এড়াবে কেমন করে- ঝড়ের চোখ যেন আজ তারই ওপর এসে আক্রোশ ফলাচ্ছে!

উড়োজাহাজ সোজা উঠে এলো আকাশে, সরাসরি, পাশে চমকাচ্ছে হাজার বিদ্যুৎ, প্রচণ্ড নাদে ফেটে পড়ছে হাজারটা বজ্র-আর তারই মধ্যে অন্ধের মতো ছুটেছে বিভীষিকা, যেন প্রতি মুহূর্তেই আলিঙ্গন করতে চাচ্ছে অনিবার্য ধ্বংসকে।

হ্রবুর ভঙ্গিতে একফোঁটাও বদল নেই। এক হাত হালে, আরেক হাত রেগুলেটরে, দু-পাশে বিশাল দুটি ডানা অবিশ্রাম ঝাঁপটাচ্ছে নিজেদের, হবু সরাসরি যেন ঝড়ের চোখ লক্ষ্য করে চালিয়ে দিয়েছে বিভীষিকাকে, আর মেঘ থেকে মেঘে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ, চারপাশেই।

যদি সে এই গগনচুল্লির মাঝখানে তার বিমান নিয়ে যেতে চায়–তবে তাকে এক্ষুনি ঠেকাতে হবে। তাকে বাধ্য করতে হবে নিচে নামতে, জলের তলার শান্ত আধারকেই খুঁজতে হবে তার এক্ষুনি-খুঁজতে নয়, তাকে দিয়ে খোঁজাতে হবে-নইলে কিছুতেই আর রেহাই নেই!

তারপর নিজের এই উত্তাল ভাবনার মধ্যে হঠাৎ আমার সমস্ত চৈতন্যই যেন কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠলো। হ্যাঁ, এও একরকম উন্মত্ততা, কিন্তু তবু মরবার আগে আমাকেও শেষবার আমার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে-যাকে আমার দেশের সরকার আইনকানুনের পরপারে কোনো সমাজবিরোধী বলে ঘোষণা করেছে, যে তার ভয়াল আবিষ্কার মারফৎ সারা জগতের নিরাপত্তাই বিপন্ন ও বিঘ্নিত করে তুলেছে, তাকে কি? গ্রেফতার করা আমার কর্তব্য নয়? আমার কি উচিত নয় তার কাঁধে হাত রেখে বলা, ওহে মানুষ! ন্যায়বিচারের কাছে আত্মসমর্পন করো! আমার নাম কি জন স্ট্রক নয়, ফেডারেল পুলিশের যে চীফ ইন্সপেক্টর? আমি ভুলেই গেলুম কোথাও আছি, এও ভুলে গেলাম যে এরা তিনজন আর আমি একা ফুঁসে-ওঠা এক সমুদ্রের ওপর বজ্রবিদ্যুতে সমাচ্ছন্ন এক আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি! আমি লাফিয়ে গিয়ে পড়লুম হ্রবুর ওপর, ঝড়কে ছাপিয়ে চীৎকার করে উঠেছে আমার গলা :

হ্রবু, আইন মোতাবেক, বিচারের নামে আম–

অকস্মাৎ বিভীষিকা এমনভাবে কেঁপে উঠলো যেন সে বিদ্যুতের ছোবল খেয়েছে! তড়িতাহত! তার সারা কাঠামোটাই কেঁপে উঠেছে থর্থর, ঠিক তার তড়িৎকোষের ওপর

এসে ভেঙে পড়েছে বজ্র, আর সেই আকাশযান যেন চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। চার কোণায়।

ডানা দোমড়ানো, স্ক্রু চুরমার, কাঠামোর মধ্যে কিলবিল করে ছুটে বেড়াচ্ছে কত যে বিদ্যুৎ, কত-যে ঝলসে-ওঠা সরীসৃপ, বিভীষিকাহাজার ফিট ওপর থেকে, লাট খেতে খেতে, ভেঙে পড়লো নিচের গর্জে-ওঠা সমুদ্রে!

.

১৮. বুড়ি দাসীর শেষ মন্তব্য

কত ঘণ্টা যে সংজ্ঞাহীন পড়ে থাকার পর আমার চেতনা যখন ফিরে এলো, তাকিয়ে দেখি আমি যে-ক্যাবিনে শুয়ে আছি তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একদল খালাশি– তারাই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার শিয়রের কাছে বসে কে-একজন আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে, আর আস্তে-আস্তে যতই আমার ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করতে শুরু করছে, ততই আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, কী হয়েছিলো।

সব, সব কথাই আমি তাকে খুলে বলেছি। হ্যাঁ, সবকিছু! আর আমার শ্রোতারা নিশ্চয়ই ভেবেছে যে নেহাৎই-বেচারা মানুষ আমি, আমার জ্ঞান ফিরেছে বটে অবশেষে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি সব বুঝি লোপ পেয়েছে।

আমি রয়েছি মেহিকো উপসাগরে, অটোয়া স্টিমারের ওপর, সেটা চলেছে নিউ অর্লিন্সের দিকে। এই স্টিমার কোনোক্রমে এড়িয়েছিলো তুফানটা, ঠিক সেটা কেটে যাবার পরেই

হাওয়া তাকে সমুদ্রের ওদিকটায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো, আর জলের ওপর তারা দ্যাখে ভাঙা জাহাজের কাঠকুটো, যার একটাকে আঁকড়ে ধরে আমি–সংজ্ঞাহীন ভেসে যাচ্ছি।

এইভাবেই আবার আমি ফিরে এসেছি সাধারণ মানুষের মাঝখানে, আর বু দিগ্বিজয়ী হ্রবু-তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে তার রোমাঞ্চকর অভিযান সাঙ্গ করেছে মেহিকো উপসাগরের জলে। চিরতরেই হারিয়ে গেছে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড, বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ, যার তুলকালাম প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছিলো বেপরোয়া, প্রচণ্ড স্পর্ধায়। সে তার সঙ্গে নিয়ে গেছে তার এই আশ্চর্য আবিষ্কারের সমস্ত গোপন রহস্য।

পাঁচ দিন পরে অটোয়া দেখতে পেয়েছে লুইসিয়ানার তীর, আর দশই আগস্ট ভোরবেলায় পৌঁছেছে তার বন্দরে। আমার উদ্ধারকর্তাদের কাছ থেকে উষ্ণ সম্ভাষণে বিদায় জানিয়ে তক্ষুনি আমি চেপে বসেছি ওয়াশিংটনের ট্রেনে । মাঝখানে কয়েকদিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আবার আমি এই শহর দেখতে পাবো। স্টেশনে নেমেই, আমি সোজা ছুটে গিয়েছি পুলিশের সদর দফতরে, সবচেয়ে আগে সব কথা খুলে বলতে চেয়েছি মিস্টার ওয়ার্ডকে, যিনি একদিন আমায় না-জেনেই পাঠিয়েছিলেবুর সন্ধানে।

মিস্টার ওয়ার্ডের ঘরের দরজা খুলে ঢোকবামাত্র আমাকে দেখে তার মুখচোখে পর পর যে-সব ভাব উঠেছিলো তা এইরকম : বিস্ময়, স্তম্ভিত হতবাক দশা, এবং হর্ষোল্লাস। আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে তিনি যে-প্রতিবেদন পেয়েছিলেন, তাতে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে লেক ইরির জলে আমার সলিলসমাধি হয়েছে–অন্যরকম কিছু ভাববার কোনো অবকাশই ঐ প্রতিবেদনের পরে ছিলো না।

তারপর আমি তাকে বিস্তারিতভাবে খুলে বলেছি সব কথা : লেক ইরির জলে আমি অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কী-কী ঘটেছিলো : লেকের জলে সেই রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেনচার যখন ডেস্ট্রয়ারগুলো তাড়া করে এসেছিলো বিভীষিকাকে, নায়াগ্রার জল প্রপাতের ওপর থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে কীভাবে উড়াল দিয়েছিলো হ্রবুর আশ্চর্য যান, গ্রেট আইরির কোটরের ভেতর তার সাময়িক বিশ্রাম, আর সবশেষে মেহিকো উপসাগরের জলে প্রচণ্ড তুফানের মধ্যে তার ধ্বংসলীলা কীভাবে, কেমন করে, সম্পন্ন হয়েছিলো।

এই-প্রথম তিনি জানতে পেলেন কী আশ্চর্য যন্ত্র তৈরি করেছিলো হ্রবুর অসাধারণ প্রতিভা, একের ভেতরে চার, যে জল-মাটি-আকাশ সবকিছুকেই জয় করেছিলো।

সত্যি-বলতে, এমন আশ্চর্য ও পূর্ণাঙ্গ কোনো যন্ত্র যে বানাতে পারে, তারই পক্ষে দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড নাম নেয়া মানায়। যে-নামে হ্রবু এই খোলা চিঠি লিখেছিলো। এটা ঠিক যে হবু এবং তার যন্ত্র যদি এখনও থাকতো, তাহলে পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের জীবন হয়তো স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ থাকতো না–তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সব ব্যবস্থাই হয়তো নিষ্ফল এবং অকেজো হতো। কিন্তু তবু আমি গর্বে ও স্পর্ধায় উদ্দীপ্ত এই মানুষটিকে যেভাবে প্রকৃতির সব তুলকালাম শক্তির বিরুদ্ধে যুঝতে দেখেছি, যেন সমানে-সমানেই এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাতে আমি যেন পুরোপুরি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম। আমি যে এই করাল তুফান থেকে প্রাণে বেঁচেছি, সেটাই যেন চূড়ান্ত অলৌকিক ঘটনা।

মিস্টার ওয়ার্ড ভেবেই পাচ্ছিলেন না আমার এই কাহনের কতটুকু তিনি বিশ্বাস করবেন। তাহলে, স্ট্রক, শেষটায় তিনি বলেছেন, তুমি শেষ অব্দি যে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে,

সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। দিগ্বিজয়ী বীর হুবুর পরেই তোমার নাম। এখন সবখানে ছড়িয়ে পড়বে–তুমি হবে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় বিখ্যাত মানুষ। আশা করি তাতে তোমার মাথা দেমাকে ঘুরে যাবে না–বু যেভাবে জাক দেখাতে গিয়ে শেষটায় নিজের সর্বনাশ ঘটিয়ে বসেছে, আশা করি তোমার মধ্যে সে-রকম কোনো অহমিকার ভাব গজাবে না–

না, মিস্টার ওয়ার্ড, আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছি, আমার মাথা মোটেই ঘুরে যাবে না। তবে এটাও তো মানবেন যে এর আগে আর-কোনো লোকই নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে এমনভাবে জলেস্থলেআকাশে হুলুস্থুলতুলে ঘুরে বেড়ায়নি!

মানি, স্ট্রক মানি! আর, গ্রেট আইরির দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, বিভীষিকার অমন আশ্চর্য সব রূপান্তর, তার এই ভয়ালভয়ংকর পরিণাম–সবই তুমি আবিষ্কার করেছে, নিজের চোখে দেখে এসেছো! তবে সবচেয়ে আপশোশের কথাই হলো এটাবুর সঙ্গে-সঙ্গেই তার সব গোপন কথাও হারিয়ে গেলো–ঐ যন্ত্রের রহস্য আর-কোনোদিনই আমাদের জানা হবে না!

সেদিনই খবরকাগজগুলোর সান্ধ্য সংস্করণে সাতকাহন করে বেরিয়েছে আমার এই রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত, কারু কল্পনারই সাধ্যি ছিলো না তার ওপর কোনো রং চড়ায়। মিস্টার ওয়ার্ড ঠিকই বলেছিলেন, সেদিন-হ্রবুর পরেই–আমিই ছিলুম সবচাইতে বিখ্যাত। মানুষ।

একটি কাগজ লিখেছে :

ইন্সপেক্টর স্ট্রকের সৌজন্যে আবারও আরেকবার প্রমাণ হলো যে মার্কিন পুলিশবাহিনীই এখনও সবার সেরা। অন্যদেশের পুলিশ হয়তো জলে-স্থলে অভিযান চালিয়ে কৃতকার্য

হয়েছে, কিন্তু মার্কিন পুলিশ এবার দেখিয়েছে যে, শুধু জলে-স্থলেই নয়, দরকার হলে সে আকাশেও ঝাঁপ খেতে পারে।

অথচ, বিভীষিকার পেছনে ধাওয়া করে গিয়ে আমি যা-যা করেছি, এই শতাব্দীতে হয়তো তার চেয়েও দুর্ধর্ষ কাজ করবে গোয়েন্দাবাহিনী–হয়তো জলেস্থলেআকাশে দাপটের সঙ্গে ছুটে বেড়ানো তাদের নিত্যকর্ম হয়ে উঠবে।

এটা তো না-বললেও চলে আমি যখন লং স্ট্রিটে আমার বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছিলুম, আমার বুড়ি দাসী আমাকে কীভাবে অভ্যর্থনা করেছিলো। যখন আমার ছায়ারূপ–তাই তো বোধহয় বলে ভূতকে, তাই না?-তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিলো সে বুঝি ধপ করে পড়ে গিয়ে হার্টফেল করে বসবে! বেচারা! তারপর আমার বৃত্তান্ত সব শুনে-টুনে সে বলেছে-তার চোখ থেকে অঝোরে দরদর করে জল ঝরছে তখন–ভগবানের অসীম দয়া ছাড়া এমন আশ্চর্যভাবে নিশ্চিত মরণ থেকে কেউ বাঁচে না।

এবার আপনিই বলুন, সে বলেছে, আমি ঠিক কথা বলেছিলাম কি না?

ঠিক বলেছো? কোন কথা?

বলিনি কি, গ্রেট আইরি হলো গিয়ে শয়তানের বাসা!

ধুর, কী-যে বলো! হ্রবু মোটেই কোনো শয়তান নয়?

তা হয়তো নয়, বুড়ি দাসীই শেষ কথাটি বলেছে, তবে শয়তান হবার সব যোগ্যতাই তার ছিলো।